দুই পক্ষ

তিন দিক হইতে তিনটী রাস্তা গাঁয়ের মাঝ বরাবর আসিয়া একত্রে মিশিয়া গিয়াছে। পাশেই 'বলান দেশের' পুকুর। সবে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। ভাল করিয়া দূরের জিনিস আর চোখে পড়ে না।

পুকুরের পাশ দিয়া চারিদিকে একটা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে রাখিতে পূব পাড়ার হরি বন্দ্যোর ছেলে পল্লব দক্ষিণ পাড়ার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। অশ্বত্থ গাছটীর কাছে আসিয়াই সে একবার থমকাইয়া দাঁড়াইল।

বট গাছের বাঁধান বেদীর উপর বসিয়া গাঁয়ের দুর্দ্দান্ত বেণী রায় তাঁহার সাকরেদদের লইয়া জটলা করিতেছিলেন। তাঁহার চোখের জলন্ত দৃষ্টি পল্লবের হাতের জাপানী লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোটুকু যেন স্তিমিত করিয়া নিভাইয়া দিতে চায়।

পল্লবকে দেখিয়া বেণী রায় হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "কোথায় যাচ্ছ পল্লব?"

পল্লব আজকালকার ছেলে। এই বেণী রায়কে তাহার বাবা পিতামহ ভয় করিয়া চলিলেও সে তাহাকে কোন দিনও ভয় করে নাই। তবে সে জানিত যে তাহার এবং তাহার সাকরেদদের অসাধ্য কোনও কায ছিল না। তাই সে একটু সাবধানেই থাকিত।

পল্লব উত্তরে বলিল, "সত্যবাবুদের বাড়ী।"

কথাটা শুনিবামাত্র বেণী রায় লাফাইয়া উঠিয়া হাতের মোটা লাঠিটা মাটির উপর সজোরে ঠুকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি? আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে!"

বে-ছোকরা! জান, এক চড়ে মুণ্ড ঘুরিয়ে দেব। তোমায় বারণ করেছি না! হয়ো খুড়োর ছেলে আর কত ভাল হবে! খবরদার বলছি....”

—সে প্রথমটায় একটু ভড়কাইয়া গিয়াছিল। গ্রামের ইতর ভদ্র এমন লোক ছিল না, যে ইহাকে ভয় না করে। শিশু বয়স হইতে সে ইহার কত দৌরাত্মের কথা শুনিয়া আসিয়াছে। কিন্তু গাঁয়ের এতগুলো লোক কেন যে আজও ইহার প্রতিকার করিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহা বড় হইয়াও সে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। পল্লব এমনিই একটা সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল। সামনা সামনি বুঝাপড়া করিবার এমনি একটা সুযোগ পূর্ব্বে সে কখনও পায় নি।

দৃঢ়স্বরে পল্লব উত্তর দিল, “কেন বলুন ত? মুণ্ড ঘুরাবার একমাত্র মালিক কি শুধু আপনিই? চেষ্টা করুন না!”

অতটুকু একটী ছেলের কাছে এইরূপ একটী উত্তর পাইবেন বেণী রায় তা আশা করেন নি। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং তাহার পর বলিয়া উঠিলেন, “কিই-ই, বটে—”

পাড়ার নরেন দাস, কোমরে গামছা আঁটিতে আঁটিতে এতক্ষণ ইহাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। এইবার আগাইয়া আসিয়া তিনি অনুযোগ করিলেন, “ছিঃ পল্লব। তুমি এমনি বয়ে যাচ্ছ! কত বড় লোকের নাতি তা তুমি জান? ঋষি তপিস্বি লোক ছিলেন তিনি। আর তাঁর নাতি হয়ে তুমি—, ছিঃ। আর ঐ মেয়েটার কি গতি হবে তা ভেবেছ? পাড়ায় যে টি টি পড়ে গেছে। সত্য রায় তোমায় ছেলের মত ভালবেসে বাড়ীর মতন করে নিয়েছিল বলে তুমি তার এই প্রতিফল দিচ্ছ, ছিঃ—”

উত্তরে বেণী রায় বলিল, “তা দেবে না কেন, কার ছেলে?”

নরেন দাস উত্তর করিল, “আচ্ছা খুড়ো। নচ্ছার বামুনটাও ক’

আচ্ছা! বাপ হয়েও চোখে দেখতে পায় না! ... বলে, ও সব বাজে কথা, ওরা ভাই বোনের মত।"

বেণী রায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "ছুত্তোর ভাই বোনের ... করেছে। রায় গুষ্টির মুখ কিছুতেই আমি ডোবাতে দেব না। বেরো, যাও ওকে, আমি দেখছি—"

পল্লব আর সেখানে দাঁড়াইল না। সে লণ্ঠনটা হাতে করিয়া সোজা দক্ষিণ পাড়ার দিকে চলিয়া গেল।

পল্লব যখন সতীশ রায়ের দক্ষিণ পাড়ার নূতন বাড়ীতে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

ছোট একটী দ্বিতল বাটী, সদ্য তৈরি নীচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পারুল তুলসী মণ্ডপে একটি মাটীর প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া বলিতে যাইতেছিল, ঠাকুর—

হঠাৎ সে শুনিল পল্লব পিছন হইতে তাহাকে ডাকিতেছে, পারুল।

কখন নিঃশব্দে পল্লব যে তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা পারুল জানিতে পারে নাই। সে ফিরিয়া দেখিল পল্লব অনিমেষ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পল্লবকে দেখিয়া পারুল ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিল, তাহার পর ঢিপ্ করিয়া পল্লবকে একটা প্রণাম করিয়া পারুল বলিল, "বা-রে-এ, আমাকে বুঝি ডাকতে নেই! কতক্ষণ আসা হয়েছে, শুনি। দুষ্টু কোথাকার।"

পারুলের কথার কোনও উত্তর না দিয়া পল্লব জিজ্ঞাসা করিল, "সত্য কাকা, কেমন আছেন আজ?"

উত্তরে পারুল বলিল, "জ্বর একটু বেড়ে গেছে। আজ ঘুঘুডাঙ্গীর সেই মামলার রায় বেরুল কি না? বিকেলে মামাবাবুর মুখে সুখ-কথা শুনে—"

পল্লব ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, মামলার খবর কি? কি রায় বেরুল?"

উত্তরে পারুল বলিল, "হার হয়েছে। বেণী [illegible] অসাধ্য কাজ নেই। কোথা হতে একটা জাল কবলা বার করে মামলাটা জিতে নিলে। আমাদের এইবার পথে বসতে হবে পল্লবদা।"

পল্লব স্তম্ভিত হইয়া খবরটা শুনিল। অতগুলা ভদ্রলোকের সাক্ষ্য একটা জাল কবলার মুখে উড়িয়া গেল। শান্ত স্বরে পল্লব উত্তর করিল, "ভয় কি? আপিল আছে ত? চল কাকাকে দেখে আসি।"

উভয়ে ধীরে ধীরে মুমূর্ষু রোগী সত্য রায়ের শয্যা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবা মাত্র, অতি কষ্টে হাত বাড়াইয়া রোগী পল্লবকে কাছে আসিবার জন্য ইসারা করিল। পল্লব কাছে আসিবা মাত্র, সত্য রায় তাহার হাতে ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "শুনেছ ত। আমি হেরে গেছি, আমার আর কিছুই রইল না। পারুকে তুমিই দেখ।"

পল্লবের চোখ সজল হইয়া উঠিল। উত্তরে সে বলিল, "আপনি চুপ করে শুয়ে থাকুন দিকি। আপনার সব ভাবনা আমার উপর ছেড়ে দিয়ে আপনি ঘুমবার চেষ্টা করুন।"

রোগী একটা স্বস্তির হাসি হাসিল। কোনও উত্তর দিল না।

পারুল বলিল, "বাবা, পল্লবদা বলছিলেন আপিল করতে।"

রোগীর ঠোঁটের কোণের স্তিমিত হাসি আর একবার ফিরিয়া আসিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সত্য রায় উত্তর করিল "কে করবে পারু। আমার যে দিন ফুরিয়ে এল। অনেক মামলা ত তার সঙ্গে করলাম। কৈ একটাতেও ত জিততে পারলাম না। শেষে ভিটে ছেড়ে এইখানে এসে মাথা গুঁজবার মত একটা মাত্র স্থান করে নিলাম, কিন্তু ঘুবুড়ীর মামলায় হার হওয়ায় তাও ত হারাতে বসেছি। যা হয় তোমরা করিল। আমি আর ভাবতে পারি না।"

রোগীর পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে পল্লব বলিল, "কেন ভাবছে[illegible] কাকাবাবু। আপনার সব ভাবনা ত আমি তুলে নিয়েছি। আপ[illegible] ঘুমবার চেষ্টা করুন।"

সত্য রায় বলিল, "সাবধানে থেক পল্লব। আমার ভয় হ[illegible] তোমাকেও না আমাদের জন্যে বিপদ বরণ করতে হয়। ওর অসা[illegible] কোনও কাজই নেই।"

সত্যই বেণী রায়ের অসাধ্য এমন কোনও কাজ ছিল না। [illegible] খুন হইতে ঘর জ্বালানি পর্য্যন্ত সকল প্রকার অপরাধই তাহা[illegible] দ্বারা সমাধিত হইয়াছে। দুই একবার যে তাঁহার নামে থানা কোজদার[illegible] হয় নাই, তাহাও নয়; কিন্তু প্রতিবারেই বুদ্ধি ও কৌশলে তি[illegible] নিষ্কৃতি পাইয়াছেন।

পল্লব উত্তর করিল, "ভাববেন না, সত্যকা। উনি আমার কিছু[illegible] করতে পারবেন না। আমি যদি সুরু থেকেই দেশে থাকতাম [illegible] হ'লে ওঁর এই সব উপদ্রব অনেক আগেই বন্ধ হয়ে যেত। আপনা[illegible] সহ্য করে এসেছেন, বলেই উনিও অত বাড়তে পেরেছেন। [illegible] আমি এ সব সহ্য করব না।"

সত্য রায় চুপ করিয়া পল্লবের কথা কয়টী শুনিল এবং তাহার প[illegible] ক্ষীণ স্বরে উত্তর করিল, "না পল্লব, কাজ নেই বাবা! তোর জ[illegible] আমার বড় ভয় করে।"

রোগীর কণ্ঠে একটা দারুণ উদ্বেগের চিহ্ন দেখা গেল। পল্ল[illegible] তাড়াতাড়ি রোগীর বুকে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিল, "ভয় নে[illegible] কাকাবাবু। আমি খুব সাবধানে থাকব।"

"তাই থাকিস বাবা," বলিয়া সত্য রায় চোখ বন্ধ করিলেন।

রোগীকে ঘুমাইয়া পড়িতে দেখিয়া পল্লব ও পারুল বাহির হইয়[illegible]

আসিয়া বাহিরের ছাদের একটী আলিসার উপর দুই জনে পাশা-পাশি বসিয়া পড়িল।

জ্যোৎস্না রাত্রি। চারিদিক্ চাঁদের আলোয় ভরপুর। চাঁপা ফুলের গাছের একটা ডাল হাওয়ার ভরে দুলিয়া দুলিয়া ছাদের কোণ পর্য্যন্ত আসিয়া আবার সরিয়া যাইতেছে। চাঁপা ফুলের তীব্র গন্ধ তাহাদের মনের মধ্যে একটা আবেশ আনিয়া দিতেছিল।

পারুল হঠাৎ তাহার মুখটা একেবারে পল্লবের বুকের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "পল্লবদা।"

পল্লব দুই হাতে পারুলের মুখটা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "কি করছিস পারু! কেউ যদি দেখে ফেলে ত কি বলবে বল ত?"

পারুল বলিল, "না দেখে তারা যা বলছে তার চেয়ে তারা আর বেশী কি বলবে?"

কথা কয়টা শেষ করিয়া পারুল নিশ্চিন্ত মনে তাহার দেহটা পল্লবের বুকের উপর এলাইয়া দিল। পল্লব অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিল, পারুল ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। পল্লব ধীরে ধীরে একটা রুমাল বাহির করিয়া পারুলের চোখ দুইটা মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, "ভয় কি পারু! আমাকে কি তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না?"

পারুল বলিল, "বিশ্বাস না করলে কি আমি এমনি করে ধরা দিই পল্লবদা। তুমি ভুলে যাচ্ছ পল্লবদা, আমি কার মেয়ে।"

পারুলের কথা শেষ হইল না। হঠাৎ তাহারা চাহিয়া দেখিল পাড়ার জগীপিসী তাহাদের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাঁহার ভাব দেখিয়া বুঝা গেল তিনি অনেক পূর্ব্বেই সেইখানে আসিয়াছেন। তবে সাড়া দেন নাই।

জগীপিসী এইবার বলিয়া উঠিলেন, "কেরে-এ, পারু-উ! পল্লব যে কতক্ষণ এসেছিস্?"

পারুল বলিল, "বাবা ওঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কি না। এই যাবেন উনি।"

জগীপিসীর চোখের কোণে একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। ঠোঁটের কোণে একটা বিদ্রূপের হাসি আনিয়া জগীপিসী বলিলেন, "তা বেশ বাবা, বেশ। বাড়ীতে ত আর দ্বিতীয় পুরুষ মানুষ নেই, তা তোমরা বাবা মাঝে মাঝে দুই একজন না এলে চলবে কেন? তা তোরা কথা ক'? আমি সতুটাকে একবার দেখে আসি।"

রোগী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। জগীপিসী নিঃশব্দে রোগীর ঘরে ঢুকিয়া, হ্যারীকেনের আলোটা কিছু কমাইয়া দিয়া জানালার কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল।

পল্লব ও পারুল ছাদের যে জায়গাটায় বসিয়াছিল, সেইখান হইতে জানালাটী সুস্পষ্ট দেখা যায়। জগীপিসীর এই আচরণ তাহাদের চোখ এড়াইল না।

"পল্লব জানালার দিকে হাত নাড়িয়া বলিল, "দেখ্‌ছ ত পারু, ঐ দেখ। কাল পাড়ায় অনেক কথাই শুনতে পাবে। ছিঃ ছিঃ—"

পারুল দুই হাতে পল্লবকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "দেখুক না, যত পারে দেখুক। আমার সব কলঙ্ক তুমি ভঞ্জন করে দেবে পল্লবদা। আমি তোমায় বিশ্বাস করি। আর তুমি যদি না দাও ত দীঘীর জল ত আছে। আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষের খোঁড়া ঐ দীঘী। এখনও সেখানে অথৈজল। ঐ দীঘীর জল আমার সব কলঙ্ক ঘুচিয়ে দেবে পল্লবদা। সামনে আমি দুটো মাত্র পথ দেখতে পাচ্ছি। প্রথমটা যদি ভাগ্যক্রমে বন্ধ হয়ে যায়, দ্বিতীয় পথ ত আমার খোলা থাকবে। এই জন্যে তুমি ভয় পেলেও আমি ভয় পাই নি। মনে রেখ পল্লবদা, আমি হিন্দুর মেয়ে। বাংলা দেশে জন্মেছি। দুঃখকে আমি ভয় করি না।"

পল্লব ধীরে পারুলের কপালের উপর একটা চুমা দিয়া বলিল, "ঐ জগাপিসী আসছে! এখন তুমি বোঝাপড়া কর ওর সঙ্গে, আমি আসি।"

জগাপিসী পল্লব ও পারুলের ব্যবহারে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। এতদূর যে তিনি দেখিবেন, তাহা তিনি আশা করেন নাই। তিনি আবেগের ঝোঁকে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া পড়িলেন।

জগাপিসীকে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া সিঁড়ীর কাছ হইতে তাহার লণ্ঠনটা তুলিয়া লইয়া পল্লব নীচে নামিয়া গেল।

২

পল্লীর সঙ্কীর্ণ পথ, আসে পাশে আম কাঁটালের গাছ। জ্যোৎস্নার আলো বৃক্ষাদিতে প্রতিহত হইয়া পথের উপর পর্য্যন্ত আর আসিয়া পড়ে না। পল্লব ধীর পদবিক্ষেপে রায় গোষ্ঠির বাটীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রকাণ্ড চারিমহল বাটী। প্রথম ও দ্বিতীয় মহল ভাঙিয়া পড়িয়াছে। তৃতীয় মহলটী সত্য রায়ের, কিন্তু মিথ্যা খতের মামলায় জিতিয়া, বেণী রায় তাহা হস্তগত করিয়াছে। চতুর্থ মহলটী বেণী রায়ের নিজস্ব। ও বারকর্ত্তা ইটের স্তূপ। পাঁজর ভাঙ্গা পাঁজা বলিলেও চলে। চুণ বালি খসিয়া পড়িয়াছে। হাসিতেছে কি কাঁদিতেছে তাহা ঠিক বুঝা যায় না।

বাড়ীটার পূর্ব্ব গৌরব আর নাই, কিন্তু তবুও তাহার ভগ্নপ্রায় বিরাট বহু লোকের মনে অলক্ষ্যে শ্রদ্ধা আনিয়া দেয়।

পল্লব লক্ষ্য করিল, বাড়ীটার লম্বা রোয়াকের নীচে একটা লোক হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার মুখের দাড়ীটা দেখিলে দা বলিয়া ভ্রম হয়।

লোকটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া পাশ কাটাইয়া পল্লব বটতলার

দিকে আগাইয়া চলিল। এই বটতলা বেণী রায় এবং তাঁহার সাকরেদদের মিলন স্থান। অন্য দিন ইতর ভদ্র অনেক ব্যক্তিই এইখানে জমা হয়। কিন্তু এই দিন একটী লোককেও সেখানে দেখা গেল না।

তাহাদের উপস্থিতির চেয়ে অনুপস্থিতি পল্লবের মনে ভয়ের উদ্রেক করিল।

পল্লব দ্রুত পদে মোড় ফিরিয়া তাহার বাটীর পথ ধরিয়াছে মাত্র, এমন সময় কোথা হইতে একটী অর্দ্ধ ইষ্টক সজোরে আসিয়া তাহার লণ্ঠনের উপর পড়িয়া লণ্ঠনের কাঁচটী চুরমার করিয়া ভাঙিয়া দিল।

পল্লব, "কে কে!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু কাহাকেও কোথায়ও দেখা গেল না।

পল্লবের চীৎকার শুনিয়া পাশের বাগান হইতে লণ্ঠন ও গাড়ু হাতে করিয়া যিনি ছুটিয়া আসিলেন, তিনি বেণী রায় নিজে। পল্লবকে দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ব্যাপার কি হে—"

বেণী রায় যে দিক হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, সেই দিক হইতে ইট আসে নাই। তাই তাঁহাকে বলিবার মত পল্লবের কিছুই ছিল না। পল্লব শুধু চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল বটতলার দিক হইতে সওদা হাতে করিয়া আসিতেছেন বেণী রায়ের সুযোগ্য সাকরেদ নরেন দাস।

নরেন দাস নিকটে আসিয়া বলিয়া উঠিল, "কি বেণীদা, সাপ?"

পল্লব আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। ঝাঁঝাল স্বরে সে উত্তর করিল, "হাঁ, সাপই, মানুষ হলে এত নীচের মত পিছন দিক থেকে ইট মেরে পালাত না। বুঝি সব—"

বেণী রায় মুখ ভেঙ্গাইয়া উত্তর করিল, "বোঝ আর কই? এইবার লণ্ঠনের উপর দিয়ে গেল, পরে মাথার উপর এই ইটের পরখ চলবে। সাবধান করে দিলাম মাত্র।"

পল্লব একা অন্ধকারে আর এইখানে দাঁড়াইয়া থাকা সমীচীন মনে করিল না। সে ইহাদের কথার আর কোনও উত্তর না করিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

পল্লব চলিয়া গেলে নরেন দাস বলিল, "কি গো খুড়ো! আজ এই পর্য্যন্ত, না আরও কিছু বন্দোবস্ত করেছ?"

বেণী রায় ইসারায় তাহাকে চুপ করিতে বলিল।

রাত্রি প্রায় একটা হইবে। ঘরের ভিতর একটা চৌকির উপর পল্লব ঘুমাইতেছিল। মেঝের উপর শুইয়া ছিল, তাহার ভৃত্য গোবিন্দ।

হঠাৎ গোবিন্দ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবু বাবু—"

পল্লব ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "কে রে, কি, কি হয়েছে?"

উত্তরে গোবিন্দ বলিল, "ও কিসের শব্দ বাবু?"

পল্লব কান খাড়া করিয়া শুনিল, দরজার দিক হইতে এ[illegible] কিসের শব্দ আসিতেছে, খট্ খট্ খট্—

পল্লব অতি সন্তর্পণে ঘরের কোণ হইতে গুলিভরা বন্দুক[illegible] উঠাইয়া লইয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইবা মাত্র দেখিতে পাইল গো[illegible] পাঁচ ছয় উলঙ্গ কৃষ্ণ মূর্ত্তি বাহিরে রোয়াকের উপর নৃত্য করিতেছে।

পল্লব দরজা খুলিবা মাত্র মূর্ত্তি কয়টী অন্ধকারের মধ্যে দ্রুত অদৃশ্য হইতে লাগিল। পল্লব অন্ধকার লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িতে যাইতেছিল, এমন সময় গোবিন্দ পিছন দিক হইতে বন্দুক সমেত তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "করো কি দাঠাকুর! ওরা কি মানুষ!"

পল্লবের আর গুলি ছোঁড়া হইল না। সে গোবিন্দকে সরাইয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "ভূতের ভয় আর আমাকে দেখিও না। বাপ

জেঠাকে আমার অনেক ভয় দেখিয়েছ, কিন্তু আমাকে পারবে না। সব বুজরুকি আমি বুঝি।”

সভয়ে পল্লব শুনিল, সামনের তাল গাছটার উপর হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল, “হিঁ গো হিঁ।”

তাল গাছ লক্ষ্য করিয়া পল্লব বার কতক গুলি ছুঁড়িল, কিন্তু কোনও ফল হইল না। গুলির প্রত্যুত্তরে গাছের উপর হইতে একটা বিকট হাসির শব্দ আসিল মাত্র।

পিছন ফিরিয়া পল্লব দেখিল গোবিন্দ দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। গোবিন্দের হাত ধরিয়া তাহাকে ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিয়া পল্লব দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

বেলা প্রায় দুইটা হইবে। ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে রৌদ্র। বাহিরে বড় একটা কেহ বাহির হয় না। বেণী রায় ফরাসের উপর শুইয়া পড়িয়া গড় গড়া টানিতেছিল, সামনে উপু হইয়া বসিয়া রহিয়াছে ঢুলিয়া পাড়ার রঘু ঢুলে ওরফে রাঘব দুর্লভ।

রঘু ঢুলে কলিকার আগুনটা আর একবার বদলাইয়া দিতে দিতে বলিল, “কর্ত্তা, গোবিন্দ কাল রাত্রে বেশ একটা হরবোলার চাল চেলেছে, বাছাধনকে ভেড়কে যেতে হয়েছিল।”

বেণী রায় উত্তরে বলিল, “হুঁ শুনেছি। বেশ বোকা সেজে থাকতে বলিস, যেন ধরা না পড়ে। ওকে দিয়ে আমাদের আরও অনেক কাজ করাতে হবে।”

রঘু বলিল, “না, ও ঠিক আছে। ও না বন্দুকটা ধরে ফেললে, কাল আমাদের সাবড়েছিল আর কি! বাপ্! পৈতৃক পেরানটা গিয়েছিল আর কি?”

সারদামণির কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বেণী রায় উত্তর করিল, "না, তার পিছনে লাগবে না। তেনা তোমায় স্বর্গে দিয়ে আসবেন। যাও—যাও না। যাও, বড়ঠাকুরের ঘাড়ে চড়ে নাচ গে। জানো, আমার নামে গাঁয়ের লোক দরখাস্ত দিচ্ছে, আর সেই দরখাস্তয় তেনা সই দিয়েছেন।"

সারদামণি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "করুন না, মিছে কথা। আমি আজও তাঁর বাড়ী গিছলাম।"

বেণী রায় হুঙ্কার দিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "কতবার তোমায় বারণ করেছি না, বড়দাদার বাড়ী যাবে না! বড় বাড়িয়ে তুলেছ যে দেখছি।"

সারদামণি কাঁদিয়া ফেলিয়া উত্তর করিল "ওগো, তোমার কি পাপ মন্নিরও ভয় নেই। তেনারা যে গুরুজন। তোমার আপনার লোক।"

বেণী রায় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ছুটিয়া আসিয়া সারদামণির ঘাড় ধরিয়া দরজার দিকে ঠেলিয়া দিলেন এবং তাহার পর বলিয়া উঠিলেন, "যাও-ও। শীগ্রি বাড়ীর ভিতর যাও। বউ মানুষ, বউমানুষের মত থাকবে। যাও—"

ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া প্রতিবাদের সুরে সারদামণি বলিল, "না যাব না।"

বেণী রায় ক্ষেপিয়া উঠিয়া স্ত্রীর গলা টিপিয়া ধরিতেছিলেন, এমন সময় ফকির ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল "আমাদের সামনে মার অপমান করবেন না কর্ত্তা, এ আমরা সহ্য করব না। আপনার এতে ভাল হবে না। আপনার আমি বাপের আমলের চাকর, আমার কথা রাখুন?"

ফকিরের কথায় স্ত্রীকে ছাড়িয়া দিয়া বেণী রায় গজ্‌রাইতে লাগিলেন। মুখে আর কিছু বলিলেন না।"

সারদামণি এইবার ফকির ঢুলে এবং মধু ঘোষের দিকে চাহিয়া

বলিল, "ওরে, তোরা আমার ছেলের মত। ভালমানুষের চোখে জল আর ফেলাস নি। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করবি, বুঝলি।"

সারদামণির পায়ের কাছে ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া ফকির বলিল, "কি করব মাঠাকরুণ। আমরা যে আপনকার প্রেজালোক। নিমকের চাকর।"

মধু ঘোষ ফকিরের কথায় সায় দিতে যাইতেছিল, তাহাকে ধমক দিয়া বেণী রায় বলিয়া উঠিলেন, "তোরা এখন যাবি; না মেয়েমানুষের সঙ্গে বসে বসে এখানে তর্ক করবি।"

উত্তরে মধু ঘোষ বলিল, "এজ্ঞে যাই কর্ত্তা। উনি আমাদের মা কি'না।"

ফকির ও মধু চলিয়া গেলে, বেণী রায় রুদ্র মূর্তিতে একবার স্ত্রীর দিকে চাহিয়া লইয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। সারদামণি মাথার কাপড়টা আরও একটু টানিয়া দিয়া স্বামীর পিছন-পিছন যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন, "ওগো শোনো। তোমার পায়ে পড়ি আমি।"

বেণী রায় কোন উত্তর করিল না। শুধু চলনের গতি তিনি আরও একটু বাড়াইয়া দিলেন মাত্র।

৩

সূর্য্যের শেষ রশ্মি পল্লীর খোড়ো ঘরগুলোর ছাউনির উপর হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া গিয়া দূরের বট গাছের মগডাল এবং নারিকেল গাছের মাথার উপর উঠিয়া চিক চিক করিতেছে মাত্র। বৃক্ষাদির নীচের স্থান অবছায়া অন্ধকারে পরিণত হইতে চলিয়াছে, দূরের জিনিস ভাল করিয়া আর চোখে পড়ে না। আশে পাশের মেটে বাড়ীগুলির

চারিদিককার ভেরাণ্ডা গাছের বেড়ার মধ্যকার ফাঁকগুলো অন্ধকারে ভরাট হইয়া গিয়াছে। বেড়ার ওপারে আর কিছুই দেখা যায় না।

ছলিয়া পাড়ার মাখন ছলে তখনও উঠানের মাঝখানকার নারিকেল গাছের তলায় দাঁড়াইয়া একরাশ ছাই মাখিয়া তখনও মেহন্নত করিতেছিল। মুষ্টিবদ্ধ হাত দুইটী সামনে রাখিয়া কখনও বা সে উঠাবসা করিতেছিল, কখনও বা নারিকেল গাছের গোড়ায় ছুটিয়া সজোরে ধাক্কা মারিয়া দেহের হিম্মত পরীক্ষা করিয়া লইতেছিল। নারিকেল গাছটী থাকিয়া থাকিয়া ছলিয়া উঠিতেছে।

কিছু দূরে মাখনার মা ঝাঁটা হাতে উঠান ঝাঁটাইতেছিলেন। দোদুল্যমান গাছটীর দিকে তাকাইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি-রে, ও মাখনা। ও কি কর্‌ছিস। গাছটা ফেলে দিবি না-কি ?"

প্রকাণ্ড একটা বিচুলির গাদা। বিচুলির গাদার ঠিক নীচেই একটা বড় মনসা গাছ। মনসা গাছের তলায় একটা মাটীর তুলসী মণ্ডপ। তুলসী মণ্ডপে মাটীর প্রদীপটী জ্বালিয়া দিয়া, মাখনার বৌ ক্ষেত্রদাসী শাঁক হাতে বড় ঘরের দাওয়ার দিকে ফিরিয়া আসিতেছিল। শাশুড়ীর কথা শুনিয়া সে একটু থমকাইয়া দাঁড়াইল। এবং তাহার পর শাশুড়ীর কোলের কাছে আগাইয়া আসিয়া মুচকি হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল, "ভয় নেই মা! তোমার ছেলে এমন ভীম সেন এখনও হয় নি।"

ক্ষেত্রদাসী কথা কয়টা স্বামীকে শুনাইয়াই বলিয়াছিল। স্ত্রীর এই স্নেহোক্তি কানে যাওয়া মাত্র মাখনা বুক চিতাইয়া স্ত্রীর দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "দাও তো মা একটু ছাই, গাছটাকে উপড়ে আবার পুঁতি।"

বধূ এবং শ্বশ্রুমাতা উভয়েই মাখনার কথা শুনিয়া এক সঙ্গে হাসিয়া উঠিল। তাহাদের এক সঙ্গে হাসিতে দেখিয়া মাখনা চোখ

পাকাইয়া কিছু বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় ফকির আসিয়া বেড়ার আগোড়টা একটু ফাঁক করিয়া বলিয়া উঠিল, "বৌমা, একটু সইরা যাবেন, আমি ভিতরে যাব একটু।"

ফকিরের গলার আওয়াজ শুনিয়া মাখন বলিয়া উঠিল, "আরে সাঙ্গাত! আরে এসো, এসো।" মাখনার বৌ ফকিরকে দেখিয়া মাথার ঘোমটাটা আরও একটু টানিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

ফকিরকে দেখিয়া মাখনার মা বলিল, "কি-ই বাবা, দেখাই যে নেই। এইয়েছিস যদি, তবে বোস্, পাটালী দিয়ে এক সানকি মুড়ী খা।"

ফকির মাখনার মাকে একটা প্রণাম ঠুকিয়া বলিল, "না মা; আজ নয়। দেরী হয়ে যাবে। আমি মাখনাকে নিয়ে একটু বেরিয়ে যাচ্ছি। ছোটবাবু ডাক দিয়েছেন।"

বেণী রায়কে লোকে ছোটবাবু বলিয়াই ডাকিত। বেণী রায় ভদ্র সমাজে এক হৃদয়হীন দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির মানুষরূপে পরিচিত হইলেও চাষী সমাজে তাঁহার খ্যাতি ছিল, তাই ছোটবাবুর নামে ভক্তিতে গদ গদ হইয়া মাখনার মা সম্মতির সহিত বলিয়া উঠিল, "ছোটবাবু ডেকেছেন? তবে, যা বাবা, যা। ছোট নোকদের উনি মা বাপ। উনি কি বলেন তা শুনে আয়গে যা।"

মাখনা আর কালবিলম্ব না করিয়া দাওয়ার উপর রাখা লণ্ঠনটা তুলিয়া লইয়া ফকিরের সহিত রাস্তার উপর বাহির হইয়া আসিয়া, বেড়ার পাশ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি-রে, ফকির! কিছু খবর আছে না-কি।"

ফকির বলিল, "তুই চট্ করে চলে গিয়ে ওপাড়ার সকলকে ঠিক করে আয়। রাত্রি সাড়ে তিনটের তাদের নিয়ে বেরুতে হবে। গাঙ্গুলী ঠাকুরের নোনো পড়োর লাটে যত বীজ ধান আছে তা

সব উপড়ে আনতে হবে, বুঝলি। ছোটবাবুর হুকুম, রাতারাতি কায সারা চাই। আর শোন্, তুই যেন সেখানে বেশী দেরী করিস নি। তাড়াতাড়ি চলে আসবি। সন্ধ্যে আটটায় আবার দারোগাবাবু গরু চুরীর তদারকে আসতেছেন। আমরা সকলে হরো ঠাকুরের বাড়ীতে, দারোগার আশেপাশে মজুত থাকব, বুঝলি ?”

ফকির এক নিশ্বাসে তাহার বক্তব্যটুকু শেষ করিয়া চুপ করিল। করণীয় কার্য্যাদি বুঝিয়া লইয়া মাখনা ওরফে মাখনদত্ত তুলিয়া বলিল, “শুধু, তেনার সেই মাঠের ধান কেন; হরো ঠাকুরের সেই চালতা পুকুরের মাছগুলো ছাঁকা জাল ফেইল্যা রাতারাতি ধইর‍্যা নেব আখুন। ছোটবাবু যখন হুকুম কইর‍্যাছেন, তখন কি আর কথা আছে।”

ফকির বলিল, “তা সে মন্দ কথা নয়, আগুনের পথে মাছ গুলোও ধইর‍্যা লেওয়া যাবে। আমি যাচ্ছি, ছোটবাবুকে বলছি সব কথা। তুই এখন যা'দিকিনি বরাতটা সেরে আয়। দারোগার সামনেই এক কাণ্ড হবে, দেখিবি আখুন, বুঝলি। ছোট বাবুর কাছে নালিশ জানালেই হতো, তা নয় পেল্লব বাবুকে নিয়ে থানায় গেলেন। বুঝবেন এইবার ঠেলা।”

ফকির এবং মাখন তাহাদের শলা পরামর্শ শেষ করিয়া দুই জনে দুই দিকে সরিয়া পড়িতেছিল, ঠিক সেই সময় হরো ঠাকুরকেও লণ্ঠন হাতে সেই দিকে আসিতে দেখা গেল। তিনি কৈবর্ত্ত বাড়ী হইতে ছোট শিশুটীর জন্য দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া তাড়াতাড়ী বাড়ী ফিরিতেছিলেন। হরো ঠাকুরকে হঠাৎ সামনা সামনি আসিতে দেখিয়া উভয়েই করযোড়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিয়া উঠিল, “প্রণাম হই ঠাকুর।”

হরো ঠাকুর ওরফে হরিচরণ ভট্টাচার্য্য বলিলেন, “কল্যাণম্ ভবতু, ভাল আছিস্ তোরা ?”

ফকির বলিল, "আপনার আশীর্বাদে ভালই আছি ঠাকুর। শুনে ব্যথা পেলাম, কর্ত্তা, আপনার লাঙলা দুটো কারা খুইল্যা লইয়ে গেছে। ঠিক করেছেন থানায় গিয়া। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার।"

হরো ঠাকুরের প্রকাণ্ড আট চালার রোয়াকের উপর চার পাঁচ খানা চেয়ার পড়িয়াছে! দারোগাবাবু সদলবলে আসিয়া তদন্ত সুরু করিয়া দিয়াছেন। একখানি চেয়ার খোদ বেণী রায় গ্রামের মুরুব্বী হিসাবে দখল করিয়া বসিয়া আছেন। বিরুদ্ধ পক্ষের সুধীর গাঙ্গুলী, পল্লব ও ফরিয়াদী হরো ঠাকুর পাশাপাশি তিনখানি চেয়ার দখল করিয়া বসিয়া আছেন। বেণী রায় হাসিয়া হাসিয়া সকলের সহিত কথা বলিতে ছিলেন। যেন কাহারও উপর তাহার কোনও বিরাগ নেই। সামনের একখানি টেবিলের উপর একটা লণ্ঠন রাখিয়া দারোগা সাহেব জবানবন্দি লিখিতেছেন। নীচে রোয়াকের উপর দুলিয়া পাড়ার ফকির দুলে, মাখনা দুলে, এবং অন্যান্য চাষী ও মজুরের দল দারোগাকে সম্মান দেখাইবার জন্য ভীড় করিয়া বসিয়া আছে। আসামী মধু ওরফে মাধবও সেখানে হাজির।

লেখালিখির কায শেষ করিয়া দারোগা সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রোয়াকের নীচে নীলকোর্ত্তা পরা গ্রামের চৌকিদার বসিয়াছিল। এবং তাহার পাশে দাঁড়াইয়াছিল দুইজন লাল পাগড়ী পরা সিপাই। দারোগাকে উঠিতে দেখিয়া সকলেই দাঁড়াইয়া উঠিল।

দারোগাবাবু আসামীকে উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে ?, লাঙল দুটো হরো ঠাকুরের গোয়াল থেকে নিয়ে গিছিস্? সত্যি করে বল।"

হাত জোড় করিয়া তোতা পাখীর মতই মধু উত্তর করিল, "সব

মিথ্যে কথা হুজুর, সব মিথ্যে কথা। আসল কথা যে জমীটা দুই পুরুষ ধরে আবাদ করতেছি না, সেটা কৌশলে উনি ছাড়িয়ে নিয়ে সেডা খাসে আনতে চান, আমি গররাজী হওয়াতেই এই গণ্ডগোল বাধছে হুজুর। হুজুর কোম্পানীর লোক, বিচার করে দেখবেন, হুজুর আমাদের মা বাপ।"

দারোগাবাবু ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ফরিয়াদি ছাড়া আরও দুইজন ত তোর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিচ্ছে। দেশ সুদ্ধ লোকের সঙ্গেই কি তোর দুষমণি আছে না-কি?"

দারোগার হুমকিতে কাঁদ কাঁদ হইয়া মধু উত্তর করিল, "হুজুর, ওরা হরো ঠাকুরের খাতক, হুজুর। টাকা ধার করে শুধতে নারছে। সব মিথ্যে কথা হুজুর, সব মিথ্যে কথা। পুলিশ দিয়্যাতো আমার বাড়ী ঘেরাও করিয়েছেন। চলুন হুজুর আমার বাড়ী। আমার নিজের কাল রঙের লাঙলা দুটা ছাড়া, আর কোনও লাঙলা সেথানে নেই। আমারও অনেক সাক্ষী আছে হুজুর।"

বেণী রায় এইবার ধমক দিয়া মধুকে বলিলেন, "চুপ কর বেটা। নিয়ে থাকলে কি তুই বামাল বাড়ীতে রাখবি না-কি? ঝুটমুট দারোগাবাবুকে বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছিস্।"

দারোগাবাবু বলিলেন, "সে কথা অবশ্য ঠিক। তবে কথাটা যখন উঠেছে, তখন বাড়ীটা ওর একবার দেখা দরকার। চলুন, দূর থেকে একবার দেখে আসি।"

দারোগার প্রস্তাবে সকলেই ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি প্রকাশ করিল। কেহ কেহ বলিয়া উঠিল, "না দারোগাসাহেব। গোয়ালটা ভাল করেই দেখা দরকার। লোকটা যে খুব সুবিধে তা নয়।"

বেণী রায় বলিল, "না না না, তা বলে অতটা নয়। এমন কথা"

আমি এখনও পর্য্যন্ত ওর সম্বন্ধে শুনি নি। তবে ছোটলোক মতিচ্ছন্ন হ'তে কতক্ষণ। চলু-উ-ন যাওয়া যাক।"

দারোগাবাবু সদলে অগ্রসর হইবার জন্য পা বাড়াইয়াছেন মাত্র এমন সময় হঠাৎ ফকির চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবু! আগুন, আগুন!"

সকলে ব্যস্ত হইয়া চাহিয়া দেখিল, বাড়ীর উঠানের কোণের বড় বড় দুইটা বিচালীর গাদাই দাউ দাউ করিয়া ধরিয়া উঠিয়াছে।

এই অগ্নিকাণ্ডের হোতা কে তাহা বুঝিতে কাহারও বাকি থাকে না। তবে সাঙ্গোপাঙ্গ সকলকে লইয়াই বেণী রায় অকুস্থলেই হাজির ছিলেন। এ সম্বন্ধে তাই হঠাৎ কেহ তাহাকে কোনও কিছু বলিতেও পারে না।

বেণী রায়ের দিকে একবার মাত্র চাহিয়া দেখিয়া তাহার পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া হরো ঠাকুর কাঁদিয়া উঠিলেন, "ওরে বেণী, এমন করে তুই আমার সর্ব্বনাশ করলি রে?"

বেণী রায় তাড়াতাড়ি হরো ঠাকুরের হাত হইতে পা দুইটা ছাড়াইয়া লইয়া চীৎকার সুরু করিলেন, "ওরে, ও ফকরে। দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? এই মেধো বেটাচ্ছেলে। শিগ্রী গোটাকতক কেনাস্তারার টিন নিয়ে আয়। জল জল। ওই ত দুটো বালতি রয়েছে। এই মাধনা বাঁ-আ-শ। বাঁশ নিয়ে আয়।"

আগুন বিচুলি গাদা দুইটা পুড়াইয়া ক্ষান্ত হইল না, তাহার লোল ও ক্ষুধিত শিখার আক্রমণ হইতে খড়ের চণ্ডীমণ্ডপ এবং বসত ঘর তিনটীও রক্ষা পাইল না। হরো ঠাকুর তাহার স্ত্রী ও কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, "ওগো তোমরা শিগ্রী বেরিয়ে পিছনকার বাগানে চলে যাও।"

দেখিতে দেখিতে আগুনের ফুল্কি বিচালি গাদা হইতে ছুটিয়া আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের ও শোবার ঘরের মটকা কয়টীও ধরাইয়া দিল। চারিদিককার

অন্ধকারের রেশ কাটাইয়া আগুনের শিখা ঝলকে ঝলকে উপরে উঠিতে থাকে। বাড়ীর ভিতর হইতে বাঁশ পোড়ার কট কট আওয়াজ ছাপাইয়া ক্রন্দনের রোল উঠিল। লোকের সমবেত চীৎকার ছাপাইয়া বেণী রায়ের গলা শোনা যাইতেছিল, "ফকির জল, জল নিয়ে আয়। সামনের ডোবায় আছে। বাঁশ দিয়ে চেপে ধর, চালটা পড়ে যাচ্ছে।"

আগুনের তেজে ও ধোঁয়ায় আর কাছাকাছি কোথায়ও দাঁড়ান যায় না। দারোগাবাবু সদলবলে পিছাইতে পিছাইতে বাড়ীর পিছনকার আম বাগানে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। হরো ঠাকুরের পরিবারবর্গও ইতিমধ্যে তাড়াহুড়া করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। তাহারাও দারোগা-বাবুর সহিত পিছনে বাগানে আসিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ হরোঠাকুরের মা লক্ষ্য করিল, সকলেই আসিয়াছে, আসে নাই শুধু হরো ঠাকুরের পাঁচ বছরের শিশু, অন্তে।

শাশুড়ীঠাকরাণী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওরে ও বাপরে, আমাদের অন্তে যে ভিতরে রয়ে গেলো। ওরে রাক্ষুসী তাকে তুই কোথায় রেখে এলি রে।"

ক্ষ্যান্তমণি হরো ঠাকুরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, ছেলেমানুষ বলিলেই চলে। বাড়ীর অপর সকলের মত আগুন দেখিয়া সেও ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। শাশুড়ীর কথা কানে যাইবামাত্র তাহার বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। চারিদিক ভাল করিয়া একবার চাহিয়া দেখিয়া চীৎকার করিয়া ক্ষ্যান্তমণি কাঁদিয়া উঠিল, "ওরে আমার অন্ত-রে-এ—"

অসহায় শিশুমাতা। ক্রন্দন ছাড়া সে কি-ই বা করিতে পারে। ক্ষ্যান্তমণির কান্নায় এবং হরো ঠাকুরের মায়ের আছড়ানিতে দারোগা-বাবু বিচলিত হইয়া উঠিলেন। দারোগাবাবু জলন্ত বাড়ীটার দিকে কিছুটা ছুটিয়াও গেলেন, কিন্তু বাড়ীর জলন্ত দেওয়ালক'টা আগুনের বেড়ার মতই তাঁহার গতিরোধ করিল।

বাড়ীটার অপরদিকে বেণী রায় ও পল্লবের দল, পাল্লা দিয়া রেষা-রেষি করিয়া স্ব স্ব সাধ্যমত আগুন নেবাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল। পল্লীগ্রামের আগুন মানুষের আয়ত্তের বাহিরে, চেষ্টা দ্বারা তাহার প্রতীকার হয় না তবুও তাহাদের চেষ্টার ক্রুটী ছিল না।

অগ্নি প্রাচীরের পিছন হইতে দারোগাবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ও মশাই! একটা ছেলে ভিতরে রয়ে গেছে-এ। ঠাকুর ঘরে এ।"

ঘরপোড়ার পট্ পট্ শব্দ এবং সাঁই সাঁই আওয়াজ ভেদ করিয়া দারোগার গলার স্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল। বাঁশ ও বালতি হাতে যাহারা এতক্ষণ ছুটাছুটী করিতেছিল, তাহারা দারোগার চীৎকারে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

দারোগার চীৎকার হরোঠাকুরেরও কানে গিয়াছিল। দারোগার চীৎকার শুনিয়া তিনি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, "কে? খোকা? ঘরের মধ্যে? এবং তাহার পর তিনি সেই জ্বলন্ত অগ্নিরাশির দিকে চাহিয়া সেইখানেই জ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়া গেলেন।

হরোঠাকুরের আর্ত্তনাদ ও দারোগার চীৎকার পল্লবেরও কানে গিয়াছিল। ঠাকুর ঘরের অবস্থিতি পল্লবের ভাল করিয়াই জানা ছিল। কতদিন সে সেই ঠাকুর ঘরের মেঝের উপর কুশাসন পাতিয়া হরো ঠাকুরের মায়ের হাত হইতে ঠাকুরের প্রসাদ খাইয়াছে। এক সঙ্গে অনেক স্মৃতিই তাহার মনের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া পল্লব ঠাকুর ঘর লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিল।

বেণী রায় নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, পল্লবকে ছুটিতে দেখিয়া তিনি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাহার পর তাহাকে জোর করিয়া পিছনের দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ভট্টচার্য্যের ছেলে চালকলা খেয়ে মানুষ হয়েছে। এসব কি তোমাদের কায? কেন বেঘোরে প্রাণটা হারাবে? দাঁড়িয়ে দেখো।"

বেণী রায়ের ধাক্কা খাইয়া পল্লব বসিয়া পড়িয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বেণী রায়কে তিক্তস্বরে কিছু বলিতে যাইতেছিল; হঠাৎ সে চাহিয়া দেখিল, কাপড়টা বেশ করিয়া কোমরে জড়াইয়া বেণী রায় জ্বলন্ত ঠাকুর ঘর লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

বেণী রায়কে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ঢুকিবার উপক্রম করিতে দেখিয়া ফকির, হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "কর কি, দাঠাউর, চালটা যে পড়ল বলে।"

বেণী রায় বলিল, "ভট্‌চার্য্যের ছেলে পল্লব চাল চাপা খেয়ে নাম কিনবে, আর আমি দাঁড়িয়ে তা দেখব, পাগলা না-কি? সরে যা বলছি।"

অসীম সাহস ছিল এই বেণী রায়ের। কাহারও বারণ সে কখনও শুনে নি, আজও শুনিল না। ফকিরের হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া সে ধূমাচ্ছন্ন অন্ধকার ঘরটার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল; সকলে বুঝিল বেণী রায়ের জীবন্ত সমাধি হইতে চলিয়াছে।

মাত্র দুই মিনিটের ব্যবধান, হরো ঠাকুরের তিন পুরুষের ঠাকুর ঘরের খোড়ো চালটা আধ পোড়া হইয়া হইয়া কাৎ হইয়া পড়িল এবং উহার অপর দিকটা সেগুন কাঠের খুঁটীগুলির সহিত আরও জোরে জ্বলিয়া উঠিল। বেণী রায়ের জীবনের আশা সকলে ছাড়িয়াই দিয়াছিল। কিন্তু যে সকলকে মারিবার জন্য জন্মিয়াছে; বোধ হয় সে নিজে সহজে মরে না, বেণী রায়ও মরিল না। সকলে অবাক হইয়া দেখিল, বেণী রায় বিছানা সুদ্ধ খোকাকে জড়াইয়া লইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে।

বেণী রায় বাহির হইয়া আসিবা মাত্র পুরা চালখানি সম্মুখের দেওয়ালটী লইয়া মাটির উপর লুটাইয়া পড়িল। সামনেই পল্লব দাঁড়াইয়াছিল। বেণী রায় তাহার দিকে অক্ষত দেহ শিশুটীকে ছুঁড়িয়া দিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া গেলেন। চালের কতক অংশ তাহার হাঁটুর উপর আসিয়া পড়িল।

বেণী রায় সজোরে পা-খানি চলন্ত চালের তলা হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, ও ফকরে! যা' শিগ্গী সিন্দেরী পাতা নিয়ে আয়; ভয়ঙ্কর ফোস্কা পড়ে গেছে। যা চট্ করে, তাড়াতাড়ি—"

ফকির আর দ্বিরুক্তি না করিয়া হাতের ক্যানেস্তারীর টিনটা উঠানের উপর নামাইয়া রাখিয়া সিন্দেরী পাতা আনিতে ছুটিল। হরো ঠাকুর এতক্ষণ অবাক হইয়া বেণী রায়ের কাণ্ড দেখিতেছিলেন। এইবার তিনি ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ওকে অমন করে বাঁচাবিই যদি, তবে ওর বাপ পিতমর ঘর কখানা পোড়ালি কেন?"

বেণী রায়ের পায়ে অনেকগুলি ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছে। যন্ত্রণাও হইতেছিল কম নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও বেণী রায় হাসিয়া ফেলিয়া উত্তর দিল, "ওর সঙ্গে ত আমার কোনও শত্রুতা নেই ভট্চায; ও আমার নামে দরখাস্তও দেয় নি, শুধু এই জন্যে।"

বেণী রায়ের কথায় হরো ঠাকুর আজ আর রাগ করিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সোঁদ বছরের ধান ত পুড়ে গেল, তার সঙ্গে ভিটার ঘরখানাও, এখন ও খাবেইবা কি, থাকবেই বা কোথায়?"

বেণী রায় বলিল, "কেন হরিকা। আমার বাড়ীটা ত আছে। সেখানে কাজে থাকবারও অসুবিধে হবে না, খাবারও না। অবশ্য সে এখন আপনাদের ইচ্ছে।"

৪

গ্রাম্য দীঘী। প্রায় একশ বিঘার উপর জলকর। তবে দীঘীর পূর্ব্ব গৌরব আর নাই। পূর্ব্বদিকে একটী ইষ্টক নির্ম্মিত বিস্তীর্ণ ঘাটও ছিল

কিন্তু আজ আর তাহা নাই। স্থানে স্থানে কয়েকটী করিয়া পাতলা ইট পড়িয়া আছে মাত্র। বর্ষার ধোঁয়াটে জল দীঘীর সমুচ্চ পাড় স্থানে স্থানে ধ্বসাইয়া দিয়াছে। প্রশস্ত বকচর কমিয়া কমিয়া জলের সহিত মিশিয়া আসিতেছে।

দীঘীর এই দুরবস্থার কারণও ছিল এই বেণী রায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হঠাৎ একদিন একটা খেয়ালের বশে তিনি এই দীঘীর পাড়ের জমী গুলির চাষের জন্য বিলি করিয়া দিতে সুরু করেন। যে পাড় গত একশত বৎসর ধরিয়া সর্ব্বসাধারণের দ্বারা গোচর ভূমি রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল, সেইখানে সুরু হয় চাষ। প্রতি বৎসর বর্ষার ধোঁয়াটে নামিয়া আসে এবং দীঘীর খাত ভরাট হইয়া যায়। কিন্তু সেদিকে বেণী রায়ের খেয়াল থাকে না।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে প্রতিদিনের অভ্যাসমত দীঘীর স্নিগ্ধজলে বেণী রায় গাত্রধৌত করিতেছিল। এমন সময় পল্লব কয়েকজন গ্রাম্য ছেলেকে সঙ্গে লইয়া সেইখানে আসিয়া হাজির হইল।

জলের কিনারার কাছ বরাবর নামিয়া আসিয়া পল্লব কহিল, "বেণীকাকা।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বেণী রায় উত্তর দিল, "বেণীকাকা! কে তোর বেণীকাকা?"

পল্লব বলিল, "আপনার কাছে আমাদের একটা আব্দার আছে।"

বেণী রায় উত্তর করিল, "আব্দার? আমার কাছে? চালাকি পেয়েছ?"

পল্লব বলিল, "দেখুন দীঘীর পাড়ের এই চাষ আপনাকে বন্ধ করতে হবে, নইলে যে দীঘী আজ গ্রামের প্রাণস্বরূপ, সেই দীঘীই একদিন মজে গিয়ে গ্রামের সর্ব্বনাশের কারণ হবে। আপনার পূর্ব্বপুরুষদের

উৎসর্গীকৃত দীঘী হবে নানা রোগের আকর। ইতর-ভদ্র কেউই আর তখন এ গ্রামে টিকতে পারবে না, বুঝলেন।"

ভেঙচে উঠে বেণী রায় উত্তর দিলেন, "খুব বুঝেছি, দীঘী বুজে গেল; আর আমি বুঝি নি। ভারি আমার বন্ধু রে! তোরা আমার কে যে, তোদের জন্য আমি আমার এত বড় একটা আয়ের পথ বন্ধ করব।"

এইরূপ একটী উত্তরের জন্য পল্লব প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছে। শান্ত ভাবে পল্লব উত্তর করিল, "কিন্তু আপনার তাঁবের ইতর লোকেরা, তারা ত আপনার বন্ধু লোক। মরলে ত শুধু ভদ্রলোক মরবে না, চাষারাও ত মরবে।"

উত্তরে বেণী রায় বলিল, "বেশত মরুক না। জমা দেওয়া জমী গুলো সব তাহলে এমনিই খাসে এসে যাবে। জমীদারের তাতে লাভ বই ক্ষতি নেই।"

বেণী রায়ের কথায় পল্লবের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। কড়া মেজাজেই পল্লব উত্তর দিল, "তা ত বুঝলাম, কিন্তু তার সঙ্গে ত আপনিও মরবেন। বংশে বাতি দিতে কেউই যে আর অবশিষ্ট থাকবে না।"

অপুত্রক বেণী রায়কে বংশ তুলিয়া কথা বলা যে উচিত হয় নাই, কথা কয়টী বলিয়াই পল্লব তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। বংশের কথায় বেণী রায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। জ্বলিয়া উঠিয়া তিনি বলিলেন, "বটে, বড্ড বাড় বাড়া হয়েছে। আচ্ছা দাঁড়া তবে, মজা দেখাচ্ছি তোদের।"

নিকটেই দীঘীর পাড়ের উপর চাষা পাড়ার মদনা এবং তার ভাই গগনা লাঙ্গল দিতেছিল। বেণী রায় তাহাদের উদ্দেশ্যে হাঁকিয়া উঠিলেন, "ওরে ও গগনা, ও মদনা। নেমে আয় ত একবার।"

মনিবের হাঁকে গগনা এবং মদনা উভয়েই চাষের কায ফেলিয়া নামিয়া আসিল। এবং বেণী রায়ের নিকটে গিয়া হাত জোড় করিয়া প্রণাম জানাইয়া কহিল, "পেরণাম হই কর্ত্তা, ডাক দিচ্ছিলেন।"

বেণী রায় বলিলেন, "হ্যাঁ, দেখ। কাল থেকে উত্তর পূবের মত দখিণ পাড়েও চাষ সুরু করবি, বুঝলি ?"

ছেলেদের দল সেইদিন প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছে। যে কোনও বিপদ বরণ করিতে তাহারা বদ্ধপরিকর। পল্লব [illegible] নেত্রে ছেলেদের দিকে একবার তাকাইল। পল্লবের দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়া একজন বলিয়া উঠিল, "আমরা ঠিক আছি, পল্লবদা। ওঁকে বলে দিন আপনি।"

অপর ছেলে গুলির দিকে বেণী রায় এতক্ষণ তাকাইয়াও দেখেন নাই। তাহাদের এইরূপ সাহস-পূর্ণ কথাবার্ত্তা তাহাঁকে অবাক করিয়া দিয়াছিল। বিস্মিত হইয়া বেণী রায় বলিলেন, "ওরে, ও গগনা। এরা বলে কিরে। এ্যা? ওটা কে? নরেনের ছেলে না? আর ওটা? হরোর ভাইপোটা বুঝি! আ-চ্ছা—"

বেণী রায়কে রক্ত চক্ষু হইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া ছেলেদের দল ভড়কাইয়া গিয়াছিল। কোনরূপ উত্তর করিতে তাহাদের আর সাহস হইল না। উত্তর করিল পল্লব। দীঘীর উত্তর-পশ্চিম দিককার সমৃদ্ধ পাড় দুইটী এবং তাহার উপরকার তাল বৃক্ষের সার এবং নীল বনানীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পল্লব বলিল, "দক্ষিণ পূর্ব্ব পাড় দুটা ত অনেক দিনই সাদা হয়ে ধ্বসে পড়েছে জলের তলায়। বাকি আছে শুধু উত্তর এবং পশ্চিম দিককার পাড়। থাক না ও দুটা, কাকাবাবু।"

ক্রুদ্ধ হইয়া বেণী রায় উত্তর করিল, "কাকা বাবু! ফের কাকা বাবু! সত্যি করে বল দিকি মতলবটা তোদের কি? চাস্ কি তোরা?"

উত্তরে পল্লব বলিল, "আমরা চাই পাড়ের উপরকার ঐ চাষ বন্ধ করতে। দরকার হলে আমরা এ জন্যে লাঠিও ব্যবহার করব।

আপনার পূর্ব্বপুরুষেরা দীঘীটা উৎসর্গ করেছিলেন, গ্রামের লোকের সুখ সুবিধার জন্যে, ওতে আপনার মত আমাদেরও অধিকার আছে।”

অবাক হইয়া বেণী রায় বলিলেন, “ওরে, ও গগনা। ভটচায্যির ছেলে, আবার লাঠি ধরতে শিখল কবে রে? ওরা যে আমাদেরও লাঠি দেখায়। ব্যাপার কি?”

গগনা এবং মদনা উভয় ভ্রাতাই পল্লবের সাহস দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের ছোটবাবুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া উঁচু-নীচু কথা বলিতে গ্রামের ইতর-ভদ্র কাহাকেও ইতিপূর্ব্বে তাহারা কখনও দেখে নাই।

উত্তরে গগনা বলিল, “লাও দাঠাউর। ওদের জন্যে আর লাঠির দরকার হয় না। বেথারিই যথেষ্ট। সে কিছু নয়, তবে এর মধ্যেও একটা কথা আছে কর্ত্তা।”

বেণী রায় জিজ্ঞাসা করিল, “এর মধ্যে আবার কথা কি? তুইও কি ভয় পেলি নাকি? হ্যাঁ রে—”

দূরের জঙ্গলাকীর্ণ সমৃদ্ধ পাড় দুইটার দিকে একবার ভীত ত্রস্ত ভাবে চাহিয়া দেখিয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে গগনা উত্তর করিল, “না কর্ত্তা তা নয়। হুকুম দেন ত আসল কথাটা বলে ফেলি। এ ধারের পাড় দুটোয় হাত দিয়ে ত কর্ত্তা আপনার একমাত্র পোলাটা চলে গেল। আর আমার গেল, চার চারটা জোয়ান ছেলে আর পাঁচ পাঁচটা নাতি, মাত্র এই ক’বছরের মধ্যে। এখন বাকি আছি আমি আর আমার এই বুকের ছাতি; তবে কি জানেন কর্ত্তা, একটা পুষ্যি নিয়েছি এবার। তাই একটু ভয় করে কর্ত্তা। ওখানে বোধ হয় দেবতা আছেন হুজুর।”

পাড়ের চাষ লইয়া গ্রামের লোকেদের মধ্যে একটা বিভীষিকা ছিল। গত একশত বৎসর ধরিয়া যে যখন চাষের আশায় পাড়ে হাত দিয়াছে, সেই-ই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। উহাদের অনেকের আবার বংশ পর্য্যন্ত নাই। লোকের বিশ্বাস, ইহার মূলে আছে দেবতার

অভিশাপ। শেষ চেষ্টা করিতেছিল বেণী রায় নিজে। ক্ষতিগ্রস্তও সে কম হয় নাই। কিন্তু কোনও রকম কু-সংস্কারেই তাঁহার আস্থা ছিল না। গগনার কথায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বেণী রায় বলিলেন; "দূর পাগলা, ওই জন্যেই কি আর এই হয়। ম'লে তুই মরতিস, আমি মরতাম, শুধু তোর আমার ছেলে মরবে কেন? একজনের দোষে কি আর একজনের সাজা হয়। ওসবই বাজে। দেখ, আমি ব্রাহ্মণ। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তোর কোনও ভয় নেই। পাড় দুটো বিনা খাজনায় তোর পুষ্যির জন্যই রইল, বুঝলি। কাল থেকেই তুই চাষ সুরু কর। নিষ্কর চল্লিশ বিঘা জমী। অনেক দিনের পড়ো। সোনা ফলবে রে, সোনা ফলবে।"

পাড় দুইটীর দিকে একবার ভীতলুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া লইয়া গগনা উত্তর করিল, "আপনার হুকুম যখন হইয়েছে কর্ত্তা, তখন তা কি আমি অমান্যি করতে পারি? আপনাদের খাইয়েই ত এত বড়টা হয়েছি। কপালে যা আছে তা ত হবেই, আচ্ছা, লাগে-এ—"

পল্লবের দিকে চাহিয়া বেণী রায় বলিল, "মনে করেছিলাম, ওদুটো পাড়ে আর হাত দেব না, যাক—"

বেণী রায়ের সদৃঢ় বপু, পেশীবহুল ও দীর্ঘাকৃতি দেহের দিকে পল্লব একবার চাহিয়া দেখিল। পল্লব কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না, স্বাস্থ্যে সৌন্দর্য্যে এবং ক্ষমতায় যে লোকটীকে বাঙ্গালীর গৌরব বলা যেতে পারে তাহার প্রকৃতিটা এমন ভয়ঙ্কর কেন?

পল্লব প্রশ্ন করিয়া বসিল, "আচ্ছা বেণীকা। যখনই আপনি বুঝতে পারেন, এই কাযটা করলে গাঁয়ের ক্ষতি হবে, তখনই আপনি আগে সেই কাযটিতেই হাত দেন। কিন্তু কেন আপনি এমন করেন বলুন ত?"

বেণী রায় বলিল, "কেন? কেন, তা তোদের বাপ খুড়োকে জিজ্ঞেস করে দেখিস।"

পল্লব জিজ্ঞাসা করিল, "ও কথা ত আপনি প্রায়ই বলেন, শুনি।

বেণী রায় বলিল, "হাঁ হাঁ ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে। কিন্তু তবুও তাঁরা সেদিন আমাদের বাড়ী আহার করেন নি। আহার করে গিয়েছিল পাড়ার শূদ্রেরা, ছোট লোকেরা। তাই বরাবরই আমি শূদ্রদের তাদের দোষে গুণে দিই কোল, আর ভদ্রলোকেদের মুখদর্শনও করি না। আর তুই, তুই পল্লব, সেই ভদ্রলোকের ছেলে। তোকে আজ আর আমি ছাড়ছি না।"

কথা বলিতে বলিতে বেণী রায়ের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। তপ্ত অশ্রুজল বেণী রায়ের অগ্নিবর্ষী চক্ষু হইতে ঠিকরাইয়া আসিয়া উহার দুই ফোঁটা পল্লবের হাতে পড়িয়া তাহাকে সচেতন করিয়া দিল। পল্লব সভয়ে চাহিয়া দেখিল, বেণী রায় দাঁতে দাঁত চাপিয়া মুঠি পাকাইয়া তাহার দিকে আগাইয়া আসিতেছেন।

পল্লবের দলে ছিল মাত্র তিন জন ছেলে। বেণী রায়কে হিংস্র জন্তুর ন্যায় পল্লবের দিকে আগাইয়া আসিতে দেখিয়া সভয়ে তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিল, "পল্লবদা।"

ছেলে তিনটীর দিকে বেণী রায় একবার তাকাইয়া দেখিলেন এবং তাহার পর চীৎকার করিয়া গগনাকে আদেশ করিলেন, "এই ধর তো ক' বেটাকে চেপে, দেখছি এদের একে একে—"

ইহার পর বেণী রায় তাহার পেশী বহুল হাত দুইটা দিয়া পল্লবকে ঘাটের ধারের বটগাছটার গোড়ায় সজোরে ঠেসিয়া ধরিলেন। পল্লব এজন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ কণ্ঠনালীর উপরে চাপ পড়ায় সে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। এদিকে গগনার ভাই মদনা একটী ছেলেকে বুকের উপর হাঁটু দিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে। ওদিকে গগনা নিজে দুই হাতে অপর দুইটা ছেলের গলা দুইটা চাপিয়া ধরিয়া ঝাঁকুনি দিতে সুরু করিয়াছে। কাহারও আর নড়িবার শক্তি নাই। চেঁচাইতেও পারে না কেহ। চেঁচাইতে থাকে শুধু বট গাছে ঝুলে থাকা শত শত বাদুড়ের

দল। কিন্তু তাহাদের দুর্ব্বোধ্য ভাষা দীঘীর পাড়গুলোর ওপারে গি আর পৌছায় না।

বেণী রায় লক্ষ্য করিল পল্লবের জীব ও চোখ ঠিকরাইয়া বাহির হই আসিবার উপক্রম হইতেছে। কি ভাবিয়া বেণী রায় তাঁহার হাতের মু শিথিল করিয়া গগনাকে বলিল, কিরে গগনা, মশা মেরে হাত গন্ধ করবি না ছেড়ে দিবি?

গগনা বলিল, "শত্রুর শেষ রাখতে নে[illegible] কর্ত্তা, ধরেছি যখ দিই শেষ করে। বলেন তো চুবিয়ে ধরি সব ক[illegible] দীঘীর জলে তারপর পাঁকের মধ্যে পুঁতে ফেললেই হবে। কেউ নেই এখানে। আর তা'হলে সময় নষ্ট করবেন না, কর্ত্তা।

হয়তো সেই দিনই পল্লব এবং তার বন্ধুত্রয়ের সলিল সমাধি ঘটিত। কিন্তু বাদ সাধিলেন ভগবান। হঠাৎ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল দুর্দ্দান্ত বেণী রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী পারুল। এই সময় পারুলের দীঘীর ঘাটে আসিবার কথা নয়। কিন্তু পল্লবের এই অভিযানের কথা শুনিয়া ভয় পাইয়া সে ছুতা করিয়া দীঘীর ঘাটে জল আনিতে আসিয়াছে।

পারুল ছুটিয়া আসিয়া বেণী রায়ের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল, "কি করছেন কাকাবাবু, ওকে ছেড়ে দিন।"

বেণী রায় এইবার পল্লবকে ছাড়িয়া দিয়া পারুলকে চে[illegible] ধরিয়া বলিলেন, "বটে এ, বড্ড দরদ দেখছি যে, তা'হলে অনেক এগিয়েছো, এ্যাঃ? আচ্ছা, তাহলে তোকেও এদের সঙ্গে শেষ করবো। কি-রে, কি বলিস গগনা?"

পারুল কিন্তু ইহাতে ভয় পাইল না। সে আরও জোর করিয়া বেণী রায়কে জড়াইয়া ধরিয়া মাথাটা নিশ্চিন্ত মনে তাঁহার বুকের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "বেশ ত কাকাবাবু, দিন না। আমি তো আপনাদেরই মেয়ে। ইচ্ছে হয় দিন শেষ করে। কিন্তু পরের ছেলেকে ছেড়ে দিন।

বেণী রায় ধীরে ধীরে বাম হাতটি শিথিল করিয়া পারুলের গলার উপর রাখিলেন এবং তাহার পর কি ভাবিয়া ডান হাতে তাহার পিঠের উপর সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিলেন, "তোর কি এই সব শোভা পায়? তুই কি ভুলে গেছিস, কত বড় বংশের মেয়ে তুই। এ তল্লাটের যে কটা জমিদার আছে, তাদের সব ক'জনেরই পূর্ব্ব পুরুষ একদিন না একদিন আমাদের কাছারীতে নায়েব ছিল। আমি তোর জন্যে বলদেপুরে কথাও পেড়েছি? এ বংশের মেয়ে পেলে তারা কৃতার্থ হয়ে যাবে, বুঝলি!"

পারুল বলিল, "এত বড় বংশের মেয়ে বলেই আমাদের আর অন্যমত করা উচিত নয়, কাকাবাবু। তা ছাড়া বাবার এতে মত আছে। আমার মুখ চেয়ে পল্লবদাকে তুমি ক্ষমা করো কাকাবাবু।"

বেণী রায় বলিল, "কি বলিস্ তুই পারু! ওকি আমার শত্রু হবার যুগ্যি? ওরে, ও গগনা, তুই কি বলিস্। শত্রুতা করবি সমানে সমানে। আচ্ছা, যাকগে যাক্, যেতে দি ওদের, কি বলিস্?"

গগনা বলিল, "তাই দেন, যাতি দেন কর্ত্তা। তা ছাড়া বড়বাবু যখন মত করেছেন, আর পারুদি যখন এতটাই এগিয়ে এইয়েছেন, তখন কর্ত্তা পেল্লববাবুকে মাপ করে দেওয়াই ভাল।"

বেণী রায় উত্তর করিল, "চুপ কর বলছি। একি তোদের ছোট-লোকের মত না কি, যে ভাব হলেই বিয়ে দিতে হবে। বড়দা বললেই হলো, ওকি বড়দার একার মেয়ে নাকি! ও হচ্ছে রায় গোষ্ঠির মেয়ে, আচ্ছা দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি বেটাকে। বেটার বামুন হয়ে চাঁদে হাত। বেটা আমাদের সমান সমান হোক আগে।"

পল্লব তখনও সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাঁপাইতেছিল। কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া ক্ষীণ স্বরে সে বেণী রায়ের কথার উত্তর করিল, "সে আশা শীঘ্রই আপনাদের পূরণ হবে, বেণীকাকা, আমরা শীঘ্রই দেখিয়ে

দেব, অন্ততঃ এক দিক দিয়েও আমরা আপনার সমকক্ষ। অতর্কিতে আক্রমণ না করলে, আজই এক প্যাঁচ দেখিয়ে দিতাম।"

কথা কয়টা বলিয়া পল্লব আর অপেক্ষা করিল না। সঙ্গের ছেলে তিনটীকে ডাকিয়া লইয়া সে প্রস্থান করিল।

বেণী রায় বলিলেন, "আরে! দেখছি, এ একেবারে নির্লজ্জ, বলিহারি। কিন্তু ছোক্‌রা, একটা কথা বলে রাখি। [illegible] করে সমান হওয়া যায় না, কেলাব না করে আগে একটা আখড়া বানা, [illegible]? একটা আখড়া বানা। তারপর লাগতে আসিস্।"

গগনা বলিয়া উঠিল, "দুৎ তেরি, আচ্ছা! যেতে দিন কর্ত্তা, এক মাঘে আর শীত পালায় না, হেঃ—

৫

সেদিন ছিল বনভোজনের দিন, উৎসবটা নিছক মেয়েদেরই। দলে দলে গ্রাম্য মেয়েরা ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে পোঁটলা বাঁধিয়া চিড়া মুড়কী প্রভৃতি আহার্য্য লইয়া একত্রে আহার করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামের প্রান্তদেশে একটী পুরাণ বটবৃক্ষের তলায় আসিয়া জমা হইতেছে। আহারের সহিত চলিতেছে আলোচনা।

একথা ওকথার পর চাটুয্যে বাড়ীর গিন্নী রায় গোষ্ঠির [illegible] পাড়িলেন। রায় গোষ্ঠির কথা উঠিবামাত্র, গাঙ্গুলী বাড়ীর কুরু পিসী বলিয়া উঠিলেন, "দেখে নিস্ বউ, ভেস্তাক্তির পোয়াবে না, হরে. ঠাকুরের মত লোক হয় না। সাতে নেই পাঁচে নেই, নিরীহ বামুন, ভিটেটা পর্য্যন্ত তার পুড়িয়ে দিলে গা, ডাকাত মিনসে।"

মেয়েদের দলে হরো ঠাকুরের বউ ক্ষ্যান্তমণিও উপস্থিত ছিল। শিহরিয়া উঠিয়া ক্ষ্যান্তমণি বলিল, "ওকথা বলবি না মা। তেনার স্ত্রী

বড় ভাল নোক। পথে বসা আমার কপালে নেকা ছিল, তাই আমি পথে বসলাম। তা বলে—"

উত্তরে ঝঙ্কার দিয়া গাঙ্গুলী পিসী কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাহা আর তাঁহার বলা হইল না। একজন বর্ষিয়সী মহিলা সজোরে তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন, রায় গোষ্ঠির ছোট বৌ, দুর্দ্দান্ত বেণী রায়ের স্ত্রী কখন যে তাঁহাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা কেহ টের পাননি। সভয়ে সকলে তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিলেন।

সারদামণি আগাইয়া আসিয়া হরি ঠাকুরের স্ত্রী ক্ষ্যান্তমণির হাত দুইটী দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া অনুযোগ করিয়া বলিল, আমার মুখের দিকে চেয়ে ওঁকে ক্ষমা করো দিদি। কোন শাপ মন্যি আর দিও না।"

ক্ষ্যান্তমণি বলিল, "কি বলছেন দিদি। শাপ মন্যি দেব কেন? উনি আমার অন্তেকে বাঁচিয়েছেন। বরং আমি প্রার্থনা করি, তোমার সিথির সিঁদুর আরও উজ্জল হোক।"

সারদামণি উত্তর করিল, "তা তুমি পারছো দিদি। এর চেয়ে শাপ দেওয়া ভাল ছিল। তাতে শোধেবোধে কিছুটা পাপ হয়তো ক্ষয় হত। তোর এই প্রাণ ঢালা আশীর্ব্বাদের জন্তেই আমি ভয় পাচ্ছি বৌ, হয় তো ওঁর পাপের ভার এবার পূর্ণ হয়েছে।"

কথা বলিতে বলিতে সারদামণি কাঁদিয়া ফেলিল।

সারদামণিকে কাঁদিতে দেখিয়া ক্ষ্যান্তমণি তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া সারদামণির চোখ দুইটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কাঁদিস না দিদি। সত্যই প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করেছি, বেণী ঠাকুরপোর একশ বছর পরমায়ু হবে।"

সারদামণি বলিল, "আমি তা কখনও চাইনি, দিদি। আমি এইটুকু শুধু চাইছি যে ব্রহ্মশাপ যদি বর্ত্তায় তা যেন আমার উপরই বর্ত্তায়।"

ক্ষ্যান্তমণি উত্তর দিল, "ব্রহ্মশাপ কি তোর মতন সতীর স্বামীর কিছু করতে পারে রে? ব্রহ্মশাপ সতীর তেজের সামনে মিইয়ে যায়, তা কি তুই জানিস না? আর ঠাকুরপো বেশীদিন এই-রকম আর থাকবে না। শীঘ্রই শুধরে যাবেন, এ আমি সেই দিনেই জেনেছি অনেকেই সেদিন সেখানে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু কৈ অমনি করে অন্যেকে বাঁচাবার জন্যে তো কেউ অগ্রসর হন নি। আমার ঘর গেছে, এ জন্য দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু রাগ হচ্ছে না।"

পার্শ্বের একটা চেটাইয়ের উপর ক্ষ্যান্তমণির ছেলে অন্তে খেলা করিতেছিল। কথা কয়টা শেষ করিয়া ক্ষ্যান্তমণি সস্নেহ দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। ভরসা পাইয়া সারদামণি বলিলেন, "কিন্তু এরকম তিনি চিরকাল ছিলেন না, দিদি। ছোট-বেলা থেকে তাঁকে আমি দেখে আসছি। ওরকম মায়া দয়া কারো মধ্যেই আমি দেখিনি। ওরকম উনি হয়ে গেলেন, দিদি মারা যাবার পর থেকে। তাঁকে উনি বড় ভালবাসতেন দিদি, বড় ভালবাসতেন। মা কালী যদি তাঁর পোলাটাকেও রাখতেন; তাও তো তেনা রাখলেন না। তাই উনি অমন হয়ে গেলেন।"

মুখুয্যেদের বড়গিন্নী এতক্ষণ চুপ করিয়া সারদামণির সওয়াল শুনিতেছিলেন। এইবার তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। ভয় ডর তাঁর একেবারেই নেই। কাণ্ডজ্ঞানও ছিল তাঁর কম। সেকেলে বুড়ী তিনি, গাঁয়ের অনেক খবরই তাঁর জানা ছিল। ঝঙ্কার দিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ঘাটাসনি বাপু আমাকে। সাতকাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। তোর দিদির কীর্ত্তি-কলাপ গাঁয়ে কারো আর জানতে বাকি ছিল না। মনে পাপ না থাকলে কি আর কেউ আত্ম-হত্যে করে গা! আমি আজকের মানুষ নইরে, আমি আজকের মানুষ নই। আমি সবই জানি। দিদির নাম নিয়ে এসেছিস স্বামীর দোষ স্খালন করতে?

বড়গিন্নী থাকমণির কথার মধ্যে সত্যতা না থাকিলেও তিক্ততা ছিল। তাঁহার সতীসাধ্বি দিদির নামে এই অপবাদ তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না।. রাগে ফুলিয়া উঠিয়া সারদামণি বলিলেন, "রায়গুষ্টির ঝি বৌ আর যা'ই হোক কুলটা নয়। মুখটা একটু সামলে কথা বলবেন। উত্তর দিতে আমরাও জানি।"

মুখুয্যেগিন্নীও ছাড়িবার পাত্র নন। গলার সুর আরও চড়াইয়া দিয়া তিনি উত্তর করিলেন, "তা আর জানবি না, ডাকাতের বৌ তুই! রায়গুষ্টির ছেলেমেয়েদের গুণাগুণ এ গাঁয়ে কারো অজানা নেই। সেকেলের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু একালেই বা কি হচ্ছে! জিজ্ঞেস করে দেখ ওই পদ্দিপিসীকে? নিজের চোখে দেখা ওর। বলি, ভাসুরঝির গুণাগুণের কোনও খবর রাখিস?

বাঁড়ুয্যে বাড়ীর মেজগিন্নী এতক্ষণ অবাক হইয়া এদের বাদানুবাদ শুনিতেছিলেন। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কে, পারু? সে যে একটা বাচ্ছা মেয়ে গো?"

মুখুয্যেগিন্নী উত্তর করিলেন, "হাঁ, হাঁ, বাচ্ছা সবাই, পনের বছর বয়স হতে চলেছে। বাচ্ছা! কিরে, ও পদী বল না! পল্লব আর পারুলকে সেদিন কোথায় কি ভাবে দেখেছিলি, বল না। বল! সত্যি কথা বলবি, তার আর ভয় কি?"

পদ্দিপিসী বলিল, "তা ওঁকে আর ও কথা বলেন কেন, দিদি। ওই যা গুষ্ঠি এক, তা ছাড়া ওঁদের সঙ্গে তো এনাদের আর কোনও সম্পর্ক নেই। বাড়ী আলাদা, হাঁড়ী আলাদা।"

সারদামণি উত্তর করিল, বাড়ী আলাদা হাঁড়ী আলাদা, কিন্তু নাড়ী আলাদা নয়। এরকম মিথ্যে অপবাদ রায় বাড়ীর মেয়েদের নামে যদি তোমরা দাও, তা আমরা কিছুতেই সহ্য করব না। আগে থেকেই তা বলে রাখছি, হাঁ—"

মুখুয্যে গিন্নী বলিলেন, "কি বলে রাখছিস্? বলি মোদের রবি কি না? কার মুখ চাপা দিবি। এই তোর এয়ো সংক্রান্তির তে অনেক এয়োকে তো নিমন্ত্রণ করে এসেছিস্। দেখিস ..., তোর খানে কজন এয়ো যায়।

সারদামণি এমনি একটা আশঙ্কা করেন নাই। স্বামীর মঙ্গলের ন্যে সারদামণি এয়ো সংক্রান্তির ব্রত উদ্‌যাপন করিতেছিলেন। এই পলক্ষে অনেক এয়োস্ত্রীকেই তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আয়োজনও রিয়াছেন তিনি প্রচুর। এই জন্য তাঁহাকে কয়দিন হাড়ভাঙা খাটুনিও টিতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া এ বিষয়ে বেণী রায়কে রাজী করাইতেও াকে কম বেগ পাইতে হয় নাই। মুখুয্যে গিন্নীর কথায় ...রদামণি স্তিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সরদামণি চুপ করিয়াই দাঁড়াইয়া ছিলেন। হঠাৎ পারুলে... গলা নিয়া তিনি চমকাইয়া উঠিয়া ফিরিয়া তাকাইলেন। পারুল ... র ড়কীর পুঁটলিটী পথের উপর নামাইয়া রাখিয়া ডাকিতেছিল, "কাকি..."

পারুলকে দেখিয়া মুখুয্যে গিন্নীর রাগ আরও চড়িয়া গেল। পার... মুখে পাইয়া তিনি তিক্ত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "দাঁড়া, দাঁড়া ... মি উঠি আগে, তার পর বসিস্। খেতে টেতে দিবি না, না ...? কুরের প্রসাদ নিয়ে এই বসছি, সব মাটি করে দিলে গা।"

তাহাকে লইয়া পাড়ার এই ঘোঁট সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেই পারুল কিছু ছু শুনিয়াছিল। তাঁহাকে এ সম্বন্ধে জানাইয়া যাইবার মত দু'মুখো াপেরও অভাব নাই। উত্তরে পারুল বলিল, "আমিও ঠাকুর পূজা রি, ঠাকুমা।"

পারুলের কথায় মুখুয্যে গিন্নী আর কোনও উত্তর করিলেন না। কবার মাত্র তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে পারুলের দিকে তিনি চাহিয়া দেখিলেন। হার পর খাবারের ধামাটা কাঁকালের উপর তুলিয়া লইয়া উঠিয়

দাঁড়াইলেন। উত্তর দিলেন গাঙ্গুলী বাড়ীর বড় বৌ। খাবারের পাতাটা পারুলের নিকট হইতে কিছু দূরে সরাইয়া লইয়া তিনি উত্তর করিলেন, "একটু বুঝে সুঝে চলতে হয় মা।"

পারুল বলিল, "বুঝে চলবার আমাদের তো কোনও দরকার করে না, জ্যেঠাইমা। বুঝে চলবার দরকার করে বরং পদিপিসী টিসির। ওঁদের বরং একটু বুঝে চলতে বলুন। আমার বাপ বিছানায় পড়ে আছে বটে, কিন্তু আমার কাকা কাকিমা এখনও বর্ত্তমান, ভাইয়ে ভাইয়ে তাঁদের মধ্যে যাই হোক, ভাইঝির নামে এরকম মিথ্যে অপবাদ কাকাবাবু কক্ষণো সহ্য করবেন না। কাকাবাবুকে চেনো তো সব।"

পারুলের কথায় পদিপিসী ভীষণ ভয় পাইয়া গেলেন। এক রকম কাঁপিতে কাঁপিতেই পদিপিসী বলিল, "একলা আমাকেই কেন দুষিস, পারু! আমি কি আর একাই বলেছি।"

মুখুয্যে গিন্নী তখনও রাগে গর গর করিতেছিলেন। পারুলকে এইভাবে ভয় দেখাইতে শুনিয়া তাঁহার ক্রোধ সপ্তমে চড়িল। দুম্ করিয়া খাবারের ধামাটা পুনরায় মাটির উপর রাখিয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "চুপ কর ছুঁড়ি, চুপ কর। কাকীর এয়ো সংক্রান্তি ব্রতটা তো নষ্ট করেছিস্। আমাদের খাওয়াটাও নষ্ট করবি?"

অনেক কষ্টে এতক্ষণ পারুল চোখের জল রোধ করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু আর সে তা পারিল না। সে অঝোরে কাঁদিয়া ফেলিল।

পারুলকে কাঁদিতে দেখিয়া সারদামণি ডাকিলেন, "পারুল।"

পারুল উত্তর করিল, "আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। কাকীমার ব্রতর দিন আমিও বাড়ী যাব না। কোন কাজেও হাত দেব না। কোন জিনিষও ছোঁব না।"

গাঙ্গুলী গিন্নী বলিলেন, "সেই ভাল মা, একটা দিন বইতো নয়।"

পারুল আঁচল দিয়া চোখের জলটুকু মুছিয়া ফেলিয়া বলিল,

"আপনারা এইবার খেতে বসুন।" ইহার পর পারুল সারদামণিকে ডাকিয়া বলিল, "আমি তাহলে যাচ্ছি কাকীমা।"

সারদামণি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ছুটিয়া আসিয়া পারুলকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কোথায় যাচ্ছিস। যেতে হয় ওরা যাক। সরকারি রাস্তা এ। আমরা যাব কেন? আয়, বোস তুই এখানে।"

সারদামণির কথায় সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। ব্যাপার শেষ বরাবর এইরূপ দাঁড়াইতে পারে, তাহা কেহ কল্পনাও করে নি। সকলে পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। কাহারও মনে ইহার কোনও উত্তরও যোগাইল না।

অনেক ভাবিয়া মুখুয্যে গিন্নী উত্তর করিলেন, "কিন্তু তোর ব্রতর হবে কিরে? মনে রাখিস্, শিরে সংক্রান্তি। এয়ো করেছিস।"

সারদামণি বলিলেন, "হ্যাঁ, সে কথাও বলে রাখছি, শুনুন। এয়ো আমি করব ই। তবে পারুলই রাঁধবে, আর সেই রান্না আপনাদের খেতে হবে। যদি না খান তা হলে আমি ব্রত উদ্যাপন করব দুলে পাড়ার, বাগ্দী পাড়ার মেয়েদের নিয়ে। নিজে হাতে পরিবেশন করে তাদের আমি খাওয়াব। তবু আপনাদের খোসামোদ আমি করব না, করব না, করব না।"

৬

সন্ধ্যা তখনও হয় নাই। মাঠ হইতে গরু ও লাঙ্গল লইয়া চাষীর দল একে একে ফিরিয়া আসিতেছে। দুই একজন ফিরিওয়ালা, যাহারা এতক্ষণ গ্রামে ফিরি করিতেছিল, তাহারা এইবার গ্রাম ত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছে।

পল্লব তাহার ক্লাবের ছেলেদের লইয়া ফুটবল খেলিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। নিকটেই গ্রামের পদিপিসীর ভিটা। ভিটায় মাত্র একখানি ঘর বর্ত্তমান, বাকিগুলি ভাঙিয়া গিয়াছে। পদিপিসী ঘরের দাওয়ায় বসিয়া মুড়ী ভাজিতেছিলেন। হঠাৎ উপুড় হইয়া পড়িয়া গিয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওরে বাপরে মরে গেলুম রে-এ।"

পদিপিসীর এই চীৎকার পল্লব ও তাহার দলবলের কানে গিয়াছিল। তাহারা ছুটিয়া পদিপিসীর বাড়ী ঢুকিয়া দেখিতে পাইল, পদিপিসী প্রায় জ্ঞানহারা হইয়া শুইয়া পড়িয়াছেন। তাহার কোমর হইতে অঝোরে রক্ত পড়িতেছিল। অস্ফুট আর্ত্তনাদে একবার মাত্র তিনি বলিলেন, "এইবার চললাম আমি, বাবা। হরি, হরি, হরি, হরি। গঙ্গার কিনারায় নিয়ে চল বাবা, গঙ্গার কিনারায়। বাবা পল্লব, ক্ষমা করিস বাবা। যা বলেছিলাম তা তোদের ভালোর জন্যেই। তাই বলে কি এইভাবে প্রতিফল দিতে হয় বাবা!"

পল্লব তাড়াতাড়ি পদিপিসীকে তাঁর বিছানার উপর শোয়াইয়া দিল। পল্লবের বন্ধু সুধীর একটা পুরাণো কাপড় ছিঁড়িয়া লইয়া তাহা দুই ভাঁজ করিয়া পদিপিসীর ক্ষতস্থানের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "বুঝলে কিন্তু পল্লবদা।"

অপর একখানা কাপড় হইতে টুকরা ছিঁড়িয়া পদিপিসীর ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিতে দিতে পল্লব বলিল, "খু-উব বুঝেছি। পদিপিসী কিন্তু আমাকে সন্দেহ করেছেন, যে কারণে যেই এ কায করুক, আমরা তা সহ্য করবো না। এখন অধীরকে বল, তাড়াতাড়ি নৈহাটী থেকে নলিনী ডাক্তারকে নিয়ে আসতে। কোমরটা আগাগোড়া ফ্রাকচার হয়ে গিয়েছে।"

সুরো ঠাকুরের ছেলে সুধীর "এতক্ষণ হতভম্ব হইয়া ব্যাপারটী উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছিল। মেঝের উপর গড়িয়ে একটী অর্দ্ধ-

ইষ্টকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সুধীর বলিল, "এতক্ষণে সব বুঝলাম, পল্লবদা! অ-ত্রৈ—"

পদ্দিপিসীর ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করিয়া বাহিরে আসিয়া পল্লব লক্ষ্য করিল, পার্শ্ববর্ত্তী বাগানের একটা বড় গাছের মগডালের উপর একটী লোক তাহাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

চীৎকার করিয়া পল্লব জিজ্ঞাসা করিল, "কেডারে গাছের উপর!" গাছের উপর হইতে উত্তর আসিল, "আমি মধু দুর্লভ, দা ঠাউর। এই তেঁতুল পাড়তেছি।"

পল্লব এবং তাহার দলবলের সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। ওপাড়ার নলিনী এবং বঙ্কুকে পদ্দিপিসীর শুশ্রূষার জন্য রাখিয়া তাহারা বাঁশ বাখারী যাহা পাইল তাহা লইয়াই ঐ বাগানের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। কিন্তু তৎক্ষণে মধু দুলে গাছ হইতে নামিয়া আসিয়া তাহার বাড়ীর দিকে রওনা হইয়া গিয়াছে।

বাগিচার মধ্যে মধু দুলেকে না দেখিয়া পল্লব বলিল, "বেটা পালিয়েছে। চল তবে ওঁর বাড়ী। বাড়ী চড়াও হয়ে ওকে শিক্ষা দেবো। আজ পদ্দিপিসীকে ঘা দিয়েছে, কাল ওরা আমাদের খুন করবে।"

"যাকগে যাক, পল্লবদা!" পল্লবের বন্ধু মাণিক বলিল, "অন্য কেউ হ'লে কথা ছিল। পদ্দিপিসীর মত স্ত্রীলোকের জন্য আর নাই বা করলে এতো। ডাক্তার দেখিয়ে দিচ্ছ, এই যথেষ্ট। পদ্দিপিসীও কি [illegible] যান নাকি।"

মাণিককে সমর্থন করিয়া পূর্ব্ব পাড়ার তিনকড়ি বলিয়া উঠিল, যা বলেছিস ভাই; ব'ড়ের শত্রু বাঘে মারে যা শত্রু পরে পরে।"

পল্লবের সহিত পদ্দিপিসীর পূর্ব্ব শত্রুতা যাহাই থাক না কেন, এইরূপ ভাবে একজন স্ত্রীলোককে জখম করা পল্লব কিছুতেই বরদাস্ত করিল না। [illegible]লকে সে বুঝাইয়া বলিল, 'হাঁ, তা ঠিক কথা, কিন্তু এই

তো সুযোগ। এই সুযোগে বেণীকাকার ঐ সাকরেদটীকে একটু জব্দ করে দিলে গ্রামের সকলেই আমাদের সমর্থন করবে।"

বাঁড়ুয্যেদের মাণিক কিন্তু এই ব্যবস্থায় সায় দিতে পারিল না। গ্রামের মূক জনসাধারণকে সে ভালো রূপেই চিনিত, তাহাদের কোনও সাহায্য আশা করা বৃথা। পল্লবকে নিরস্ত করিবার উদ্দেশ্যে সে বলিল, "কিন্তু, মধু দুলে এ গাঁয়ের চৌকীদারও বটে। শেষে কি একটা ফৌজদারীতে পড়বে, পল্লবদা।"

"দেখ তোদের আগেও বলেছি, আজও বলছি।" পল্লব বলিল, "যে অত্যাচার সহে এবং যে অত্যাচার করে, তারা সমভাবেই অপরাধী। যদি তোদের আমার উপর একটুও ভালবাসা থাকে তো আমার সঙ্গে আসবি। যদি না আসিস, তা হলে আমি একাই চললাম।"

মধু দুলে ওরফে মধু দুর্লভের খড়ো বাড়ীটী নিকটেই ছিল। পল্লবকে লাঠি হাতে সেই দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাহার দলের ছেলেরাও বাধ্য হইয়া তাহাকে অনুসরণ করিল। লাঠি সোঁটা বাঁশ বাখারী লইয়া মধু দুলের বাড়ীর আগোড়ের নিকট আসিয়া ছেলেদের দল চীৎকার করিয়া ডাকিল, "এই মধু! বেরিয়ে আয় বলছি। মনে করেছিস তোরা যা খুসী করে যাবি না? না বেরুস তো আমরা তোর বাড়ী পুড়িয়ে দেবো।"

মধু দুলের বাড়ী তাহাদের আর পোড়াইয়া দিতে হইল না। অবাক হইয়া ছেলেদের দল চাহিয়া দেখিল, ভিতর হইতেই মধু দুলের খোড়ো বাড়ীটা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

হতভম্ব হইয়া পল্লব এবং তাহার বন্ধুগণ শুনিল মধু দুলের পরিবারবর্গ তারস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "ওগো কে আছো রক্ষা করো, পেল্লববাবু, মানকে আর ওদের হাড়হাবাতের দল মোদের সব্বনাশ করে পুড়িয়ে মারলে গো-ও—"

স্ত্রী-পুরুষ, শিশু ও বৃদ্ধের কলরোল ও বাঁশ পোড়ার কট্ কট্ শব্দ আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া কুণ্ডলিত ধূম এবং অগ্নির হুঙ্কার সহিত গগন চুম্বন করিতেছিল। পল্লবের মুখে আর কথা যোগায় না, তাহার বন্ধুদের অবস্থাও ঐরূপ। কে তাহাদের এখন পথের সন্ধান বলিয়া দিবে। সভয়ে তাহারা শুনিল চতুর্দ্দিক হইতে কাদের অভয় বাণী আসিতেছে, "ভয় নেই দাদুভাই, এই এসে গেছি আমরা। এ হেই—ই। ও-ও ফকরেকা, রাঘব খুড়ো, এই দিকে-এ। হালারা এই দিক দিয়ে বোধ হয় পালালো-ও। ওরে ও-ও মধো। সাধুদার বাইসিকেল নিয়ে তুই থানায় যা-আ। সঙ্গে করে নিয়ে আসব বুঝলি? এই দারোগাকে, বুঝলি শীঘ্রী চলে যা।"

পল্লব ভয় পাইয়া তাহার দল বলসহ মধু তুলের ভিটার সীমানার বাইরে আসিয়া দাঁড়াইল। বুঝিতেও তাহারা পারিয়াছিল সব, কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রে তাহাদের আত্মরক্ষা ছাড়া করিবারও কিছু নাই। তাহারা নিজেদের জালে নিজেরাই জড়াইয়া পড়িয়াছে। পিছাইতে পিছাইতে তাহারা বড় রাস্তার উপর আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু পলাইতে পারিল না। তুলে ও বাগদী পাড়া হইতে ততক্ষণে দা কাস্তে কুড়ুল সড়কী বাঁশ ও লাঠি লইয়া প্রায় পাঁচশো লোক এইদিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

এদিকে অন্ধকারও নামিয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মধু তুলের জলন্ত কোঠা কয়টীর আলোকে চারিদিক উদ্ভাসিত। আত্ম-গোপন করিবারও উপায় নাই। অথচ ক্ষিপ্ত জনতার সহিত মাত্র এই কয়জনে লড়াই করাও সম্ভব নয়। কিন্তু লড়াই করা ছাড়া উপায়ও ছিল না।

লাঠি হাতে আগাইয়া আসিয়া পল্লব বলিল, "কোন ভয় নেই। তোরা বাগানের পথে বাড়ী চলে যা। আমি একাই এদের রুখবো, একসঙ্গে সকলে মরে লাভ নেই। ওরা আজ মানুষ নেই। দেখছিস না, হয়তো সকলকেই খুন করবে।

বিদেশে থাকাকালীন পাড়ার এক আখড়ায় পল্লব লাঠি খেলা শিখিয়াছিল। একা বহুবার বহুলোকের সে মোহড়া রাখিয়াছে। মরিতেও সে পেছ্‌পাও ছিল না। মালকোছা মারিয়া লাঠি হাতে সে জনতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জনতাও প্রস্তুত ছিল। এদের একজন দূর হইতে মাছমারা কেঁচা পল্লবকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া দিল। পল্লব মাথাটা সরাইয়া না লইলে উহা নিশ্চয়ই তার মস্তক বিদ্ধ করিত। সুতীক্ষ্ণ সড়কীটি শোঁ শোঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া একটী আমগাছে বিঁধিয়া থাকিয়া গেল। প্রথমেই ঘা মারিতে না পারিলে জনতাকে থামানো যায় না, পল্লব এই সত্যটি ভালো রূপেই জানিত। সে এই সুযোগে প্যাঁচ কষিয়া জনৈক লাঠিয়ালের লাঠি কৌশলে ঠেকাইয়া জনতার তিন চারজনের মাথার উপর লাঠি বসাইয়া দিল। এদের তিনজনেই আহত হইয়াছিল, একজনের আঘাত ছিল অসামান্য। রক্তাক্ত কলেবরে সে মাটির উপর লুটাইয়া পড়িল। এই সুযোগে বামে হেলিয়া কখনও বা পিছাইয়া আসিয়া পল্লব আরও দুই একজনকে ঘায়েল করিল। নিজেও যে সে দুই এক ঘা না খাইল তা'ও নয়। এতোগুলি লোকের সহিত সমানে লড়াই করা যায় না। কিন্তু তবুও সে লড়িতেছিল। এমন সময় সেখানে আসিয়া হাজির হইল বেণী রায় নিজে।

বেণী রায়কে অকুস্থলে দেখিয়া ফকরে দুলে বলিল, সাকাম জোয়ান এই পল্লব ঠাউর, কর্ত্তা এতোগুলো লোকের মোওড়া একাই রাখছে। মরদের বাচ্চা বটে।

পল্লবের যে এতোখানি এলেম আছে তা বেণী রায় কল্পনাও করে নি। মুগ্ধ হইয়া সে তাহার যষ্টি সঞ্চালন কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হুঁ বুঝেছি ভাগলপুরী প্যাঁচ দেখাচ্ছে। কিন্তু এতো শিখলো কি করে? ও প্যাঁচ একমাত্র বাংলা দেশের জয়নগরী প্যাঁচে রোখা যায়। দে তো তোর লাঠিটা একবার।

লাঠি খেলা সম্বন্ধে বেণী রায়ের নাম ছিল। দশখানা গ্রামের লোকে তাঁকে প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় বলে স্বীকার করে। বহু লেঠেলরাও তাঁর কাছে এই খেলা শিক্ষা করেছে। বেণী রায় ছিলেন এই খেলার একজন বিশেষজ্ঞ।

সদর্পে যষ্টি হস্তে এগিয়ে এসে উহা তাঁহার বক্ষ পৃষ্ঠ ও বগলের নিচে কয়েকবার ঘুরিয়ে নিলেন এবং তারপর কায়দা মাফিক একবার ঘুরপাক খেয়ে পল্লবের লাঠিটা বার দুই ঠেকিয়ে জয়নগরী প্যাঁচের সাহায্যে পল্লবের ডান হাতে কনুয়ের উপর আঘাত হানিলেন। পল্লবের হাতের লাঠি ছিটকাইয়া পড়িয়া গেল।

বেণী রায় স্থির দৃষ্টিতে একবার পল্লবের এই দুরবস্থা পরিলক্ষ্য করিলেন। অস্ফুট স্বরে তিনি মাখনা দুলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন কিরে শত্রুর শেষ রাখবি? মাখনা প্রস্তুতই ছিল, সে নিমিষে পল্লবের মস্তক লক্ষ্য করিয়া যষ্টি উত্তোলন করিল। হয়তো পল্লবের মস্তক এই দিন লাঠির ঘায়ে গুঁড়া হইয়া যাইত। কিন্তু বেণী রায় নিজের লাঠি দিয়া মাখনার লাঠি আটকাইয়া বলিলেন, এই করছিস কিরে? ওদিকে যে দারোগা পুলিশকেও খবর দিয়েছি। থাক আজকে। ওরা এলো বলে।

বেণী রায়ের ইসারায় ফকির এবং মাখনা তাড়াতাড়ি লাঠিগুলা সরাইয়া ফেলিয়া পুনরায় আগুন নিবাইতে সুরু করিল।

বেণী রায়ের ধারণা ভুল ছিল না। ঘর জ্বালানী ও দাঙ্গার খবর পাইয়া বড় দারোগা নিজে ঘোড়ায় চড়িয়া সান্ত্রীদলসহ অকুস্থলে আসিয়া হাজির হইলেন।

দারোগাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া বেণী রায় বলিলেন, আসুন দারোগাবাবু, আসুন। কি বলবো বলুন, ছেলে-ছোকরার কাণ্ড। একটুতেই মাথা গরম হয়। "হুঁ, বুঝলাম, কিন্তু—" দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরা গেলো কোথায়?"

উত্তরে বেণী রায় বলিলেন, "এই তো ছিলো, তড়পাচ্ছিলোও খুব। আপনাদের দেখে সরে পড়লো। যাক, যাবে আর কোথায়? সবাই এই গাঁয়েরই লোক। এখন আসুন, একটু চা পান করে নিন।"

আগুন তখনও নির্ব্বাপিত হয় নি। ফরিয়াদীর বাড়ীর অগ্নিদগ্ধ মটকার দিকে তাকাইয়া দারোগাবাবু বলিলেন, "না, থাক্, পরে হবে। আসামীদের আগে গ্রেপ্তার করি।"

দারোগার আগমনের পূর্ব্বেই বাগীচার মধ্যে পল্লব অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। অনুগত যুবকদের লইয়া এ-পথ ও-পথ ঘুরিয়া সে গাঁয়ের রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। সকল কথা শুনিয়া রামকৃষ্ণবাবু বলিলেন, "এ কথা তোমাকে আগেই বলেছিলাম ভায়া। চাষা পাড়ায় চড়াও না করাই ভালো ছিল। ওরা সকলেই বেণী রায়ের তাঁবের লোক। তোমার পক্ষে একটা সাক্ষীও ওখানে পাবে না। দারোগাবাবুকে বেণী আগে-ভাগেই হাত করেছে।"

"তা'ও কি কখনও হয় না'কি, দারোগা সরকারী লোক," পল্লব উত্তর করিল, "ওদের মতে তিনি চলবেন কেন?"

মৃদু হাসিয়া রামকৃষ্ণবাবু বলিলেন, "তুমি কিছু বোঝ না ভায়া। স্যাকরা মায়ের কানের সোণা চুরি করে, আর দারোগা বাপের কাছ হতেও ঘুষ নিতে ছাড়ে না। এসব মামলা মকর্দ্দমার ব্যাপার বোঝে ঐ বেণী; আর বুঝি আমি। কিছু বার করতে পারো তো চেষ্টা করি।"

রামকৃষ্ণবাবুর উপর পল্লবের ধারণা ভালো ছিল না। তবে তিনি বেণী রায়ের বিপক্ষ পক্ষীয় ছিলেন। এই জন্যই সে তাঁর কাছে সলা করিতে আসিয়াছে। বিরক্ত হইয়া পল্লব বলিল, "ঘুষ? আজ্ঞে না, জীবন গেলেও ঘুষের প্রশ্রয় আমি দেবো না। আপনি কি বুঝেন বা না বুঝেন তা আমি জানি না, তবে আমি এইটুকু বুঝছি যে আপনাদের ভরসায় বেণীকাকার মত লোকের সঙ্গে বিবাদ করা চলে না। আমি জানতে

চাই, আপনারা আমাদের জন্যে কিছু করবেন, না পুলিশের ভয়ে সরে দাঁড়াবেন।”

“শুনেছি পল্লবদা,” পল্লবের বন্ধু তিনকড়ি বলিল, “নূতন মহকুমা হাকিম আপনার ক্লাস ফ্রেণ্ড। এখানে ধরা না দিয়ে তাঁর কাছে চলে গেলে হয় না? মামলা না হয় লড়লুম, কিন্তু এখুনি বেইজ্জৎ হই কেন?”

“শোনো তিনু, বিনদাও শোনো, তা আমি যাবো না, যে কারণে দারোগাকে হাত করা পছন্দ করি না, সেই একই কারণে তাকেও আমি অনুরোধ করবো না,” সাথীদের উদ্দেশ করিয়া পল্লব বলিল, আজ হ’তে অন্য পথে কায করতে হবে। এতোদিন আমরা ভুল পথে চলেছি। এবার হতে যে পথে আমরা চলবো, তা শস্ত্রের পথ নয়, শাস্ত্রের পথ। নূতন উপায়ে আমরা বেণীকাকাকে নিস্তব্ধ করবো, আর মানুষ করে তুলবো এই রামকৃষ্ণের মত লোকদের। এসো আমরা নিজেরাই দারোগার কাছে যাবো।”

পল্লব দলবল লইয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল। এমন সময় তাহাদের পথ অবরোধ করিয়া সেইখানে উপস্থিত হইল দারোগাবাবু নিজেই। তাঁহাদের পিছন পিছন আসিয়া হাজির হইলেন বেণী রায় এবং এই ঘর-পোড়া মামলার প্রায় বিশ জন প্রত্যক্ষদর্শী। সাক্ষী সাবুতদের মধ্যে বহু নারী এবং বালকও আছে।

পল্লবকে দেখিয়া দারোগাবাবু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, “এ কি পল্লববাবু! আপনার কথা আমাদের মহাকুমা হাকিম প্রায়ই বলেন। এবার তো তিনি বেণীবাবুর জায়গায় ইউনিয়ন বোর্ডের সরকারী সভ্যের জন্য আপনার নামই পাঠালেন। আর এদিকে খামকা আপনি একটা বিশ্রী ফৌজদারীতে জড়িয়ে পড়লেন। যে রকম সাক্ষ্য সবুত পাওয়া যাচ্ছে তা’তে আপনাকে গ্রেপ্তার করা ভিন্ন উপায়ও নেই।”

"হুঁ, আমিও তো তাই বলছিলাম," বেণী রায় উত্তর করিলেন, "ও তো এই গাঁয়েরই ছেলে। গাঁয়ের ও একজন বাড়তি সভ্য হতো। আর আমি? হেঁ হেঁ; আমার কথা ছাড়ান দিন। আমাকে তো জনগণসাধারণই মনোনীত করবে। আমি তো সরকারী করুণা প্রত্যাশী নই। তবে কি জানেন বাবারও তো বাবা আছে। জেলা হাকিম আমাকে রেডক্রসের চাঁদার ব্যাপারে ডেকেছিলেন, তা' আমি বললাম, ওর নামটা যখন নীচে থেকে পাঠিয়েছে, তখন ওটা থাক। ও'ও আমাদেরই লোক। কিন্তু, এখন, এ কি ফ্যাসাদ' বলুন তো? কি? কি পল্লব? একটা মিট মাট করবে না কি?"

পল্লবের ডান হাতটায় তখনও পর্য্যন্ত যন্ত্রণা হইতেছিল। ব্যাণ্ডেজটা ভালো করিয়া বাঁধিয়া লইয়া পল্লব বলিল, "আমি তো বেণীকাকা, কোনও অন্যায় করি নি। আপনি তো জানেন সব। তা শাস্তি তো কিছুটা দিলেন, আরও বাকী আছে? তবে আমি আপনার নামে কোনও অভিযোগই করবো না। আমি পথ বদলেছি, মতও।"

"দুৎ তেরী," বেণী রায় খেঁক্‌রাইয়া উঠিলেন, "ভাঙ্গে তো মচকায় না। হাতে পা'য়ে ধরলে না হয় একটা বিহিত করা যেতো।—না, দারোগা-বাবু, আমি আর এর মধ্যে নেই। তা জামীন টামীন পাওয়া যাবে? তা একে জামীন যদি দেন, তা'হলে আমি রাজী আছি।"

উত্তরে দারোগাবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে না, মামলা দায়ের একবার হ'লে এ কেসে জামীন হওয়া দুষ্কর। ঘর পুড়িয়ে নরহত্যার প্রচেষ্টা যে সাংঘাতিক অপরাধ। এখন সব কিছুই নির্ভর করছে আপনাদের বিবৃতির উপর। তবে পল্লববাবু যদি প্রমাণ করতে পারেন—যে অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বা সাজানো, তা' হলে স্বতন্ত্র কথা। তবে আমি তো এতে সন্দেহের কিছুই পাচ্ছি না। তা' হলে পল্লববাবু আপনার বন্ধুদের নিয়ে আসুন আমার সঙ্গে, আপততঃ থানাতে যাওয়া যাক,

এক রাত্রি একটু যা কষ্ট হবে, প্রত্যূষেই আপনাদের আদালতে পাঠিয়ে দেবো।"

পল্লব ভাবিতেছিল, সে এখন কি করিবে' এমন সময় সেখানে ঝড়ের মতন বেণী রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী পারুল আসিয়া উপস্থিত হইল। পারুলকে দারোগার সম্মুখে আসিতে দেখিয়া বেণী রায়ের ন্যায় পল্লবও অবাক হইয়া গিয়াছিল।

ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া বেণী রায় বলিল, "তুই? তুই এখানে?"—"হাঁ কাকাবাবু; আমি! আমি প্রমাণ করবো, পল্লবদা বা তার কোনও বন্ধু ঘরে আগুন দেয় নি। রঘু চৌকিদার নিজেই নিজের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। ঐ রঘু দাঁড়িয়ে আছে এখানে। বলুক ও! ওর চৌকিদারীর পোষাকগুলো কোথায়?"

"কোথায় আবার? জিনিসপত্রের সঙ্গে পুড়ে গেছে।" তিক্ত স্বরে বেণী রায় বলিলেন, "কিরে রঘু, কোথায় ও সব?"

উত্তরে রঘু ডুলে বলিল, "হাঁ কর্তা সব পুড়ে গেছে, আমার আর কিছু নেই।"—"কিছু নেই? সব তোর আছে," ঝাঁঝাল স্বরে পারুল বলিল, "আসুন দারোগাবাবু। দেরী হলে সরিয়ে ফেলবে। ওর শ্বশুর নগেন ডুলের বাড়ী তল্লাস করবেন আসুন।"

পারুলরাণীর কথায় দারোগাবাবুর মনে খটকা লাগিল। একটী সূত্র পাওয়া গিয়াছে এবং সূত্রটী মূল্যবান, প্রয়োজনীয় বটে। দারোগাবাবু দ্বিরুক্তি না করিয়া দলবল সহ রঘুর শ্বশুর নগেন ডুলের বাড়ীটা ঘেরোয়া করিয়া ফেলিলেন। খানাতল্লাসীর ফলে রঘুর চৌকিদারীর পোষাক তো পাওয়া গেলই, তা ছাড়া তার বাড়ী ও জমা-জমীর কওলা পাট্টা রসিদ প্রভৃতি মূল্যবান দলিলপত্র এবং তার স্ত্রীর অলঙ্কার ও বস্ত্রাদিসহ একটী তোরঙ্গও।

এইটুকু একটী গ্রাম্য মেয়ে পারুলের বুদ্ধিমত্তায় দারোগাবাবু অবাক

হইয়া গিয়াছিলেন। বেণী রায়ও কম অবাক হন নি। হাজার হোক সে তো তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্রী।

কিন্তু এতো কথা তাঁরও একবার মনে আসে নি। এতোটা বুঝিলে বেণী রায় নিশ্চয় রঘুকে সাবধান করিয়া দিতেন। এখন যে সব ষড়যন্ত্রই ফাঁসিয়া যায়। তিনি হতভম্ব হইয়া পারুলরাণীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, মুখ দিয়া তাঁহার কথা বাহির হইল না। শেষে কি'না তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্রীর নিকট তাঁকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল।

গম্ভীর হইয়া এইবার দারোগাবাবু বলিলেন, "এতো আমি কল্পনাও করি নি। না না, এর পর আর কিছু বলবার নেই। পল্লববাবু, আপনারা নির্দ্দোষ। সর্ব্বস্ব সরিয়ে রেখে ও নিজের ঘরে নিজেই আগুন দিয়েছে।—এই সিপাহী! পাকড়ো ইসকো।"

৭

রায় বাড়ীর পিছনে বিস্তীর্ণ উদ্যানের মধ্যে পুকুর পাড়ে একটী বাঁশের বেঞ্চিতে গম্ভীর মুখে বেণী রায় বসিয়াছিলেন। পেছনে দাঁড়াইয়া মাখনা ভুলের ভাই ফকু তাঁহাকে তেল মালিশ করিতেছিল। ইহাকে মালিশ বলা যায় না, বরং দলাই মালাই বলিলেই ভালো হয়। সম্মুখের জমির উপর তাঁহার সাকরেতদের কেহ কুস্তি লড়িতেছে, কেহবা লাঠি খেলিতেছে।

হাতের পেশী কয়টী সঙ্কোচন করিতে করিতে বেণী রায় বলিলেন, "নে নে ভালো করে দলাই দে, বাঙ্গালীর হচ্ছে তেলে জলে শরীর। দেহ ও লাঠি এই দুইয়ে চাই খাঁটি তেল, তা না হলে এই দুই'ই পড়ে অসময়ে ভেঙে। কয়েকটী গামছায় বাঁধা প্রায় সের দশেক ছোলা পুকুরের জলে 'ডোবানো ছিল। মেহনত শেষ করিয়া সেইগুলি উঠাইয়া আনিয়া

ফকির বলিল, "মেহন্নত করলে খেতেও হয় বেশী। নে নে খেয়ে নে সব। রাত্রে আবার বলদেপুরের জমিদার বাড়ীতে বরাত আছে। দুপুরে লাটের টাকাও তাদের এসে গেছে। ভোজপুরী দারোয়ান রেখেছে তারা, বন্দুকও আছে বুঝতে হবে তাদের সঙ্গে।"

গায়ে ও মাথায় মাটি মাখিয়া মাখনা উত্তর করিল, "থাকুক শালাদের বন্দুক, ও তাদের হাতেই থেকে যাবে। আমরা হচ্ছি খোদ ছোটবাবুর চেলা। কতো বন্দুকের গুলি আর ইঁট এই লাঠি দিয়ে ঠেকালাম আমরা। ও সব খোট্টা, পাঞ্জাবীদের আমরা ভয় করি?"

এদের এই আলোচনা বেণী রায়ের কানে গিয়াছিল। বিরক্ত হইয়া তিনি ধমকাইয়া উঠিলেন, "চেঁচাসনি ওরকম করে। আমাদের এসব কীর্ত্তি এখনও কেউ জানে না। ওদিকে আবার ঘরের শত্রু তোদের ছোট মা রয়েছে। শুনতে পেলে কুরুক্ষেত্র সুরু করবে। যা কিছু জারি জুরি তা কাম ফতে করে করিস্।"

উত্তরে ফকির বলিল, "কিছু ভাববেন না ছোটবাবু। অন্ততঃ হাজার দশেক টাকা লুঠবোই। তবে দু' একটা খুন না হয়ে যায়। ধরা আমরা কর্ত্তা, কক্ষনো পড়বো না। মা'কালীর নাম আর আপনার আশীর্ব্বাদ নিয়ে যাত্রা করবো। আমরা তো চুরি করতে যাচ্ছি না, দস্তুর মত মশাল সড়কী আর লাঠি নিয়ে সেখানে যাচ্ছি, হাঁক ডাক করতে করতে। আর এ টাকা তো আমরা নিজেরা কখনো নিই নি, দরিদ্র নারায়ণের সেবাতেই তা খরচ করেছি। বলদেপুরের শয়তান বাবুদের টাকা লুঠবো, এতে পাপের কি আছে, তবে পাঁচ জনে এতো কথা বোঝে না, এই যা।"

"সব করবি তোরা," বেণী রায় বলিলেন, "হরিবাবুর প্ররোচনায় দশজন ভদ্রলোক বড়দার হ'য়ে সাক্ষী দিয়ে এলো, তোরা কিছু করতে পারলি না। পল্লব ছোকরা তো দিন দিন বেড়েই চলেছে। সবই কি আমাকে নিজ হাতে করতে হবে?"

"মুস্কিল যে এইখানে," ফকির উত্তর করিল, "ভিনগাঁয়ে অনেক কিছুই করা যায়। গাঁয়ে ঘরে যে চিনে ফেলবে, আর দেখাবেও খারাপ। তাতেও তো কর্ত্তা আমরা পেছপাও নই। কিন্তু মুস্কিল বাধান যে আমাদের ঐ ছোট মা। তেনার সতর্ক দৃষ্টি সব দিকেই আছে, আমাদের দিব্যিও তিনি করিয়ে নিয়েছেন, তা না হ'লে ঐ পেস্কারবাবু, ঐ দারোগা, মায় তাঁদের ঐ ছোট হাকিমকেও আমরা গুম্ করে দিতাম। তা মা যখন বারণ করেছেন, তখন পেস্কারবাবু এখন থাক, বরং ঐ ওদিকের কাযটা সেরে ফেলে দিই। মদনা চর সেজে দারোগাকে খবর দিক, একদল চোর এসে পাশের গাঁয়ের নরেনবাবুর বাড়ী চুরি করবে। তা দারোগা-বাবু নিশ্চয় মাত্র জন চার সিপাহী নিয়ে রাত্রে ওখানে ওত্ পাতবেন, হাজার হোক চুরি, ডাকাতি তো নয়। বেশী লোক নিশ্চয় আনবেন না। এই সুযোগে বিশ জন জোয়ান ডাকাতকে মুখোস পরিয়ে ওদের ওপর হামলা করিয়ে ওদের একেবারে সাবড়ে দেবো অখন।

"তোদের সব মাথা খারাপ," বেণী রায় উত্তর করিলেন, "দারোগাকে এমনিই হাত করা যাবে। না যায় তো ঘুষের মামলায় ফেলে দেবো। আমাদের আসল শত্রু ঐ ছোকরা হাকিম। আচ্ছা, দেখা তো যাক।"

বেণী রায়কে এই গাঁয়ের লোকদের মত আরও দশখান গাঁয়ের লোকও খাতির করে। তারাও তাঁর সঙ্গে সলা পরামর্শ করিতে আসে। সকল গাঁয়েই চাষী মহলে তাঁর সমান সম্মান। তাই এই মাথা গুনতির দিনে তিনি সহজেই দশখানা গাঁয়ের মাথা রূপে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হইতে পারিয়াছেন। এত দিন এই বোর্ডে তাঁর কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, যাহা খুসি তাহাই তিনি করিয়াছেন। সেখানকার সকলে ছিল তাঁরই দলের লোক। এমন কি সরকারী মনোনীত সভ্যরাও বিরুদ্ধ পক্ষীয় ছিল না। কিন্তু এই নয়া মহকুমা হাকিম তাঁর এই একছত্র প্রভুত্ব পছন্দ করিলেন না। কেবল

মাত্র পল্লবকে নয়, অন্ত গ্রাম হইতেও তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষায় দুই ব্যক্তিকে তিনি সরকারী সভ্য রূপে মনোনীত করিয়াছেন। দলে তারা ভারী না হইলেও পল্লবের নেতৃত্বে এবং এই নয়া হাকিমের সাহায্যে তাকে অপদস্থ করিতে পারে।

বেণী রায়ের মনের কথা ফকির ঢুলে বুঝিতে পারিয়াছিল, রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে সে বলিল,"ওঃ পেল্লববাবু হবেন মেম্বোর। নেহাৎ ছোটমার বারণ তাই, নইলে দেখে নিতাম। তা এখন তো সময় আছে, বোড থেকে দিন না ওর বাড়ির পাঁচিল ভেঙে একটা রাস্তা বার করে, আর দিন ওর সাধের কদম গাছটা কেটে, রাস্তার ধারে কদম গাছ পোঁতা হয়েছে, সখ কতো ?"

ফকির তাহার বক্তব্য শেষ করিয়াছে মাত্র। এমন সময় সেইখানে আসিয়া হাজির হইল ভিন্ গাঁয়ের মানস সর্দ্দার ও তাহার ভাই সন্ত্রাস। চক্ষু তাহাদের কোটরাগত হইয়া গিয়াছে, বুকের ধুকধুকানি তখনও তাহাদের থামে নাই, পরণের কাপড়ে এবং দেহের স্থানে স্থানে তখনও পর্য্যন্ত রক্তের চিহ্ন দেখা যায়।

তাহাদের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া বেণী রায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, কর্ম্ম ফতে? গাঁয়েই কাযটা শেষ করলি, না এগিয়ে করলি ?"

মুখের পেশীগুলি শক্ত করিয়া মানস সর্দ্দার বলিল, "আজ্ঞে গাঁয়ের বাইরে বড় সড়কের মোড়েতেই হয়েছে। সন্ত্রাসের লাঠিতে দুজনাই ঘায়েল। রাত্রের অন্ধকারে কাউকেই চেনে নি কেউ। বড় তরফের হয়ে সাক্ষ্য দেওয়া বার করে দিয়েছি। কোর্ট থেকে ফিরতে ওদের রাত্রি নটা হয়েছিল। আমার প্রথম ইঁটেই ওদের দুটো লণ্ঠনই ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তার পর সন্ত্রাস বাগান থেকে বার হয়ে হাঁকড়ালো লাঠি। জেরার দিন আর আদালতে আসতে হবে না।"

"ভালো ভালো," খুসী হইয়া বেণী রায় বলিলেন, "এখন পুকুরে

গোটা দুই ডুব দিয়ে নে। কালকে আর তোদের কোনও কায নেই। ফকিররা ফিরে এলে হিস্যা নিয়ে যাস, তোদের গাঁয়ের গরীবদের জন্যে। ওদেরও হাতে রাখতে হবে তো।"

"হাঁ কর্ত্তা, নিয়ে যাবো," মানস সর্দ্দার উত্তর করিল, "আমাদের তো এ সব দরকার নেই। এবার দু'শো আড়ি ধান এমনিই উঠেছে। কয়েক জন গরীব গুর্ব্বরা খেতে পাচ্ছে না, এদের এক বিধবার বেওয়া আবার তার মেয়ের বিয়েতে কিছু নগদা টাকাও চেয়েছে, ওদের জন্য কিছু দেবেন। তা' কর্ত্তা পুকুরে অতো বীজ ধান কোথা থেকে আইলো ?"

"হেঁ হেঁ হেঁ," হাসিয়া ফকির দুলে বলিল, "ও গুলো বড় হরিবাবুদের মাঠ হতে কাল রাত্রে আমরা উঠিয়ে এনেছি যে, এবার আর তেনাদের চাষ করিতে হচ্ছে না। এখন এই পাঁচিল ঘেরা দুর্গে ঢুকলে তবে জানবেন বীজ ধান তাঁর নিলো করা ? কায কি শুধু তোরাই করেছিস্। একটু পরে পেহ্লববাবুর অবস্থাও এ রকম হবে বেশী দেরীও নেই, এই সন্ধ্যে নাগাৎ। মিথ্যে করে ছোটবাবুর নামে দু'শো লোকের সই নিয়ে হাকিমের কাছে দরখাস্ত করা হয়েছে, আমরা না'কি সব ডাকাত, জালিয়াৎ! মজা এক্ষুনি টের পাবেন।"

কাহার একটী কালো ছায়া পিছন হইতে সম্মুখে আসিয়া পড়িল। দোগেছে গাঁয়ের চন্দ্র মোক্তার কখন যে বেণী রায়ের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন তাহা কেহ টের পায় নি। উপস্থিত সকলে মনে করিয়াছিল, লোকটী মানস সর্দ্দারের সহিত আসিয়াছে। এই জন্য লোকটীর প্রতি কেহ বেণী রায়ের দৃষ্টিও আকর্ষণ করে নি।

পিছন হইতে চন্দ্র মোক্তারকে দেখিয়া বেণী রায় হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এখানে কি করে এলেন আপনি ?" উত্তরে চন্দ্র মোক্তার বলিল, "আজ্ঞে, আপনার নামে যে দরখাস্ত হয়েছে, ওর প্রাথমিক তদন্তের ভার মহকুমা হাকিম আমাকেই দিয়েছেন। আপনার মতন লোকের সম্পর্কে

কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন না করে একজন ভালো নিরপেক্ষ লোক মারফৎ অভিযোগ বাচাই করে নেওয়াই তিনি উচিত মনে করেছেন, তা আমি তো আপনার বহুদিনের বন্ধু, যা হয় একটা করে দেবো অখন। মাঠাকরুণের সঙ্গে সুদরে দেখা হল, তিনি আমাকে এই বাগানে আসতে বললেন।"

"এঁ্যা, তাই না'কি ? সত্যি করে বলুন। আমাদের কতটা কথা বার্ত্তা আপনি শুনেছেন ?" বেণী রায় বলিলেন, "আমরা নাচার চন্দ্রবাবু! এর পর যা হবে তার জন্যে আপনার দুর্ভাগ্যই দায়ী।—এই ফকরে, সন্ন্যাস! ধর একে চেপে।"

ফকির প্রস্তুত ছিল। বেণী রায়ের উদ্দেশ্য বুঝিতে তাহার বাকী থাকে নি। তীরের মত ছুটিয়া আসিয়া সে চন্দ্রবাবুর গলাটা চাপিয়া ধরিল এবং সন্ন্যাস নিমিষে পেটী হইতে ছুরি বাহির করিয়া উহা তাহার বক্ষের মধ্যে আমূল বসাইয়া দিল।

চন্দ্র মোক্তারের নিশ্চল দেহটীর প্রতি কিছুক্ষণ স্থিরভাবে চাহিয়া থাকিয়া বেণী রায় হুকুম দিলেন, "একে আর বাইরে নিয়ে দরকার নেই। ঐ পুকুরের কোণেই একটা গর্ত্ত করে পুঁতে দে। কয়েকটা ইটও চাপা দিবি, তা না হলে শেয়ালে খুঁড়ে লাস বার করবে।"

দ্বিরুক্তি না করিয়া ফকরে, মাখন ও সন্ন্যাস নিকটের গোয়াল ঘর হইতে ঝুড়ি ও কোদাল ও ইট বাহির করিয়া একটী বিরাট গর্ত্ত করিয়া ফেলিল। এবং ঐ গর্ত্তের মধ্যে চন্দ্রবাবুর দেহটী পুতিয়া দিয়া ইট ও মাটি চাপা দিল, এমন কি নিকট হইতে একটী ছোট লেবু গাছের চারা উঠাইয়া উহা ঐ স্থানে পুতিয়া দিতেও ভুলিল না।

করণীয় কার্য্য সমাধা করিয়া কোমরের গামছা দিয়া ঘাম মুছিতে মুছিতে ফকির তুলে বলিল, "এই ব্যাপারটা কর্ত্তা, পেল্লববাবুদের উপরই ফেলে দিলে হয় না। কালই জেলা হাকিমের কাছে একটা

উড়ো চিঠি পাঠিয়ে দিই এই বলে যে সেই ঐ চন্দ্রবাবুকে গুম্ করেছে। আমরা না হয় সাক্ষ্য দেবো, সন্ধ্যা [illegible] তাঁকে ওনার বাড়ীতেই আমরা দেখেছি।"

"উঁহু তাতে ফল ভাল হবে না।" বেণী রায় আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার আর কোনও কথা বলা হইল না। বেণী রায়ের স্ত্রী সারদামণি ছুটিতে ছুটিতে সেই স্থানে আসিয়া হাজির হইলেন। সারদমণিকে দেখিয়া ফকির ও মানদ সর্দ্দার সাঙ্গোপাঙ্গ সহ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "মা! আপনি?"—"হাঁ আমি! কিন্তু এদিকে যে সর্ব্বনাশ হয়ে গেল," সারদামণি বলিল, "তখন এসে বললো মা একটু আগুন দেবে। তখনই বুঝেছি এক্ষুনি একটা কাণ্ড ঘটবে। আমি যে ছাই বুঝেও বুঝতে পারি নি। যা এক্ষুনি সব আগুন নিবিয়ে ফেল।"

"আগুন? কোথায় আগুন?" চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বেণী রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঝঙ্কার দিয়া সারদামণি উত্তর করিল, "এই আমার বুকে। ভাগ্যিস কাপড় তুলতে ছাদে উঠেছিলাম তাই না দেখতে পেলাম। বসে আছিস্ কি, আয় শীঘ্র চলে আয়।"

সারদামণি আর অপেক্ষা না করিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। পিছন পিছন বেণী রায়ও সাঙ্গোপাঙ্গ সহ ছুটিয়া আসিলেন, এমন ভাব দেখাইয়া যেন কেহ কিছুই জানে না। উঠানে আসিয়া দ্বিতলের একটী কক্ষের দিকে মুখ করিয়া সারদামণি ডাকিলেন, "ওরে ও পারু উ, পল্লব। শীগ্রি নেমে আয়। বড়ঠাকুর বোধ হয় আর বাঁচলেন না।"

"পল্লব? পারুল?" বেণী রায় হতভম্ব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারা এখানে?" উত্তরে সারদামণি বলিলেন, "হাঁ, লক্ষ্মীর প্রসাদ খেতে ওদের আমি ডেকেছি।"

পল্লববাবুর ভৃত্য ভিকুর উপর ঘরে শিকল দিয়া পল্লবকে পোড়াইয়া মারিবার জন্য বেণী রায় হুকুম দিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর এই

সময় প্রতিদিন পল্লব ভৃত্যসহ সত্য রায়ের গৃহে আসিয়া থাকে। কিছুক্ষণ রোগীর খোঁজ খবর লইয়া সে দ্বিতলের পূর্বদিককার একটী ঘরে বহুক্ষণ পড়া-শুনা করে। রাত্রে একলা ফেরা নিরাপদ নয়, তাই তাহার ভৃত্য ভিকুও সঙ্গে আসে। এই দিনও এই ঘরটীতে বসিয়া এই সময় তাহার পড়া-শুনা করার কথা! কিন্তু এ কি হইল? বেণী এই প্রথম বুঝিলেন ঈশ্বর আছেন। স্ত্রীর উপর তিনি রাগ পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না।

বেণী রায় ইসারায় ফকিরকে বলিলেন, "যা টপ ক'রে থানায় যা, প্রেসিডেণ্ট হিসেবে আমারই খবর দেওয়া উচিত, তা না হলে, ওরাই এজাহার দেবে এবং তা ওরা দেবে আমাদের বিরুদ্ধে।" তাহার পর তিনি আর অপেক্ষা না করিয়া, "আগুন, আগুন" বলিতে বলিতে সাঙ্গ-পাঙ্গ সহ সত্য রায়ের বাড়ী আসিয়া হাজির হইলেন।

সত্য রায়ের বাড়ীর একাংশে আগুন জ্বলিতেছিল। ভিখুরাম আগুন ঠিকই লাগাইয়াছিল। কিন্তু সে জানিত না, ইতিমধ্যেই পল্লব পারুলকে লইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সে অপরকে পুড়াইতে গিয়া সেও পুড়িয়াছে। কেরোসিনের টিনে আগুন লাগাইয়া উহা জানালা দিয়া গলাইয়া দিবার সময় তাহার পরনের কাপড় জ্বলিয়া উঠে। সে কোনও ক্রমে ছাদ পর্য্যন্ত পলাইয়া আসে। সেই স্থানেই সে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পড়িয়া ছিল।

আগুন এমনিই নিবিয়া আসিতেছিল। সকলের সমবেত চেষ্টায় উহা সহজেই নির্ব্বাপিত হইল। কেবলমাত্র পল্লবের বিশ্রামের জন্য নির্দ্ধারিত ঘরটী পুড়িয়াছে, এই যা! সত্য রায়ের ঘর পর্য্যন্ত আগুন পৌছাইতে পারে নি। সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া এইবার পল্লবের ভৃত্য ভিখুরামকে লইয়া পড়িল। পল্লব সকল কথা ভুলিয়া ভিখুরামের শুশ্রূষা করিতেছিল। এদিকে গ্রামে আগুন লাগার সংবাদে দারোগাবাবুও আসিয়া

হাজির হইয়াছেন। সকলেই একে একে ভিখুরামকে জিজ্ঞাসা করিল, আগুন লাগিল কি করিয়া? ভিখুরাম উত্তরে তাহার ঠোঁটটী একবার নাড়িল মাত্র। দারোগাবাবুও তাহাকে কম পিড়াপিড়ী করিলেন না, কিন্তু সে কোনও উত্তরই দিল না। ধীরে ধীরে সে ইসারায় বেণী রায়কে একবার কাছে আসিতে বলিল মাত্র।

বেণী রায় নিকটে আসিলে ভিখুরাম ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া বেণী রায়ের পদধূলি লইল এবং তাহার পর পল্লবের দিকে চাহিয়া মাথা নীচু করিয়া হাত তুলিল। বোধ হয় সে তাহাকে নমস্কার জানাইতেছিল, কিন্তু তাহা সে পারিল না। তাহার হাত মাটীর উপর পড়িয়া গেল।

পল্লবের চাকরকে বেণী রায়ের পদধূলি লইতে দেখিয়া সমাগত ব্যক্তি মাত্রেই অবাক হইয়া গিয়াছিল। কাহারও কাহারও মনে যে সন্দেহ হইতেছিল না তাহাও নয়। কিন্তু এই সন্দেহের সমাধান করিবে কে? ধীরে ধীরে তাহার চক্ষু দুইটী বুজাইয়া দিয়া ভিখুরাম সকল সন্দেহের অবসান করিল। ভিখুরাম নিস্তেজ হইয়া চক্ষু বুজাইবা মাত্র বেণী রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, বাবা ভিখু বাবা! বলো নাম বলো, রাম রাম, হরি হরি।

ভিখুরাম তাহার শেষ নিঃশ্বাস ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে সত্য রায়ের শয়ন কক্ষ হ'তে সারদামণি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওগো তোমরা শীঘ্রি এসো, বড়ঠাকুর যেন কি রকম করছেন। ভিখুরামকে শান্তিতে মরিতে দিয়া এইবার সকলেই সত্য রায়ের ঘরে ছুটিয়া আসিল। এতো হৈচৈ মুমূর্ষু রোগীর সহ্য হয় নাই, হৃদপিণ্ডে তাঁহার একটা প্রকাণ্ড ধাক্কা লাগিয়াছিল। অস্ফুটস্বরে একবার মাত্র তিনি বলিলেন, "বেণী আমিও চললাম, দেখিস ভাই, অন্ততঃ এদের বাঁচিয়ে রাখিস্। পল্লব বাবা দেখি তোর হাতটা।" ইহার পর রোগী ধীরে পারুলের হাতটী পল্লবের হাতে তুলিয়া দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। মুখ দিয়া তাহার শব্দ বাহির হইতেছিল ঘৰ্‌ ঘৰ্‌ অ—

চীৎকার করিয়া পারুলরাণী পিতার বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল, "বাবা বাবা আ। তুমি চলে যাচ্ছো, বাবা।"

রোগীর কণ্ঠ স্থির হইয়া গেল। বেণী রায়ের দিকে তাঁহার চক্ষু বিস্ফারিত করা ছিল। বেণী রায় ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিয়া তাঁহার চক্ষুর পাতা দুইটী বুজাইয়া দিয়া বলিলেন, "হাঁ পারু, দাদা চলেই গেলেন।—ওগো শোনো, তুমি পারুকে নিয়ে ও বাড়ী যাও, আমি জ্ঞাত-গুষ্টিদের ডেকে আনি।"

পারুল এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। এইবার অঝোরে কাঁদিয়া উঠিয়া সে বলিল, "কোথায় যাবো আমি? আমি এই বাড়ীতেই থাকবো।"

"কি করে তা হয়," পল্লব বলিল, "এই বাড়ী আজ হতে আর তোমাদের নেই। বেণীকাকা মামলায় এবারও জিতেছেন, জমিজমা যেটুকু ছিল তা'ও আমরা হারাবো, কারণ দু' নম্বর মামলাতেও যে আমরাই হারবো এ আমি এখন থেকেই বুঝতে পারছি। এ বাড়ীতে তোমার আর থাকা চলে না।"

"কেন, ওর কি এই একটা বাড়ী না'কি?" বেণী রায় উত্তর করিল, "ও আমাদের সঙ্গে এখন ওর পৈতৃক ভিটায় ফিরে যাবে। শ্রাদ্ধ-শান্তিও যা কিছু তা'ও ওখানে হবে।"

বেণী রায়ের কথায় মাথা নাড়িয়া পারুল উত্তর করিল, "তা হয় না কাকাবাবু। বাবা যার হাতে আমাকে তুলে দিলেন, তার সঙ্গেই আমি যাবো। আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন কাকাবাবু।"

বেণী রায় কোনও উত্তর করিলেন না। তিনি বিরক্তির সহিত মুখটা বিকৃত করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

পারুল পল্লবের বাড়ী আসিয়া উঠিয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে হবু স্বামীর গৃহে বাস, পল্লীগ্রামে এ এক নূতন বার্ত্তা। পাড়ায় পাড়ায় টি টি পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু পারুল বা পল্লব কাহারই তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। গ্রামের শেষ সীমান্তে ছিল পল্লবের বাড়ী। বাড়ীর পেছন হইতে সুরু হইয়াছে তেপান্তর মাঠ। প্রায় দশ মাইল ব্যাপী শুধু ক্ষেত ও খামার। চাষের সময় ভিন্ন ঐ স্থান জনমানব শূন্য থাকে।

দিগন্ত বিস্তৃত উন্মুক্ত ভূমির উপর দৃষ্টি রাখিয়া পারুল ভাবিতেছিল। এমন সময় পল্লব পিছন হইতে আসিয়া তাহার চোখ দুইটা টিপিয়া ধরিয়া বলিল, "কি ভাবছো পারু?"

"না কিছু না তো!" পারুল উত্তর করিল, "ভাবছি কত দিন বা[illegible]।"

পল্লব হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি, বিয়ের? সামনে ভালো দিন নেই, এ ছাড়া তোমার কাকাবাবুর সম্মতি চাই, আশীর্ব্বাদও।" "যাঃ তাই বুঝি বলছি, তা সম্মতি কাকাবাবু একদিন না একদিন দেবেনই। উনি নিজেই আমাকে সম্প্রদান করবেন, দেখো তুমি!" বলিয়া পারুল উঠিয়া দাঁড়াইল।

পারুল চলিয়া যাইতেছিল। পল্লব তাহার পথ অবরোধ করিয়া বলিল, "দেখো পারু, আমার ইচ্ছে, আরও দূরে ঐ ধান ক্ষেতের মাঝখানকার ঐ উঁচু জমিটাতে আমরাও একটা বাড়ী করবো।"

দূরে যত দূর দেখা যায় তা পল্লবদেরই জমি। তার বাপ-দাদারা কখনও তা জমা দেয় নি। পল্লব আজ ঐ বিস্তৃত ভূখণ্ড কাযে লাগাইতে চায়। ইতিমধ্যে সে একটী ছোট ট্রাকটার আনাইয়াছে, জল সেচের জন্য একটী ডিজিল পাম্পও। এইরূপ ব্যবস্থা করা ভিন্ন পল্লবের উপায়ও ছিল না।

কারণ বেণী রায়ের আদেশে কোনও চাষীই এইবার তাহাদের জমিতে চাষ করিতে রাজী হয় নি।

"বেশ হবে তা হলে," পারুল উত্তর করিল, "আর যখন তুমি ট্রাকটার চালাবে, আমি তোমার পাশে বসে থাকবো।"

"সত্যি ত," পল্লব বলিল, "কিন্তু তোমার হাঁস মুরগী দেখবে কে? ওগুলো দেখবার ভার তো এখন তোমার ওপর।"

"বারে, আমি দেখি না বুঝি?" অভিমান ভরে পারুল বলিল, "এইমাসে ডিম বেচে কতো হয়েছে জানো? দুশ টাকার ওপর। তবু মাত্র এক বিঘে জমিতে এদের রেখেছি। তবে ছাগল-টাগলগুলোর জন্তে একটা লোক রেখো।"

"লোক পাবো কোথায়? বেণী কাকার ভয়ে কেউ কি এদিকে আসে?" পল্লব উত্তর করিল, "ওগুলো নরেনদা দেখবে বলেছে। দেখো পারু এসব কাযও আমি ভদ্রলোকের ছেলেদের দিয়েই করাবো। কেরাণীগিরির চেয়ে এতে তারা বেশী পয়সা উপায় করবে। আমরা এইখানে এক নূতন জগৎ তৈরী করবো, সৃষ্টি করবো আমরা ভদ্রলোক চাষী, জাত চাষীরাও এতে কম উপকৃত হবে না।"

সত্য সত্যই এই কয়দিনে পল্লব এইখানে এক নূতন জগৎ তৈরী করিয়াছে। সে তাহার ভদ্রবংশীয় যুবক বন্ধুদের কয়েকজনকে বুঝাইয়া এই চাষের কাজে লাগাইয়াছে। ক্ষেতের মাঝে মাঝে যেখানেই উঁচু জমি পাইয়াছে, সেইখানে তাহাদের বাসের জন্ত ছোট ছোট সুদৃশ্য বাঁশের বাংলোও বানাইয়া দিয়াছে। ভদ্র যুবকদের কেহ কূপ হইতে ডিজিল পাম্পের সাহায্যে জল তুলিয়া সেচ দেয়, কেহ বা ট্রাকটার চালায়, প্রয়োজন মত বেড়াও তাহারা নিজেরা বাঁধিয়া লয়। বৃষ্টির দিকে তাহাদের চাহিয়া থাকিতে হয় না।

কেবল মাত্র পল্লবের বন্ধুগণ নয়, বন্ধুনী এবং তাদের মাতা ভগ্নীরাও তাহাদের সাহায্য করিয়া থাকে। চারিদিকেই প্রাচুর্য্য, পুকুরে পুকুরে মাছ, ক্ষেতে ধান, গোয়ালে গোয়ালে গরু। ইতিমধ্যে কয়েকটী তাঁতও বসানো হইয়াছে। অভাব কাহাকে বলে এই কয় মাসে তাহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে।

নিকটেই একটুকরা জমির উপর পল্লবের বন্ধু নরেন ও মিত্তেন ট্রাকটার চালাইতেছিল। অপর একটী জমির উপর বন্ধু সুধীন ও তাহার স্ত্রী কিসের বীজ পুঁতিতেছে।

"সত্যি, ভারী সুন্দর," পারুল বলিল, "মেয়ে পুরুষে রোজকার করা কতো ভালো।" পারুলের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সেখানে আসিয়া হাজির হইল, হরি বন্দোর ছেলে সুধীন। পারুলের কথার জের টানিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই ভালো। কিছুদিন আগেই একটা বৌ ভার মনে হ'চ্ছিল, এখন মনে হচ্ছে দু'টো থাকলে আরও সাহায্য হতো।"—"তাই নাকি?" পারুল বলিল, "কিন্তু এখনও তোমার বৌ হয়নি। থাক্ খুব হয়েছে। আজ না বেরুবে বলেছিল আমাদের সঙ্গে। কৈ? তৈরী হও।"

দূরে ষ্টোভে চায়ের জল ফুটিতেছিল। পারুল তাড়াতাড়ি চা তৈয়ারী করিয়া উহার সবটুকু একটা ফ্লাসকে ভর্ত্তি করিল। তাহার পর একটা নীল চশমা পরিয়া মাথায় একটা রুমাল বাঁধিল। পারুলকে প্রস্তুত হইতে দেখিয়া পল্লবও খাঁকি হাফপেণ্ট, চামড়ার হাঁটু ঢাকা বুট, রৌদ্র-নিরোধ নীল চশমা ও একটী খাঁকি হ্যাটও পরিয়া লইল। ইহার পর অপর একটী সোলার হ্যাট পারুলের মাথায় চাপাইয়া দিয়া চায়ের ফ্লাসকটী পারুলের গলায় ঝুলাইয়া দিয়া বলিল, "এসো এইবার, ট্রাকটারে উঠে আমার পাশে বসে হাওয়া খাবে।"

ক্ষেতের প্রান্তে একটী ছোট ট্রাকটার দাঁড়ানো ছিল। পল্লব পারুলকে পাশে বসাইয়া উহা চালাইতে লাগিল।

ট্রাকটার চালাইতে চালাইতে পল্লব ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া উঠিতেছিল। পারুল রুমাল দিয়া তাহার মুখের ও ঘাড়ের ঘাম মুছাইয়া দিয়া হাতের ছোটো পাখা দিয়া তাহাকে কিছুক্ষণ ব্যজন করিল। এবং তাহার পর অনুযোগ করিয়া বলিল, "আচ্ছা, আজ এই পর্য্যন্ত থাক। এখন চলো ঐ তাল গাছটার গোড়ায় বসে চা ও কিছু কেকের সদ্ব্যবহার করি। একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার ট্রাকটারে উঠবো।"

ক্ষেতের পাশের একটা উচু জমির উপর চার-পাঁচটী তালগাছ ছায়া বিতরণ করিতেছিল। পল্লব ও পারুল চা, কেক্ ও কিছু মুড়ীসহ একটী তাল গাছের তলায় বসিয়া পড়িল। একে একে তাদের অন্যান্য বন্ধুরাও সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, চা ও খাবারে ভাগ বসাইতেও ভুলিল না।

এক মুঠো মুড়ী মুখে পুরিয়া চিবাইতে চিবাইতে পারুল বলিল, "জমি তো চষা হলো, কিন্তু বৃষ্টি কৈ?" "কোনও প্রয়োজন নেই," পল্লব উত্তর করিল, "আমাদের তো ডিজেল পাম্প আছে, মাঠে মাঠে নলকূপও। কতো গ্যালন জল চাই? তবে দুর্গতি হবে চাষাদের। তা কাছাকাছি যারা আছে, তাদেরও আমরা জল সরবরাহ করবো।"

কয়েক ঘণ্টা ট্রাকটার চালাইয়া তাহারা যখন ক্ষেতের চাষ শেষ করিল, তখন রৌদ্র পড়িয়া আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি ট্রাক্টার কয়টী ঘরে তুলিয়া পল্লব ও তাহার বন্ধুরা সাবান লইয়া পুকুরের জলে নামিয়া পড়িল। এখুনি পরিষ্কার হইয়া তাহাদের পল্লবদের কোঠা-বাড়ীতে আসিতে হইবে। এই রাত্রে সেখানে প্যাথি-ফিলিম দেখানোর কথা আছে। ইতর ভদ্র বহুলোকের সেইখানে আগমন হইবে। ছোট-খাটো একটি অভিনয়েরও বন্দোবস্ত হয়েছে। স্বয়ং মহকুমা হাকিম এই অভিনয় দেখিবেন, এবং এই গ্রাম্য সভার সভাপতিত্বও করিবেন।

গা ধোয়ার কাজ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। পল্লব তাহার বন্ধুদের

লইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় রুদ্র মূর্ত্তিতে সেইখানে আসিলেন, মুখুয্যে পাড়ার প্রৌঢ় ভদ্রলোক টুকু ঠাকুর্দ্দা। চীৎকার করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এই তো তোদের নিজেদেরই পুকুর রয়েছে, তা আমার পুকুরে ওদিন হামলা করলি কেন? জোর করে পানা তোলা হয়েছে। ঐ পানা আবার আমার পুকুরে ফেলে দিতে হবে। নচ্ছার পাজী কোথাকার। তন্ত্রমন্ত্রের দেশে যতো যন্ত্র আমদানী করে গাঁ-টা বাসের অযোগ্য করে তুলেছিস, এখন আমার পুকুরটাতেও দখল সাব্যস্ত করতে চাস। দেওয়ানী কায কারবার আমি বুঝি না, না? কলা মূলো ডিম আর ধান বেচে কিছু পয়সা করে বড্ড বাড় বাড়িয়েছো। ভদ্রলোকের ছেলে চাষ করতে লজ্জা করে না, আবার মেয়ে মদ্দে চাষে নেমেছে। যত সব বজ্জাতি ব্যাপার; আর কেলেঙ্কারী।"

এই দিন সকালে পল্লবের প্রতিষ্ঠিত পল্লীমঙ্গল সমিতির ম্যালেরিয়া নিবারণী বিভাগের ছেলেরা ভদ্রলোকের পুকুর হইতে পচা পানাগুলি অতিকষ্টে তুলিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে ভদ্রলোকের খুসী হইবার কথা, কিন্তু তাহাকে এইভাবে গালিগালাজ করিতে শুনিয়া পল্লব হতভম্ব হইয়া গেল। বিনা পয়সায় তাহারা পরের জমির জঙ্গল কাটিয়া দিয়াছে, পরের পুকুরের পানা তুলিয়াছে, গ্রামকে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য। মনের বিরক্তি মনে রাখিয়া পল্লব বলিল, "তা না হলে ঠাকুরদ্দা, বোর্ড হতে ওগুলো তুলবার জন্যে নোটিশ আসতো। আপনি মিছামিছি রাগ করছেন।"

পল্লবের বন্ধু নরেনের স্ত্রী রমা ও তাহার বোন বীণা পুকুর হইতে রাজহাঁসকটাকে তাড়াইয়া গৃহে লইয়া যাইবার জন্য পুকুর পাড়ে আসিয়াছিল। এই কয়দিন মাঠের মাঝে ঘর বাঁধিয়া বাস করিয়া, ক্ষেত খামারের কায করিয়া তাহার সাহসী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর ইহারা ছিল এই গাঁয়েরই মেয়ে। বীণা রুক্ষস্বরে বলিয়া

উঠিল, "কার সঙ্গে কথা কইছো, পল্লবদা। যে বুঝবে না তাকেও তুমি বোঝাবে, উনি সিভিল রাইটের কথা ভাবছেন। লেকাপড়া আমরাও শিখেছি, তা'ও এই গাঁয়ে না, কোলকাতায়। জানো পল্লবদা, আমরা এইখানে সভা করবো; জেনে ওঁরা দাসেদের বাগানে মিটিং বসাচ্ছে না। ওঁদের আলোচ্য বিষয় হবে, গাঁয়ের মঙ্গলামঙ্গল নয়, ওঁদের আলোচনার বিষয় হবে, মিটিংটা বাঁড়ুযো বাড়ীতে না হয়ে এইখানে হচ্ছে কেন? আর মহকুমা হাকিম এখানে ঘন ঘন আসেন কেন? তা দাঠাকুর আপনাদের গ্রাম তো আমরা ছেড়ে দিয়েছি, এই মাঠেই থাকবো আমরা, গাঁয়ের ভিতরে ঢুকবো না। তবে এ'ও বলে রাখছি, আমাদের সভায় ওনাদের মানা সত্বেও শূদ্র ভদ্র সকলেই আসবে। আমরা মেয়েরাই বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ করে এসেছি। আমরা তাদের কথায় ভোলাই না, সত্যিকারের উপকারও করি।"

"বেশী কথা কোয়ো না বলছি," ক্রুদ্ধ হইয়া টুকে ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "এখনও ও পাড়ায় আমি বেঁচে আছি, এ পাড়ায় বেণী এখনও মরে নি। যত নচ্ছার হচ্ছে ঐ পেল্লব, নেড়া নেড়ীর যুগ ফিরে এলো। লজ্জা করে না, ভদ্রলোকের সোমত্ত মেয়েকে এনে বাড়ী রাখতে। দু' বছর হতে চললো, বিয়ে করার নামও নেই। আবার এটাও এসে জুটেছে। আবার থিয়েটার হচ্ছে। আমাদের কেচ্ছা করা হবে বুঝি? যাচ্ছি, আমি বেণীর কাছে।"

"কি বলছেন ঠাকুর্দ্দা, আবার ওকে কেন?" পল্লব উত্তর করিল, "ও আব্দার ধরেছে, না কাকাবাবু নিজে দাঁড়িয়ে বিয়ে না দিলে, ও কিছুতেই বিয়েতে বসবে না। তা দিন না, আপনারা বলে কয়ে ঠিক করে।"

খেঁকাইয়া উঠিয়া টুকে ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "ঠিক করাচ্ছি, তোর বোর্ডের মেম্বার হওয়াও বার করছি, ঐ হাকিমের সঙ্গে গলাগলি করাও।"

কথা কয়টা. বলিয়া গজ গজ করিতে করিতে ঠাকুর্দা স্থান ত্যাগ করিলে, পল্লব বলিল, "ভয় এদের করি না, ভয় করি বেণী কাকাকে। তিনি ভদ্রগৃহস্থ ও চাষীদের মধ্যে একটা প্রাচীর তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন আমরা জাত চাষীদের সঙ্গে মিশে গেছি। তাদের সুখ দুঃখের ভাগী আমরা এখন। শ্রেণী সংগ্রাম এখন কল্পনারও বাইরে। এখন প্রয়োজন আমাদের নাইট স্কুলের সংখ্যা বাড়িয়ে ওদেরও শিক্ষিত করে তোলা। তা হ'লে বাকি যা কিছু ভেদ আছে তা'ও মুছে যাবে।"

"আচ্ছা পল্লবদা," পল্লবের বন্ধু নরেন দাস বলিল, "মহকুমা হাকিমের সুপারিশে কিছু টাকা পেলে, আমাদের ঐ হাসপাতালের চালা ঘর দুটো পাকা করা যায় না?" উত্তরে পল্লব বলিল, "না,. তা হয় না। কোঠা বাড়ীর হাসপাতাল আমাদের ভুলিয়ে দেবে যে ঐ গুলো তৈরি হয়েছে গরীব চাষীদের জন্তে। আমরা বেড্ বাড়াবো কিন্তু কোঠা বানাবো না। আমার এই পৈতৃক বাড়ীটা ধানের যৌথ গুদামের জন্তে ছেড়ে দিয়ে তোদের ঘরের পাশে তোদের মতই বাঁশের বাঙ্লো বানিয়ে নেবো। এই কথাই পারুলকে আমি আজ বলছিলাম।"

পল্লব দলবল সহ পুকুর ঘাট ত্যাগ করিয়া তার দ্বিতল বাগান বাড়ীর আলিন্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। প্রতিষ্ঠানের ছেলে মেয়েরা বাড়ীটী ও তাহার গেট সুন্দরভাবে সাজাইয়াছে। চারিদিকে বাঁশের ও বেতের চেয়ার ও বেঞ্চি। নিজেদেরই তৈরী আসবাব দিয়া তাহারা সভাস্থল সাজাইতেছিল।

দুই-একজন করিয়া লোকজন আসিতে সুরু করিয়াছে। জনসেবা দ্বারা পারুল ও পল্লব ইতিমধ্যে বেণী রায়ের তাঁবের চাষীদেরও হৃদয় জয় করিয়া ফেলিয়াছে। তাই তাঁহার হুকম অমান্য করিয়াও উহাদের অনেকে এইখানে আসিয়াছে।

এদিকে কথাটা বেণী রায়ের কানে যাইবামাত্র তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। ইহার উপর টুকে ঠাকুর্দাও তাহাকে বহু কথা শুনাইয়া আসিয়াছেন। চীৎকার করিয়া তিনি হাঁকিয়া উঠিলেন, "এই ফকীর! সন্ত্রাসের দল এসে গেছে।" উত্তরে ফকীর বলিল, "এ গাঁ, ও গাঁ হ'তে প্রায় চল্লিশ জন জোয়ান এসেছে। জান কবুল করে তারা লড়বে, সড়কী, বাঁশ, মশাল সবই প্রস্তুত করেছি, কর্ত্তা।"

এঁ্যা! আমার হুকুম অমান্য। গেল বারে অজন্মায় পল্লব ওদের দু' আড়ি করে ধান দিয়েছে, বলে ওরা আমাকেও ছেড়ে যাবে? বেণী রায় গজ গজ করিতে করিতে বলিলেন, আমি ওদের জন্যে কিছু করি নি, এঁ্যা! তবে আয় দেখি ঐ হাকিমকেও আজ গুম করবো। এখন ব্যাপারটা দেখে আসি চল, ওসব পরে হবে। এখন চাষী মজুরদের ফিরিয়ে আনতে হবে, রীতিমত শিক্ষা দিয়ে, আমার হুকুম অমান্যি?"

বেণী রায়কে সদলবলে পল্লবের বাটীতে আসিতে দেখিয়া পল্লবও সদলবলে আগাইয়া আসিয়া বলিল, "এই যে কাকাবাবু! আপনিও এসেছেন। আসুন!" উত্তরে বেণী রায় বলিলেন, লোক দিয়ে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলে কেন? নিজে যেতে পারো নি? বলি মিটিঙে হবে কি? "আমার কেচ্ছা?" বিব্রত হইয়া পল্লব উত্তর করিল, "বলেন কি আপনি; আপনি না হয় এই সভায় সভাপতিত্ব করবেন। মহকুমা হাকিম এখানকার চিফ্ গেষ্ট্ মাত্র।"

"আর ন্যাকামী করতে হবে না," বেণী রায় উত্তর করিল, "ওরা সব কারা! বার করে দাও ওদের। ওরা আমার লোক তা জানো তুমি প্রজারা নালিশ জানিয়েছে, তাদের কি বোকে ঘরের বার করে এখানে নাচাচ্ছো তুমি। ও সব বেল্লাকিপানা গাঁয়ে ঘরে চলবে না। চলে আসতে বলো ওদের নইলে এই লাঠির ঘায়ে—"

"আমরা প্রস্তুত কাকাবাবু!" দৃঢ় কণ্ঠে পল্লব উত্তর করিল, "আমার বাড়ীতেও দুটো রাইফেল, আর চারটে বন্দুক রয়েছে, তাদের ব্যবহারও আমরা জানি, কিন্তু তার একটাও আমরা ব্যবহার করবো না। এই আমি আমার মাথা পেতে দিচ্ছি, যত পারুন আঘাত করুন।"

পল্লবের এই ধৃষ্টতা বেণী রায়ের সুযোগ্য সাকরেদ মাখনের সহ্য হইল না। সে পল্লবের মাথা লক্ষ্য করিয়া যষ্টি উত্তোলন করিল। কিন্তু উহা তাহার মাথায় পড়িবার পূর্ব্বেই পল্লবের বন্ধু নরেন আগাইয়া আসিয়া আঘাত নিজের মাথায় লইয়া ভূমির উপর লুটিয়া পড়িল। নরেনকে রক্তাক্ত দেহে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া পল্লবের ইসারায় ছেলেমেয়েরা যে যেখানে ছিল ছুটিয়া আসিয়া বেণী রায়ের দলবলের সম্মুখে মাথা পাতিয়া বসিয়া পড়িল। ইহাদের এই অদ্ভুত আচরণে সন্ত্রাস ও ফকিরের দল অবাক হইয়া গিয়াছিল।

এ আবার কি? যাদু না কি? হতভম্ব হইয়া সন্ত্রাস বলিল, "আমরা লড়তে এসেছি লাঠির সঙ্গে, মাথার সঙ্গে নয়। না না কর্ত্তা, আমরা খুনে নয়, আমরা হচ্ছি লড়াকু লোক। এ আমরা পারবো না।" সন্ত্রাসের কথা শেষ হইতে না হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "ঐ মহকুমা হাকিম! মোটরের হর্ণ দিচ্ছেন,—এলেন বলে।"

হাকিমের আগমন বার্ত্তায় চারিদিকে একটা চাঞ্চল্য আসিয়া পড়িল। বেণী রায়ও প্রমাদ গুনিয়া তাহার দলবলকে ত্বরিত গতিতে সরাইয়া দিলেন, কিন্তু তিনি নিজে স্থান ত্যাগ করিলেন না। তিনি ছাড়া এই ব্যাপার এখন সামলাইবেই বা আর কে? মহকুমা হাকিম যন্ত্রশকট হইতে নামিয়া বেণী রায়কে দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, এই যে বেণীবাবু, আপনিও এসেছেন। আপনারা তা'হলে মিলেমিশেই কাষ করছেন। আপনার নেতৃত্ব পেলে এরা আরও

ভাল কায করবে। সত্যি আমি খুবই খুসী হয়েছি, দূর থেকে গোলমাল শুনে আমি রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

"ও কিছু না", উত্তরে পল্লব বলিল, "একটা ছোটখাটো এক্সিডেণ্ট হয়েছিল, ছেলেটা এখন ভালোই আছে, হাসপাতালে গেছে। আসুন কাকাবাবু; আসুন স্যার, ভিতরে চলুন আপনারা।"

বেণী রায় ফাঁপরে পড়িলেন। না বলিবার উপায়ও ছিল না। ক্রূর দৃষ্টিতে পল্লবের দিকে চাহিয়া তিনিও বলিলেন, "হ্যাঁ চলো, আসুন স্যার।'

হাকিম ও পল্লবের সহিত বেণী রায়কেও সভাস্থলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ইতর ভদ্র সকলে বুঝিল যা কিছু বিবাদ তা সন্তোষজনক ভাবে মিটমাট হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা তো রহিলই, এমন কি খবর পাইয়া যাহারা ভয়ে তখনও আসে নাই, তাহারাও দলে দলে সভায় আসিল।

এতো বড় পরাজয় যে কখনও জীবনে ঘটিবে, বেণী রায় তাহা কল্পনাও করেন নি।

৯

প্রশস্ত বৈঠকখানায় ফরাসের উপর ঝাড় লণ্ঠনের তলায় বসিয়া বেণী রায়, রূপার গড়গড়ার দীর্ঘ নলে মুখ দিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। নিকটে একটা ছোট চৌকির উপর ফকির ঢুলে বসিয়া রহিয়াছে। বেণী রায়ের ন্যায় আজ ফকিরকেও চিন্তিত দেখা যায়।

বার-দুই গড়গড়ায় টান দিয়া বেণী রায় বলিল, "কি রে, ফকরে! ব্যাপার কি রকম বুঝছিস্?" উত্তরে ফকির বলিল, "সুবিধে নয় কর্ত্তা! ও দিন চাষীদের এ পাড়াটাও পোড়ালে হতো। এদিকে অতোগুলো

বাকি খাজনার নালিশ করা উচিত হয় নাই। বিশেষ করে বাউলদাকে উচ্ছেদ না করলেও চলতো। অবশ্যি অবাধ্য ওরা হয়েছিল। ছোট-লোক তো, মাঝে মাঝে মতিচ্ছন্ন হয়ই। এতোটা শাস্তি না দিলেও চলতো। আমাদের ঠিকে ভুল হয়েছে।"

"কিন্তু ফকির!" বেণী রায় বলিল, "আমার খাবে আমার পরবে, অথচ তাঁবেদারী করবে ওরা ঐ পল্লবের। তিন বছর তো খাজনা আমি এমনিই নিই নি। কাছারী বাড়ীতে না হয় বলে দে; জমিগুলো নায়েব নিজে গিয়ে ওদের ফিরিয়ে দিয়ে আসুক। তা ওরা আছে এখন কোথায়?"

উত্তরে ফকির বলিল, "শুনেছি, পারুলদি নিজে এসে ওদের ডেকে নিয়ে গেছেন। ওদের ওরা চাষের জমিও দেবেন বলেছেন। বাউলদার মেয়েটা কালাজ্বরে ভুগছিল, তাকে ওদের হাসপাতালে ইনজেকসনও দেওয়া হচ্ছে। এখন কি ওরা আসবে।"

"কি? তাই না'কি?" বেণী রায় বলিল, "ওদের বল, জমি তো ওদের দোবই আমি, তা ছাড়া টাকাও। সহর থেকে ডাক্তারও আমি আনাবো। সাত পুরুষের প্রজা ওরা আমাদের, অপরের কাছে যাবে কেন ওরা?"

উত্তরে ফকির বলিল, "এতো দিন ওদের লুঠের টাকা তো দিয়েছিই, ট্যাক্ থেকেও কম টাকা দিইনি। কিন্তু এখন টাকা নিয়ে করবে কি ওরা? ঘোরতর অজন্মা, বৃষ্টির অভাবে কারোই ধান হয় নি। কিন্তু পল্লববাবুরা তো বৃষ্টির মুখ চেয়ে থাকেন নি। ভোগভগীরথকে মাটী খুঁড়ে উঠিয়ে জলের সেচ দিয়েছেন। ওর ঐ হাজার বিঘেতে ধান হয়েছেও প্রায় হাজার হাজার আড়ী। ধানের গোলা থেকে সকলকেই তিনি কিছু কিছু ধান দিচ্ছেন। আমরা টাকা দিতে পারি, কিন্তু ধান তো দিতে পারি না। ধান আর কিনতেও পাওয়া যাচ্ছে

না কোথাও। পেল্লববাবু আরও কইয়ে দিয়েছেন, পরের বছর হতে তিনি তাদেরও জমিতে জল সরবরাহ করবেন, দরকার হলে কলের লাঙ্গলও তাদের ধার দেবেন। পেল্লববাবু যে সময় এই সব প্যাঁচ কষতেছেন, পারুলদি সেই সময় চাষী বৌদের ডেকে ডেকে হাঁস মুরগী পালতে শেখাচ্ছেন, এমন কি নগদ পয়সায় ডিম ও তাদের তৈরি জিনিস কিনে নিয়ে কোলকাতায় চালান দিচ্ছেন, ঠিক এই সময়েই আপনি প্রজা শাসন সুরু করলেন। এ জন্যেই বলছিলাম, কর্ত্তা, কাযটা ভালো করলেন না।"

"তা শাসন করেছি, বেশ করেছি," বেণী রায় বলিলেন, "বাপ মা কি ছেলে মেয়েকে শাসন করে না না'কি? তা বলে ওরা আমার সঙ্গে লড়তে আসবে।" "লড়লে তো কর্ত্তা, ভালোই ছিল," ফকির উত্তর করিল, "লড়লে তো একদিনেই ওদের ঠাণ্ডা করতাম। লড়বে না ওরা কেউ, ওরা এখন ভিন্ন পথে চলেছে।"

"এ্যাঁ? বলিস কি? এইবার তোদেরও এরা ডুবোবে," বেণী রায় বলিলেন, "শেষে সারা দেশটাকে দেখছি ছোঁড়াটা ক্লীবে পরিণত করে দেবে। এর পর যখন চোর ডাকাতেরা হামলা করবে, তাদের রুখবে কে? তারা তো আর তোদের মত সত্যপীর নয়। এর চেয়ে যদি ওরা আমার মাথায় লাঠি বসাতো, তাতেও আমি খুসী হতাম, বুঝতাম ওরা এখনও মরদের বাচ্ছাই আছে। আমার শিক্ষা ব্যর্থ হয় নি।"

"ওখানে আমারও খটকা লাগে কর্ত্তা," ফকির উত্তর করিল, "আসুন আমরা ওদের বুঝিয়ে দি। তাদের ব'লে আসি যা কচ্ছিস তা ভালোই, কিন্তু নির্ব্বল হয়ে যাস কেন?" "না না কর্ত্তা, ওরকম করে তুলসী পাতার রস দিয়ে ভাত খেয়ে অহিংস অহিংস করলে আমরা উচ্ছন্নই যাবো। আমরা হচ্ছি কালী মায়ের বাচ্ছা, আমরা পুরুষ, কাপুরুষ নই।"

গড়-গড়ায় আরও দুই-একটা টান দিয়া বেণী রায় বলিল, "হুঁ, যদি উপকার হয় তা হোক, আমি বাধা দেবো না। পল্লব যা করছে, তা আমারই কল্পনা ছিল, ফকির। কিন্তু ঐ পল্লবদের বাপ ঠাকুর্দ্দারাই তা আমাকে করতে দেয় নি। আজ কি আমার মনে হচ্ছে জানিস ফকির! আমাদের দিন বোধ হয় ফুরিয়ে এলো। তবে মাথা উঁচু করে আমি পৃথিবীতে এসেছিলাম, কারো কাছেই আমি মাথা নোয়াই নি, মাথা উঁচু করেই পৃথিবী হতে আমি বিদায় নেবো, দেখিস।"

"কিন্তু একটা কথা কর্ত্তা," ফকির বলিল, "কালী পূজা তো এসে গেলো। দু'শ বছরের পূজা আপনাদের। এই সময়ই না গোলমাল হয়। যত নষ্টের গোড়া ঐ হরেন বাঁড়ুয্যে। পল্লবের পিছনে দিনরাত লেগে থেকে, এখন তিনিই ওকে সলা দিচ্ছে, আপনার বিরুদ্ধে। শুনেছি, ইতর ভদ্র কেউ না'কি এবার আর রায় বাড়ীতে নিমন্ত্রণে আসবে না। এই রকম ঘোঁট পাকাচ্ছেন তারা।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বেণী রায় বলিল, "তা পাকাক না। তোরাও তো কয়েকজন আসবি। ভদ্রলোকেরা না এলো, এলো; তোরাও কি ত্যাগ করবি আমাকে?" বেণী রায়ের পদ ধূলি লইয়া, জিব কাটিয়া ফকির বলিল, "এ কি বলছেন কর্ত্তা, আমরা যে আপনার নিমকের চাকর। তা'ও কি কখন হয় না'কি? ঐ যে মা এসেছেন, কিছু বলার আছে মা?"

বেণী রায়ের স্ত্রী সারদামণি এক গেলাস বেলের সরবত হাতে ঘরে ঢুকিয়া স্বামীকে বলিলেন,"কি ভাবিছো বসে বসে, এই না'ও এই টুকু খেয়ে নাও। ও প্রজারা একটু মাঝে মাঝে অভিমান করেই থাকে। আমি নিজে গিয়ে ওদের বুঝিয়ে আসবো।"

সারদামণির কথায় লাফাইয়া উঠিয়া ফকির বলিল, "এই তো হচ্ছে কথা মা। আপনাকে তারা সাক্ষাৎ দেবী বলেই জানে। আপনি

সামনে এসে দাঁড়ালে কি কথা আছে না'কি ?" "চুপ কর।" ধমকাইয়া উঠিয়া বেণী রায় বলিলেন, "মেয়ে মানুষের আঁচল ধরে আমি চলি না। আমি সিংহের বাচ্চা। না, ও কক্ষনো যাবে না। এতো দিন আমিই পেরেছি, আজও পারবো।"

তা যা খুসী তাই করো, মৃদু স্বরে সারদামণি বলিলেন, তবে বাইরের অশান্তি ঘরে এনো না। আর বয়সও তো হচ্ছে, ভালোও লাগে আর? রায়বংশের তো ঐ একমাত্র সলতে, পারু, টিপ্ টিপ্ করে জ্বলছে। তুমি বাপু এইবার ওদের ক্ষমা করে দু' হাত এক করে দাও। এতে কোনও নিন্দে হবে না। বরং সব দিক উজ্জ্বল হবে। বাছাকে দেখিও নি অনেক দিন। একবার ডাকলে হয় না গা!"

"না, না, তা হবে না," দৃঢ় স্বরে বেণী রায় বলিলেন, "ত[illegible] দি ওরা এসে ক্ষমা চাইতো। কি রকম বেল্লিকই না, সেদিন হাকি[illegible] সামনে ওরা কি করে দিলে আমাকে। কখনও কখনও ক্ষমা করলে[illegible]লি না আমি কিছুই। গ্রামের শূদ্র ভদ্র সবই এক হোক ক্ষতি নেই। আমি একাই একশো। কেউ না মনে করে, ভয় পেয়ে এই গাঁ ছেড়ে আমি চলে যাবো।"

"চুপ করুন কর্তা, মা ঠাকরুণ! যান এইবার, দেখুন কে [illegible]তে লাগছেন।" কথা কয়টী বলিয়া ফকির উঠিয়া দাঁড়াইল। [illegible] ও? সুরেনদা?" বেণী রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর? এমন অসময়ে?" উত্তরে সুরেন বাড়ুয্যে বলিলেন, "আর তো সহ্য হয় না ভাই! বিলের ওপর দিয়ে রাস্তা করছিস্ কর, কিন্তু আমার জমির ওপর দিয়ে কেন? কাল রাত্রে প্রায় ইতর ভদ্র দু'শো লোক নিয়ে আধ মাইল তারা রাস্তা বার করেছে, আমার আর নরো ঠাকুরের সর্ব্বনাশ করে। আপনারও কিছু জমি নিয়েছে শুনেন নি বুঝি। আমি বলতে গেলাম, পারু বললে, ও তো আমাদেরই জমি। কাকা-

বাবু কিছু বলবে না। না হে, একটা বিহিত করো, ভাই। শত্রুর শেষ রেখো না। এবার আমরাও তোমার পিছনে আছি।"

বেণী রায় স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সুরেন বাড়ুয্যের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বেণী রায় উত্তর করিলেন, "তা মন্দ কাযই বা করেছে কি সে? জল কাদা ঘেঁটে কতো দিন আর রাস্তা চলবেন। আপনার যে-টুকু জমি গেছে, তার যা দাম তা আমার কাছ থেকে নেবেন। আর ওরা কি আমার পর না' কি, যে আপনি বললেই তাদের পিছনে আমি লাগতে যাবো। যান যান, চলে যান এখান থেকে। আপনাদের সকলকেই আমি ভালো করে চিনে নিয়েছি।"

বেণী রায়ের এই অদ্ভুত ব্যবহারে সুরেন বাড়ুয্যে অবাক হইয়া গিয়াছিল। ব্যাপার কি! শেষে কি দুধে আমে এক হইয়া গেল। তিনি একটু আমতা আমতা করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

"এর পর যা হবে কর্ত্তা।" ফকির বলিল, "তা বুঝতে পারছি। উনি বোধ হয় এবার পেল্লববাবুর সঙ্গে যোগ দেবেন।" উত্তরে বেণী রায় বলিল, "ভাইয়ে ভাইয়ে বা খুড়ো ভাইঝিতে আমরা হাজারবার লড়াই করবো, কিন্তু বাইরের লোকের সঙ্গে বিবাদ হলে, আমরা তখন এক দুই নয়।"

"ওসব কথা ভাবছি না কর্ত্তা। ওকে ভয়ও করি না আমরা।" উত্তরে ফকির বলিল, "ভাবছি কালী পূজার রাত্রের কথা। ওদিন ইতর ভদ্র কেউই বোধ হয় আসবে না এখানে। এখন সবই নির্ভর করছে আমাদের মায়ের উপর। ইনি নিজে যদি গিয়ে শুধোন, তাহলে অন্ততঃ প্রজারা এখানে ছুটে আসবে। কারো কথাই তারা শুনবে না, এখন যা কিছু নির্ভর তা মায়ের উপর।"

"এঁ্যা, তাই নাকি! এত দূর!" বেণী রায় বলিলেন, "এ বাড়ীর মেয়ে গেছে বলে, বৌকেও যেতে হবে ঐ চাষী পাড়ায়, তা'ও তাদের খোসামোদ

করতে, কি গো যাবে নাকি?" উত্তরে সারদামণি বলিল, "না, তা আমি যাবো না। ওরা আমার ছেলে-মেয়ে। ওদের বাড়ী যেতে নিজের আমার কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তোমার মতই আমার মত।"

১০

রাত্রি দশ ঘটিকা বাজিয়া গিয়াছে। রায় বাড়ীর বিরাট পূজার দালানে বেণী রায় তাঁর একমাত্র বন্ধু নরেন গাঙ্গুলীকে লইয়া তখনও পর্য্যন্ত বসিয়া ছিলেন। ইতর ভদ্র বহু ব্যক্তিকেই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, কিন্তু কেহই আসে নাই।

পূজার দালানের খিলানে খিলানে ঝুলানো বড় বড় ঝাড় লণ্ঠনের ভিতরকার বাতিগুলি বৃথাই জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিবিয়া যাইতেছে। স্তিমিত-প্রায় বাতিগুলির দিকে বার-দুই চাহিয়া দেখিয়া বেণী রায় হাঁকিয়া উঠিলেন, "ফকির!" বিশ্বাসী সাকরেদ ফকির দুলিয়া বাহিরের রোয়াকে বসিয়া তামাক খাইতেছিল। হাতের কলিকাটী নামাইয়া রাখিয়া ফকির উত্তর করিল, "এজ্ঞে?"

বেণী রায় বলিলেন, "বুঝছিস্ কিছু!"—"এজ্ঞে হ্যাঁ।" ফকির উত্তর করিল, "বুঝছি বৈ কি কর্ত্তা, এ সবই পেল্লববাবুর চক্রান্ত।"—"তা ভদ্রলোকেরা না হয় নাই এলো, কিন্তু," বেণী রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার প্রজারা, তারা এলো না কেন?"

"সত্য কথা বলবো, কর্ত্তা!" মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ফকির উত্তর করিল, "বড়ো কর্ত্তার মৃত্যুর ব্যাপারে সকলে আমাদেরই সন্দেহ করেছে। তা ছাড়া ঐ বাড়ী পোড়ার পর পেল্লববাবু পারু-দিদিকে নিয়ে ওদের পাড়াতেই বাস করছে? হয় তো কিছু

গলা দিয়ে থাকবেন। ভিতরের কথা তো পূর্ব্বেই আপনাকে বলেছিলাম কর্ত্তা! তা মা যদি অন্ততঃ প্রজাদের ওখানেও একবার যেতেন!"

"এঁ্যা, তুইও এ কথা বলিস্? এ কিন্তু এতটা সম্ভব হলো কি করে?" বেণী রায় বলিলেন, "আজ যে ভদ্রলোক মাত্রই আমার উপর বিরূপ, তা ঐ ছোটলোকদের ওপর আমার অত্যধিক দরদের জন্যেই কি নয়? সব জেনে শুনেও ওরাও আমার সঙ্গে বেইমানি করবে। ওদের জন্যে কি আমি কিছু করি নি?"

"এঁজ্ঞে, মদ্দা কথা হচ্ছে এই," ফকির উত্তর করিল, "ওরা আমাদের বাড়ী এলে তবে আমরা ওদের উপকার করেছি, কিন্তু গোপালবাবু আর পারুদি যে ওদের বাড়ী গিয়ে ওদের উপকার করে থাকেন। তাই না তাঁরা এতো শীগ্গী তাদের আপনার হয়ে গিয়েছেন। তা ছাড়া, আমাদের কয়েকটা কাজ একেবারেই ভালো হয় নি, কর্ত্তা। তবে তবে, আমরা কর্ত্তা আপনার নিমকের চাকর। তাই আমি, মদনা আর গগনা ঠিক এসেছি। কিন্তু আমার ছেলেরা আসেনি, কর্ত্তা? কিছুতেই আমি তাদের আনতে পারলাম না। আর এসেছেন ঐ নরেন ঠাকুর, কারণ তার কীর্ত্তিকলাপ এতো বেশী প্রচার হয়ে গিয়েছে, যে এখানে আসা ছাড়া, আজ তাঁর অন্য কোথাও যাবার উপায়ও নেই।"

গত দুই শত বৎসর হইল রায় বাড়ীর এই পূজার দালানে গভীর নিশীতে শ্যামা মার পূজা হইয়া আসিতেছে।

রায় বাড়ীর ও তৎসংলগ্ন পূজা মণ্ডপের বর্ত্তমান অধিকারীরূপে বেণী রায়ের উপরই এইবারকার পূজার ভার বর্ত্তিয়াছিল। অনুষ্ঠানের যে কোনও ত্রুটী হইয়াছে তাহাও নয়। গ্রামের ইতর ভদ্র সকলেই পূর্ব্বেকার মতই নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। আয়োজনও করা হইয়াছিল প্রচুর। শহর হইতে দশজন পাচক আসিয়াছে, দুই দুইটা ভিয়ান জলিয়াছে। ডেকচি ডেকচি খিঁচুড়ী, পরামান্ন, মিষ্টান্ন আদি রান্নাবাড়ীতে মজুত

হইয়াছে। পূজার দালানে, কক্ষে কক্ষে, কাঁচের কাটি ঝুলানো দামী দেওয়ালগিরির তলায় সারি সারি কুশাসন পাতিয়া রাখিয়া দাস-দাসী ও ভাড়াটিয়া পরিবেশকের দল ক্ষুন্নমনে অপেক্ষা করিতেছে। বহির্বাটীর উঠানে এবং বসিবার কক্ষ গুলিতে ফরাস, চাদর বিছানো রহিয়াছে। কিন্তু যাঁহাদের জন্য এই ব্যবস্থা তাঁহারা কেহই আসে নাই, আসিবে বলিয়াও মনে হয় না।

পূজার দালানের মধ্যস্থলে অধিষ্ঠিত সপ্ত হস্ত পরিমিত দীর্ঘ কালী মূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া নরেন গাঙ্গুলী তখনও পর্য্যন্ত ঝিমাইতেছিল। এইবার নড়িয়া বসিয়া তিনি বলিলেন, "মধ্য রাত্রি তো সমাগত প্রায়, নিশি পূজার তো সময়ও হয়ে এলো। তা কৈ? ভট্টচাষ্যিমশাইও তো এলেন না। ছিঃ ছিঃ সাত পুরুষের পুরোহিত বংশ। দুই ভাইএর এক ভাইও তো আসতে পারতিস্। নেমকহারাম কোথাকার। তোদের বাপ ঠাকুর্দ্দা, প্রতি বৎসরই মা মা, বলতে বলতে এইখানে কতবারই না অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। এ হচ্ছে পীঠস্থান, পীঠস্থানের অপমান। মা কি সইবেন মনে করেছিস তোরা? তা ছোটবাবু, কিচ্ছু ভাববেন না আপনি। সময় যখন আর নেই, তখন আমিই পূজায় বসছি। ব্রাহ্মণ সন্তান আমি, পূজো করতেও জানি।"

"সে মন্দ নয়," ফকির উত্তর করিল, "যাক ভালোয় ভা[illegible] মার পূজাটা তো হয়ে যাক। কিন্তু কৈ, এদিকে উপনে কামারের[illegible] দেখা নেই। জোড়া পাঁঠা বলি হবে। কোপ দেবে কে? তা ছাড়া পাঁঠা দুটো তো তারই বাড়ীতে রয়েছে। আনলেও না, পাঠিয়েও দিলে না।"

কালীকা মূর্ত্তির লেলিহান জিহ্বা ও উদ্যত খড়্গের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বেণী রায় কি ভাবিতেছিলেন। এইবার তিনি দূরের প্রাঙ্গণের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিলেন। বিশাল হাঁড় কাঠের পাশে বসিয়া কয়েকজন বিদেশী ঢুলি বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল। বেণী রায় চীৎকার করিয়া বলিয়া

উঠলেন, এতো অপমানও সইতে হবে। এতক্ষণ মা'র পূজার কথা ভেবে আমি সবই সহ্য করেছি। কিন্তু আর নয়। জাতি শুদ্ধির এই চক্রান্তের আমি প্রতিশোধ নেবো। নিয়ে আয় আমার লাঠি, আর ঐ কাতান। আমি নিজে যাবো প্রজাদের বাড়ী বাড়ী, তাদের এই অবাধ্যতার শাস্তি দেবো। দরকার হয় তো সারা গাঁয়ে আগুন ধরিয়ে দেবো। ফাঁসী হবে, এই তো? এ জন্ম আমি প্রস্তুত। "না না, না কর্ত্তা," ফকির দুলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "এই জন্যই মা এতক্ষণ করছিলেন, এই জন্যই না তিনি বল্লেন, যা বাবুকে আগলে বসে থাক্।"—"ওঃ তাই নাকি?" বেণী রায় উত্তর করিলেন, "আমি তা'হলে ঘরে বাইরে বন্দী? তা'হলে এর মধ্যে তুইও আছিস্? তোর মা'ও?"

এতো বড় অপবাদ ফকির সহ্য করিতে পারিল না। সে ছুটিয়া আসিয়া বেণী রায়ের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ও কথা আমাকে বলবেন না, কর্ত্তা। আমি আপনার হুকুমের চাকর। হুকুম দেন, দশটা মাথা এক্ষুনি এনে দেবো। আর মার কথা বলছেন? আমাদের মা হচ্ছেন সতীলক্ষ্মী। এখনও দেবীর পূজা হলো না, বলিদানও না। দেখুন গে, অন্দর মহলে গিয়ে; বসে বসে তিনি কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। তা ছাড়া আরও একটা কথা আছে, কর্ত্তা। আমরা লাঠি সোঁটা, বল্লম ও মশাল নিয়ে এক্ষুনি প্রতিশোধ নিতে পারি, পেল্লববাবু তা প্রিত্যিশি করেই বসে আছেন। কিন্তু লাঠি দিয়ে আমাদের এই হামলা কেউ প্রতিরোধ করবে না। তেনাদের দলে আমার নিজের ছেলে মেয়েরাও আছে। তারা ঠিক করেছে আমরা এগুলে, ছেলে বুড়ো মেয়ে মর্দ্দো সকলে তাদের কাঁচা মাথাগুলো এমনিই এগিয়ে দেবে, বিনা প্রতিরোধেই। কিন্তু কিছুতেই তারা আমাদের ওপর অস্ত্র হানবে না; পেল্লববাবু তাদের নির্দ্দেশ দিয়েছেন। আপনি তাদের মা বাপ, এতদিন আপনিই তাদের দেখে এসেছেন। পারবেন তাদের

ওপর হামলা করতে। তারা বলেছে, ছোটবাবুর হাতে তারা মরবে, তবু ছোটবাবুকে পিচাস হতে দেবে না।"

"ওঃ, বুঝেছি," গম্ভীর হইয়া বেণী রায় বলিলেন, "এই সব বুলি আউড়ে তাদের ওপর বশ করেছে। আমারই ভালোর [illegible] তারা তাহ'লে পূজা দেখতে আসে নি। আচ্ছা! নচ্ছার বেটাদের দেখে নেবো আমি। দাস দাসী, ঢুলি ও পাচকদের একুনি কাছারি বাড়ী চলে যেতে বল, খাবার দাবার সব কিছু এমনিই পড়ে থাক এখানে। এই গগনা, যা, তোরাও যা, ওদের ওখানে নিয়ে খাইয়ে দিগে। এই পূজার দালান ও এই মহলে শুধু নরেন ঠাকুর আর আমি থাকবো। দেখি পূজা আর বলি হয় কি'না?"

গগনা উত্তর করিল, "তা হুকুম দেন তো কর্তা, ঐ কামারের পো, আর তার ঐ ছাগলা দুটোকে টাইন্যা নিয়ে আসি। দুটা ছাগলা কি কন? কতো ছাগল রাতারাতি পার কইর‍্যা আনছি না!"

"চুপ কর্।" ধমক দিয়া বেণী রায় বলিল, "যা বলি শুনবি। ওদের নিয়ে পূবের মহলে চলে যা একুনি। ফকির, তুমিও এদের সঙ্গে যাও। না, থাক্, তুমি আর গগনা এখানে থাকো। নরেন ঠাকুর পূজা করুক। আমি ভিতর থেকে আসছি।"

নরেন ঠাকুরের মত এক ব্যক্তি এই বাড়ীর কালী পূজা করিবে? কথাটা গগনা, ফকিরচন্দ্র ও দুর্লভের মনপুতঃ হইল্ না। একটু কিন্তু কিন্তু করিয়া ফকিরচন্দ্র বলিয়া ফেলিল, "ওঁকে আর কেন কষ্ট দেবেন কর্তা? যখন সকল কাযই নিজেদের করতে হলো, তখন মায়ের পূজাটাও না হয় আপনি সেরে ফেলুন। ভিনগাঁ থেকে পুরুত ডেকে আনা যায়, কিন্তু এতো রাত্রে কি তেনারা আসবেন?"

নরেনবাবু দুশ্চরিত্র, নরেনবাবু জোচ্চোর, টাকা দ্বারা তাকে বশীভূত

করা চলে। এইরূপ লোকের সাহায্যে জমিদারী রক্ষা হয়, মামলা জেতা যায়; কিন্তু জাগ্রত গৃহ দেবতার পূজা চলে না। ফকির চন্দ্রের ন্যায় ইহা বেণী রায়ও উপলব্ধি করিয়া ছিলেন। একটু কিন্তু কিন্তু করিয়া বেণী রায় বলিলেন, "তা ঠিক বলেছিস্, ওঁকে আর কষ্ট দেবো না। তা' নরেন খুড়ো তুমি তা'হলে ওঠো, আমিই পূজায় বসছি।"

"কি! এতো ঘেন্না আমাকে!" নরেনবাবু উত্তর করিলেন, "আমি কি তোমার চেয়েও খারাপ লোক। তুমি পূজা করতে পারো, আর আমি পারি না। তা'হলে চললাম আমি। আমিও ওদের সঙ্গে যোগ দেবো।"

নরেনবাবু চলিয়া গেলেন। বেণী রায় একটু হাসিলেন মাত্র, কিন্তু বিব্রত বোধ করিলেন না। নরেনবাবুকে বিদায় দিয়া তিনি পুরোহিতের জন্য রক্ষিত কবায় বস্ত্র পরিধান করিয়া কপালে রক্ত চন্দন দিয়া, পূজার আসনে বসিয়া পড়িলেন।

কতক্ষণ পূজায় তিনি বসিয়াছিলেন তাঁর খেয়াল ছিল না। নিরালা নিস্তব্ধ পুরী, বিরাট পূজার দালানে কালী মূর্ত্তির সম্মুখে তিনি একা। দূরে বাহির দালানে কেবল মাত্র ফকির করযোড়ে বসিয়া রহিয়াছে। বেণী রায় মন্ত্র পড়িলেন, কি পড়িলেন না, তাহা বুঝা গেল না। কিরূপ পদ্ধতিতে পূজা হইল তাহা ফকিরও বুঝে নাই, তবে উহা সনাতন পদ্ধতিতে যে সমাধিত হয় নাই, তাহা সে বুঝিয়াছিল। তাই মনটা তাহার এমনিই কাতর হইয়া উঠিতেছে। গাঁয়ের লোকজন এমন কি তাহার স্বজনদের প্রতিও তাহার এজন্য আক্রোশ হইতেছিল। কিন্তু সে কি করিবে? লাঠি শড়কী লইয়া যদি গাঁয়ের লোকেরা তাহাদের সহিত এইরূপ শত্রুতা করিত, তাহা হইলে নিশ্চয় সে উহার প্রতিশোধ লইত, কারণ সে নিমকের চাকর, কিন্তু এ যে নির্ব্বিরোধ প্রতিরোধ। সমস্ত

গাঁ যেন আঘাত গ্রহণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, আঘাত দিবার জন্য নহে। পেল্লববাবু তার আপন স্ত্রীপুত্রদেরও যাদু করিয়া বশ করিয়া লইয়াছে। এখন সে কাহার সহিত যুঝিবে?

পূজারত বেণী রায় ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মিলিত করিয়া বলিলেন, "ফকির! এই, আছিস তো? শোন, ছাগবলি হবে না, মা তা চান না। তিনি বোধ হয় নরবলিই চান।"

চমকাইয়া উঠিয়া ফকির উত্তর করিল, "এঁ্যা বলেন কি, আজকের দিনে মানুষ খুন করবেন?" "ক্ষতি কি,"—বেণী রায় বলিল,"এই দালানের খিলানের তলায় কতো এমনি নরমুণ্ড ও কঙ্কাল জমা হয়ে রয়েছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এমনি কতো মানুষ খুন করেছে। দেহ গুল্যেকে বাইরে ফেলে দেবারও তারা অবকাশ পায় নি। সেই গুলোকে তাঁরা এই দালানের তলায় রেখে খিলান গেঁথে দিয়েছেন। এমনি একটী খিলান মেরামত করবার সময় ওদের কয়টীর কঙ্কাল আমার নজরে পড়েছিল। তুই তো তা সবই জানিস। পূর্ব্ব পুরুষেরা ছিলেন খুনে, তাঁদের সেই রক্ত কেবল আমার দেহের মধ্যেই টগ বগ করে ফুটে উঠে। তাঁদের যা কিছু মন্দ তা আমি পেয়েছি, আর দাদা পেয়েছেন তাঁদের ভালো গুণ গুলো। তাই তাঁদের মন্দ রক্ত আমার তথা বংশ হতে নিঃশেষে বার করে দেবো। কিন্তু পূজার ব্যাঘাত হতে দেবো না। শুনেছি এই পূজা সুরু হয়েছিল নরহত্যা সহ, নরহত্যা দ্বারাই এই পূজা আমি শেষ করবো। বোস তুই ওখানে, আমি ভিতর থেকে আসছি।

ধীর গম্ভীর পদবিক্ষেপে বেণী রায় অন্দর মহলের দিকে চলিয়া গেলেন।

অন্দর মহলও এই সময় জন-শূন্য ছিল। দাস দাসীগণ ইতিমধ্যেই বেণী রায়ের আদেশে বাড়ীর পূব মহলে আশ্রয় লইয়াছে। প্রমাদ গণিয়া

তাহাদের কেহই এই ব্যবস্থায় আপত্তি করে নাই। ইহা ছাড়া তাহাদের জন্য সেইখানে পৃথক ভাবে আহার্য্যেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। কেবলমাত্র বেণী রায়ের সাধ্বী স্ত্রী সারদামণি ভেতর ঘরের প্রশস্ত কক্ষে পূজার নৈবিদ্য সাজাইয়া একাকিনী বসিয়াছিলেন। টপ্ টপ্ করিয়া তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। হঠাৎ তিনি শুনিতে পাইলেন পারুলের গলা। কোন ফাঁকে পারুল যে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহা তিনি টেরও পান নাই।

পারুল নত মস্তকে কাকীমার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, "বড় অন্যায় হয়ে গেল কাকীমা। এ জন্য আমিও সমান অপরাধী।"—"তুই যে এলি, তা এসেছিস্ তো বোস্, কিন্তু কাবটা তোরা ভালো করিসনি।" ক্ষুণ্ণমনে সারদামণি বলিলেন, "হয় তো এর প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এতে তোরা ওঁকে জব্দ করলি না, তোরা জব্দ করলি আমার শ্বশুর কুলকে। অন্ততঃ তোর উচিত ছিল বাধা দেওয়া।"

"কি করব কাকীমা," লজ্জিত হইয়া পারুল উত্তর করিল, "পল্লবদা বললে, 'এ ছাড়া নাকি আর উপায় নাই। আরও কিছু দিন দেরি করলে, আমাদের সাত পুরুষের প্রজাদেরও দেশত্যাগী হতে হতো। কিন্তু কাকীমা, আমি কেন এর মধ্যে থাকলুম? সত্যই অন্যায় হয়েছে, কাকাবাবুকে বলো তিনি যেন আমাকে এজন্য শাস্তি দেন।"

কাকাবাবুর নাম শুনা মাত্র সন্ত্রস্ত হইয়া পারুলকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া সারদামণি বলিল, "না না, কাকাবাবুর কাছে যেতে হবে না। এক্ষুনি হয়তো এসে পড়বে। ও নিজেই পূজোয় বসেছে। তুই ঐ ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে লুকিয়ে পড়। উনি চলে গেলে একটু মার প্রসাদ খেয়ে চোর দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে যাস্, চাকর বাকররা পূব মহল থেকে খেয়ে দেয়ে ফিরলে তাদের একজনকে দিয়ে তোকে

পৌঁছে দেবো'খন। বংশের একমাত্র দুলালী তুই, এসেছিস যখন বাড়ীর পূজার প্রসাদ খেয়ে যাবি। আমরা আর ক'দিন!"

সারদামণির ভয় অমূলক ছিল না। ইতিমধ্যে কখন যে বেণী রায় তাহাদের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন তাহা উভয়ের একজনও দেখিতে পাননি। হঠাৎ পারুলকে সারদামণির বুকের মধ্যে দেখিয়া তাঁহার সমস্ত রাগ পুঞ্জীভূত হইয়া স্ত্রী সারদামণির উপর গিয়া পড়িল। নিকটেই একটী পুরানো ভারী লোহার হামানদিস্তা ছিল। সক্রোধে উহা উঠাইয়া লইয়া তিনি সারদামণির মস্তকের উপর সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। সারদামণি জ্ঞান হারাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। মস্তক বিদীর্ণ হইয়া চাপ চাপ রক্ত মাটিতে গড়াইয়া পড়িতেছিল। সারদামণির দেহ মাত্র অল্পক্ষণের জন্য মৃদু মৃদু নড়িয়া স্থির হইয়া গেল।'

রাত্রি তখন বারটা হইবে। রায়বাড়ীর নিশি পূজার প্রথম বলি এই সময়টাতেই হইয়া থাকে। এইবারও উহার অন্যথা হইল না। তবে সামান্য ছাগের বদলে মূল্যবান মানুষ বলি হইয়াছে, এই যা।

কাকীমাকে এই ভাবে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া পারুল একবার মাত্র আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, কিন্তু পরে আর তাহার মুখ দিয়া কথাও বাহির হইল না। সে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, তার ভয়াতুর দেহটা দেওয়ালের সহিত মিশাইয়া দিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

পারুলের ভয়ার্ত্ত কণ্ঠ ফকিরের কানে পৌঁছাইয়া ছিল, সে তাড়াতাড়ি অন্দর মহলে আসিয়া দেখিল সব শেষ হইয়া গিয়াছে। সে নির্ব্বাক ভাবে বেণী রায়ের দিকে চাহিল, কিন্তু কথা বলিল না। কিন্তু কথা কহিল বেণী রায়, দুই চোখ হইতে আগুন ঠিকরাইতে ঠিকরাইতে বেণী রায় বলিল, "সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, ফকির! এখন তুই কি করবি? এইবার নিশ্চয় তুই আমাকে ত্যাগ করবি।"

"না কর্ত্তা, না, আমি আপনার নেমকের চাকর," ফকির উত্তর করিল, "যা হবার তা হয়ে গিয়েছে, এখন লাস তো সরান।"

বেণী রায় পারুলের প্রতি অগ্নি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তা হলে এই সঙ্গে এটাকেও পাচার করে দে। আমাদের এই রক্ত-পিয়াসী বংশ পৃথিবীতে না রাখাই ভালো। কে বলতে পারে এদের কোনও এক সন্তান আমার চেয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে সারা পৃথিবীর অমঙ্গল সাধন করবে না। আমাদের এই পাপের বংশের আমি ঝাড়ও আর রাখবো না। যাক্, গেছে যখন সবই যাক।"

বেণী রায় দুই হাতের অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া পারুলের কণ্ঠনালী লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। পারুল তখনও পর্য্যন্ত প্রকৃতিস্থ হইতে পারে নাই, সে সভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "কাকীমা!" কিন্তু কাকীমার নিকট হইতে কোনও উত্তরই আসিল না।

এইরূপ একটী ঘটনা যে ঘটিতে পারে তাহা পল্লব যে আশঙ্কা করে নাই তা নয়। এই জন্য পারুলকে সে কিছুতেই এইদিন এই বাড়ীতে আসিতে দিতে চাহে নাই। কিন্তু তাহার উপরোধ অনুরোধ ও কান্নাকে সে এড়াইতে পারে নাই। তবে সারদামণির উপর তাহার আস্থা ছিল। তাই সে পারুলকে তার পৈতৃক ভিটার এই পূজায় যোগ দিতে সম্মতি দিয়াছিল। গাঁয়ের আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে সে বুঝাইয়া রাখিতে পারিলেও তার আপন দয়িতা পারুলকে পারে নাই। কিন্তু এই জন্য সে নিশ্চিন্ত হইতেও পারে। পারুলকে নিশি পূজায় যোগ দিবার জন্য রাত সাড়ে এগারো ঘটিকায় রায় বাড়ীতে পৌছাইয়া দিয়া নিজে সে বাড়ীর বাহিরে লণ্ঠন হাতে পায়চারী করিতেছিল। পারুলের প্রথম আর্ত্তনাদটী তার কানে পৌছাইলে সে স্থির থাকিতে পারিল না। সে তাড়াতাড়ি বাড়ীর সদর দুয়ারে আসিয়া দেখিল কে বা কাহারা ভিতর হইতে উহা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এই কেল্লার ন্যায়

বাড়ীর ভিতর ঢুকিবার অপর কোনও পথ আছে কি'না তাহাও তাহার জানা নাই। পাগলের মত হইয়া সে বাড়ীর দেওয়ালের খড়া বাহিয়া অতিকষ্টে ছাদে উঠিল, তাহার পর ছাদ বাহিয়া দোতালার একটী বারান্দায় আসিয়া সিঁড়ি দিয়া হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া নীচের দরদালানে আসিয়া পথ হারাইয়া ফেলিল। যে দিকে সে যায় সেইদিকেই দেওয়ালে আসিয়া মাথা ঠেকিয়া যায়। চারিদিকে অন্ধকার, মাঝে মাঝে ইঁদুরের গায়ে পা পড়িয়া যায়। আরশুলার দেহে হাত পড়ে। এইখান হইতেই সে পারুলের দ্বিতীয় আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইল—"কাকীমা!" পল্লব এইবার পাগল হইয়া উঠিয়া সম্মুখের একটি বদ্ধ দরজার উপর সজোরে লাথি মারিতে লাগিল। পুরাণো দরজাটি এমনিই ভাঙা ছিল। লাথির ভার সহ্য করিতে না পারিয়া উহা ভাঙিয়া গেল, এবং পল্লবও দরজার পাল্লা দুইটির সহিত হুমড়ী খাইয়া অন্দরের উঠানে আসিয়া পড়িল। উঠান হইতে পল্লব যে দৃশ্য অবলোকন করিল, তাহাতে তাহার দেহ হিম হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আর চুপ করিয়াও থাকা যায় না। সে ছুটিয়া গিয়া পারুলের সম্মুখে আসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "কাকীমা! শীঘ্রি আসুন। কাকাবাবু পারুকে মেরে ফেলছেন।"

"সবই দেখছি মা'র দয়া, জাগ্রত দেবতা তো, দেখলি তো ফকরে," খেঁকরাইয়া উঠিয়া বেণী রায় বলিল, "কেমন তিনি নিজের খাদ্য নিজেই জুগিয়ে নেন। হাঁরে হাঁ! কাকীমার কাছেই তোদের দুটোকে এক সঙ্গে পাঠাবো। জোড়া বলির শেষ বলি হবে রাত্র দুটোয়। দুটোর আর কত বাকী, এ দুটোকে না হয় ঐ সময় পর্য্যন্ত জিইয়েই রাখি।"

বেণী রায়কে হাত নামাইয়া লইতে দেখিয়া, পারুল প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল। উপস্থিত বুদ্ধিও তাহার আসিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল বেণী রায় পাগল হইয়া গিয়াছে। উহার দয়ার উদ্রেক করার চেষ্টা বৃথা। সে

এ'ও বুঝিয়াছিল যে পালানো ভিন্ন আর উপায় নাই। সে সহসা পল্লবের হাত ধরিয়া হেঁচকা টানে পিছাইয়া আনিয়া, উহাকে লইয়া পাশের একটি অন্ধকার কক্ষে ঢুকিয়া পড়িল। বেণী রায় পিছু পিছু ধাওয়া করিবার পূর্ব্বেই তাহারা ঐ ঘর হইতে বাহির হইয়া, অপর আর একটি ঘরের মধ্য দিয়া বাঁকা সিঁড়ির পাশ কাটাইয়া পিছন দিককার ভাঙা পরিত্যক্ত মহলের একটি কক্ষে আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। পারুল শিশুকালে এই বাড়ীতে মানুষ হইয়াছে। এই বাড়ীর অলি গলির সে সন্ধান রাখে। বেণী রায়ের পক্ষেও এইখান হইতে তাহাদের খুঁজিয়া বার করা শক্ত ছিল।

এই ঘরটির পিছনেই ছিল খিড়কীর বাগান। ভাঙা দেওয়ালের মধ্য দিয়া বৃক্ষের শাখা প্রশাখার ফাঁক কাটাইয়া এক ঝলক জ্যোৎস্নার আলোকও তাহাদের চোখে ও মুখের উপর আসিয়া পড়িল। কতক্ষণ তাহারা এইভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। হঠাৎ এইবার তাহারা শুনিতে পাইল, একটা বিকট ক্যাঁ ক্যাঁ আওয়াজ। মনে হইল উহা যেন পাশের অপর একটি কক্ষ হইতে আসিতেছে। সভয়ে পল্লব পারুলরাণীকে জড়াইয়া ধরিল। পল্লবকে অভয় দিয়া পারুল বলিল, "ভয় নেই ও হচ্ছে এ বাড়ীর লক্ষী পেঁচা। ঠাকুমার আমল থেকেই ওখানে আছে।"

পেঁচার আওয়াজ শুনিয়া অপর আর একটি জীব ঘরের মধ্যে শনৈঃ শনৈঃ ঢুকিয়া পড়িতেছিল। সভয়ে পল্লব জ্যোৎস্নার আলোকে চাহিয়া দেখিল সপ্ত হস্ত পরিমিত একটি বিরাট গখুরা সাপ তাহার সাদা দেহটা টানিয়া টানিয়া নীরবে মেঝে বহিয়া তাহাদের পাশ ঘেঁসিয়া চলিতে শুরু করিয়াছে। পল্লব অজ্ঞান হইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল। পারুল পুনরায় তাহাকে অভয় দিয়া বলিল, "কিছু ভয় নেই। ও হচ্ছে এ বাড়ীর বাস্তু সাপ। তিন পুরুষ ধরে এ বাড়ীতে

আছে। তুমি যখন আমার সঙ্গে আছো। ও তোমাকে কিছু বলবে না।"

পল্লবের কিন্তু একথা বিশ্বাস হয় নাই। কিন্তু সত্য সত্যই সাপটাকে তাহাদের কিছু না বলিয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। কিন্তু তাহা সত্বেও সে ঐ স্থানে আর থাকিতে চাহিল না। পারুল তাহাকে টানিয়া টানিয়া কক্ষের পর কক্ষ ভেদ করিয়া নীচের একটি চোর কুঠরির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকার কক্ষ। দেওয়ালের যেখানেই তারা হাত দেয় বালি খসিয়া পড়ে। দম তাহাদের বন্ধ হইয়া আসিতেছে। হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তাহারা একটি গলির পথ আবিষ্কার করিল। তার পর তাহারা অন্ধকারের বুক চিরিয়া ঐ গলি-পথ হইতে বাহির হইয়া পরিশেষে পূজা বাড়ীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া হঠাৎ তাহারা লক্ষ্য করিল উঠানের মধ্যস্থলে প্রোথিত বিরাট হাঁড়কাঠের নিকট উভয়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্মুখেই বিরাট খিলান সংযুক্ত পূজার দালান। ভিতরের আলোগুলি ইতিমধ্যেই নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। কালীমূর্ত্তি ছাড়া সেখানে কোনও মূর্ত্তি বা মানুষ নেই।

সদর দরজা দিয়া তাহারা বাহির হইয়া আসিতে চাহিল। কিন্তু পা আর তাহাদের উঠিল না। সভয়ে তাহারা লক্ষ্য করিল পূজার দালানের সমুচ্চ ভিতের একটি খিলান ফকির সাবলের সাহায্যে ভাঙিয়া ফেলিতেছে। এবং ইষ্টক অপসারণের সহিত সেই খিলানের পিছনে বাহির হইয়া পড়িতেছে বিরাট একটি গহ্বর।

পূজার দালানের মেঝের তলাটা ছিল আগাগোড়া ফাঁপা। ভিতরে ই একটি প্রশস্ত কক্ষও হয়তো থাকিবে। কিন্তু দুই পুরুষ পূর্ব্বে নিম্নের খিলানগুলি ইঁট গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এতোদিন রে গোপনে ঐ দুয়ারগুলি উন্মুক্ত করিবার কারণ পল্লব না বুঝিলেও

পারুল বুঝিয়াছিল। এই সম্বন্ধে সে তাহার পিতার মুখে বহু গল্প শুনিয়াছে। পিতৃপুরুষদের এই সকল কীর্তিকলাপ তাহার কোনও দিন ভালো লাগে নি।

তাহারা সভয়ে পিছাইয়া যাইতেছিল এমন সময় তাহাদের লক্ষ্য পড়িল বেণী রায়ের দিকে। নিকটে একস্থানে বসিয়া লণ্ঠনের আলোর সাহায্যে তিনি তাঁহার মৃত স্ত্রীর পদযুগলে সযত্নে আলতা পরাইতেছিলেন। পারুল ক্ষণিকের জন্য নিজের এবং পল্লবের সম্ভাব্য-বিপদের কথা ভুলিয়া গেল। সে পিছাইয়া গেল না, আগাইতেও পারিল না।

একটী নূতন মাদুরের উপর বিগতপ্রাণ স্ত্রীকে শুয়াইয়া রাখিয়া বেণী রায় তাহার পায়ে আলতা এবং মাথায় সিঁদুর পরাইয়া দিয়া বলিল, "ককরে, আর দেরী নয়? এটাকে পাচার করে ওদুটোকে টেনে আনতে হবে। এধারের দরজাটা যখন বন্ধ করে দিয়েছিস, তখন ওরা ঐ বেড়া জালের মধ্যে এখনও আবদ্ধ আছে, ওদের আর বেরিয়ে আসতে হচ্ছে না, তবে এর মধ্যে ওদের সাপে না খায়। দাগী মানুষ কি আর তা'হলে মা নেবেন? নে নে, তাড়াতাড়ি সেরে নে।"

বেণী রায়ের পিছনে বসিয়া তাঁহার অপর সাকরেদ গগনা লোটার সরাই ও এক কলস জলের সাহায্যে কুর্নিশ দিয়া বিলাতী মাটীর সহিত বালু মিশাইতেছিল।

মুখ তুলিয়া গগন উত্তর করিল, "কিন্তু মাকে রাতারাতি গঙ্গার দিকে নিয়ে গেলে হতো না।" "চুপ কর," ধমক দিয়া বেণী রায় বলিল, "বেশী কথা কইলে তোকেও আমি খুন করবো।"

ধীরে ধীরে সারদামণির দেহটা মাদুর মুড়িয়া উঠাইয়া লইয়া বেণী রায় ঐ উন্মুক্ত গহ্বরের মধ্যে ছুড়িয়া দিলেন, এবং তাহার পর,

খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে পিছন ফিরিয়া চাহিলেন।

মাত্র এক রশী দূরে পল্লব এবং পারুল, ছাগবলির যূপকাষ্ঠের পিছনে দাঁড়াইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। তাহাদের এইখানে দেখিয়া বেণী রায় হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, "ওরে ও ফকরে, ও গগনা।" এখন তো সব মাটী। যাও এখন ফাঁসী।"

"তবে রে হালার পো," গগন লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "এখানেও জ্বালাতে এয়েছো। ভয় নেই কর্ত্তা, সাক্ষী তো ঐ দুটো। দাঁড়ান, দিচ্ছি এক্ষুণি সাবাড়ে।"

উঠান হইতে একটী পাঁঠা-কাটা কাতান উঠাইয়া লইয়া বেণী রায় বলিলেন, "তোকে কিচ্ছু করতে হবে না। যা করবার তা আমি নিজের হাতেই করবো। আমার প্রতিশ্রুতি জোড়া বলি মাকে আমিই দেবো। তোরা শুধু দুটোকে চেপে ধরে থাক্। আবার না পালায়।"

বেণী রায়ের আদেশ পাওয়া মাত্র ফকির এবং গগনা এক সঙ্গে ছুটিয়া গিয়া পারুল এবং পল্লবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পারুল আর স্থির থাকিতে পারিল না। পল্লবকে পিছনে ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়া সে বেণী রায়কে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কাকাবাবু! তুমি আমাদের রক্ষা করো, কাকাবাবু! আমি তোমার মেয়ে। কাকীমা থাকলে তুমি আমাদের মারতে পারতে? তুমি কি পাগল হয়ে গেছো, কাকাবাবু?"

পারুলের স্নেহস্পর্শে বেণী রায়ের বজ্রমুষ্টি শিথিল হইয়া গেল। তার হাতের ধারালো কাতান সশব্দে মাটীর উপর পড়িয়া গেল।

স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ পারুলের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বেণী রায় বলিলেন, "হুম্, বেশ তোদের ছেড়ে দিলাম। কিন্তু সাবধান, এ সব কথা যেন প্রকাশ না পায়।"

বেণী রায় কাতানখানি ভূমির উপর হইতে উঠাইয়া লইলেন, এবং

তাহার পর আর কাহাকেও কোনও কথা না বলিয়া ঐ গহ্বরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ফকরে, গগনা, আমি চললাম। রাত্রি ছুটো বাজলো। শেষ বলির সময় হয়েছে। শেষ জোড়া বলি মাকে দিচ্ছি, ছুঃখ করিস নি। আমার সম্পত্তির অর্দ্ধেক তোদের, আর অর্দ্ধেক রইল পারু মায়ের। আর পারু, পল্লব শোন, তোমাদের আমি আশীর্ব্বাদ করছি, কিন্তু এক সর্ত্তে, তোমাদের কোনও বংশধর যেন এই ভিটায় ত্রি-রাত্র বাস না করে। হাঁ, আরও একটা কথা, আমি চলে গেলে তোরা এই গহ্বরের ফোঁকর পুনরায় গেঁথে তুলবি, ভোর হবার পূর্ব্বেই।"

বেণী রায়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বেই সকলে লক্ষ্য করিল, বেণী রায় কাতান দিয়া তাঁহার কণ্ঠনলীটি পেঁচাইয়া পেঁচাইয়া কাটিয়া দিয়া মাটীর উপর পড়িয়া গেলেন।

ফকির ও গগনা স্তব্ধ হইয়া তাহাদের প্রভুদেবতার মহাপ্রয়াণ লক্ষ্য করিল, কিন্তু কাঁদিবার সময় পাইল না। প্রভুর শেষ আদেশ রক্ষা করিবার জন্য আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কুনিশের সাহায্যে ইষ্টক ও সিমেণ্ট দিয়া ঐ মহা গহ্বরের ফাঁকটী পুনরায় গাঁথিয়া দিল।

প্রভু এবং প্রভুপত্নীর শেষ কৃত্য সমাপন করিয়া গগনা ও ফকরে দাঁড়াইয়া উঠিল, দেখিল ভোর হইয়া আসিতেছে। প্রভুর উদ্দেশে মাথা নোয়াইয়া প্রণাম জানাইয়া তাহারা বাহির হইয়া আসিতেছিল, এমন সময় পারুল ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের পথ অবরোধ করিয়া বলিল, "ফকির-কাকা, গগনাদা, কোথায় যাচ্ছো তোমরা? তোমরা আমাদের ওখানে চলো।" পল্লব এতক্ষণ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এইরূপ এক অভাবনীয় এবং অচিন্ত্যনীয় ঘটনা ঘটিবে তাহা সে কল্পনাও করে নাই। এইবার সেও কথা বলিল, ফকিরের উদ্দেশে পল্লব বলিল, "হাঁ ফকিরকাকা, তুমি আমাদের ওখানে চলো।"

"না, তা হয় না, ঠাকুর। পারুদি!" ফকির উত্তর করিল, "গগনাকে না হয় নিয়ে যাও। ওর মনটা বড় নরম, এক্ষুণি কাতর হয়ে পড়বে। আমি এ গ্রামে থাকবো না। ছেলে পুলে রইল দেখো। আর পারো তো রোজ সন্ধ্যায় এইখানে একটী প্রদীপ জ্বালাবার বন্দোবস্ত করে দিও।"

নীচের সমাজ

এক

চাষাদের একটি ছোট গ্রাম। গ্রামের শেষে প্রান্তর। মাঝে মাঝে দুই চারিটা বাবলা গাছ। ভেরাণ্ডা গাছের বেড়ার পাশে, বৌচ গাছের ঝোঁপের মধ্যে একটা সরল কাল জামের গাছ। তাহার একটি উচ্চ শাখায় ঋজু ভাবে দাঁড়াইয়া হিরু জাম সংগ্রহ করিয়া নীচে ফেলিয়া দিতেছিল।

থলো থলো কাল জাম সারা জমিটার উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। চাষার মেয়ে ক্ষ্যান্তর আনন্দ দেখে কে। সে লাফাইয়া, ছুটিয়া জাম কোঁচড়ে পুরিতেছিল। হিরু এক একটি করিয়া বাছিয়া বাছিয়া বড় বড় জাম দূরে অদূরে টুপ টাপ করিয়া ফেলিতে ফেলিতে ক্ষ্যান্তর পায়ের তলার শুক পাতার মর্ মর্ শব্দ শুনিতেছিল। তাহার ছুটিয়া যাওয়ার ভঙ্গী, তাহার কিশোরী দেহের রূপ মাধুরী তাহাকে আকুল করিয়া দিতেছিল। হেঁট হইয়া জাম কুড়াইবার সময় কখনও বা তাহার কেশ, কখনও বা তাহার আঁচল, পাশের বৌচের ঝোপের কাঁটায় আটকাইয়া যাইতেছিল। বাম হাতে কোঁচড়-ভরা জাম বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া ডান হাতে, হেলিয়া দুলিয়া, বাঁকিয়া বৌচ বনের কাঁটা ছাড়াইবার চেষ্টা ও তাহার সেই সময়কার সলজ্জ ভাব হিরুর মনে একটা নূতন আবেগ আনিয়া দিতে লাগিল। বৌচের কাঁটায় সহসা আঁচল আটকাইয়া যাওয়ায় টানাটানিতে ক্ষ্যান্তর কখনও স্কন্ধের কিয়দংশ, কখনও বা পৃষ্ঠ অনাবৃত হইয়া পড়িতেছিল। তাহার সেই মসৃণ দেহাবয়ব অনিমেষ নয়নে দেখিতে দেখিতে হিরু কোঁচড় ভরা জাম লইয়া নামিয়া আসিল।

বাম হাতটী সন্তর্পনে বাল্য সাথী ক্ষ্যান্তর স্কন্ধের উপর [illegible] হিরু বলিল, "কিরে, খুসী হয়েছিস ত? আর নিবি ত বল্! পরশু কিন্তু আমি চলে যাব। বাবা লোক পাঠিয়েছেন, বুঝলি? তখন আর জাম পাড়বার লোক পাবি না।"

সেবার অনেক দিনের পর হিরু মাতুলালয়ে আসিয়াছিল। ছেলে-বেলাকার সঙ্গী হিরুদাকে অনেকদিন পরে পাইয়া ক্ষ্যান্তর মন সহজে তাহাকে ছাড়িতে চাহিতেছিল না। সজোরে বার কতক মাথা নাড়িয়া অনুযোগের সুরে সে বলিল, "কেন হিরুদা, তুমি চলে যাবে? এই ত আমরা কতদিন আছি এখানে। আর তুমি মাঝে মাঝে এসে একমাস দুমাস থাকবে, আর চলে যাবে! যাও, আমার ভাল লাগে না।"

ভাল হিরুরও লাগিত না। কিশোরী ক্ষ্যান্তর নির্ম্মল মন কোন বাধা মানে না। নবীনা-প্রবীণাদের কাছে প্রতিবার হিরু চলিয়া যাইলে এমনি ভাবেই দুঃখ প্রকাশ করে। কিন্তু হিরু কিশোর হইলেও ক্ষ্যান্তর চেয়ে সে অনেক বড়। পিতৃগৃহে ফিরিয়া কেন যে মাসাধিক কাল তাহার মন চঞ্চল হইয়া থাকিত তাহা সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। নিজের দুঃখ নিজের মনে রাখিয়া কাহাকেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিত না।

অন্তরের বেদনা চাপিয়া রাখিয়া, জোর করিয়া মুখে একটা হাসির রেখা আনিয়া পরিহাসচ্ছলে হিরু উত্তর করিল, "আরে, এটা যে তোর বাপের বাড়ী। আর আমার হচ্ছে মামার বাড়ীর দেশ। তোর যখন শ্বশুর বাড়ী হবে, তখন এটা তোরও আমার মত মামার বাড়ী হয়ে যাবে। আমি ত মাস দু'মাস থাকি; তুই দু'দিনও এখানে আর থাকতে পাবি না।"

বালিকা-সুলভ চপলতার সহিত "ভেৎ" বলিয়া ক্ষ্যান্ত হিরুর পিঠের

উপর একটা মৃদু মধুর কিল বসাইয়া দিয়া বলিল, "যাও, দুষ্টু কোথাকার। না তো বলবে হিরুদা, ত আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব না, তুমি আমায় কিচ্ছু ভালবাস না হিরুদা!

ক্ষ্যান্তর মুখে 'ভালবাসা' কথাটা শুনিয়া হিরু চমকিয়া উঠিল। তবে কি ক্ষ্যান্ত সব কথা জানে? হিরু জানিত যে, ক্ষ্যান্তর মার ইচ্ছা হিরুর সহিত ক্ষ্যান্তর বিবাহ দেয়। হয় ত বা ক্ষ্যান্তও তাহা শুনিয়া থাকিবে। হিরু চাহিয়া দেখিল, ক্ষ্যান্ত মৃদু মৃদু হাসিতেছে। চারিদিকে কেহ কোথাও নাই। ইচ্ছা হইল, সে ক্ষ্যান্তকে বুকের মধ্যে টানিয়া লয়। কিন্তু তাহার সাহস হইল না। কে জানে, ক্ষ্যান্ত উহা কি ভাবে লইবে।

হয়তো ঐ একদিনের একটা ভুলে সে ক্ষ্যান্তর কাছে অনেক নীচে নামিয়া যাইবে। সে ধীরে ধীরে ক্ষ্যান্তর হাত দুইটি বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, "রাগ করলি ক্ষ্যান্ত? তোর মা কি বলেছেন জানিস?" হিরুর আর সাহসে কুলাইল না, সে ভাবিতেছিল, কি করিয়া কথাটা সমাধা করিবে। এমন সময় ঝোপের ওপার হইতে হাসির রোল তুলিয়া ক্ষ্যান্তর বাল্য সখী ময়না ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "মা বলেছেন যে, দুটিতে বেশ মানাবে। সেই বন্দোবস্তই হচ্ছে। হুঁ হুঁ—আমি সব শুনেছি।"

দুজনের বিবাহের পাকা কথাটা পাড়াময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। ক্ষ্যান্তও তাহা শুনিয়া আসিয়াছে। তবে ছোটবেলা হইতে কথাটা সে এতবার শুনিয়াছে যে সব সময় সে উহা নির্বিকারভাবে লইত। বড় জোর বলিত—"ধ্যেৎ"! বিব্রত হইয়া কি জবাব দিবে ভাবিয়া না পাইয়া রুষ্ট ক্রন্দনের সুরে সে বলিল, "মারবো কিন্তু ময়না। মাকে বলে দেব—ও-মা!"

ময়না একবার হিরু ও একবার ক্ষ্যান্তর দিকে চাহিয়া দুষ্টামীর হাসি

হাসিয়া বলিল, "মা কিরে! এমন জায়গায় তোমাদের এসে আলা জমান হয়েছে যে আমার মত বেহায়া ছাড়া, মা বা আর কে এখানে আসতে পারবে না।" ইহার পর নির্ব্বিকার চিত্তে ময়না ক্ষ্যান্তর কোঁচড় হইতে জাম তুলিয়া পরম নিশ্চিন্তে খাইতে লাগিল হিরু সুবিধা বুঝিয়া সরিয়া পড়িল।

এক সময় হিরুদের জোত ক্ষেত খামার সবই ছিল। কিন্তু আজ তাহাদের কিছুই নাই। তাহার বাপ রাধু মণ্ডলের একখানি মুদিখানা দোকান ও কয়েকটা গরু মাত্র সম্বল। সে অবসর মত বাপের ব্যবসা দেখে ও তিন মাইল হাঁটিয়া পাদ্রীসাহেবদের স্কুলে পড়িয়া আসে। মধ্যে মধ্যে ছুটির সময় তার মাকে লইয়া সে তাহার মামার বাড়ীর দেশ রাজীবপুরে যায়। মামাদের বাড়ীর পাশেই ক্ষ্যান্তদের বাড়ী। দুজনার মধ্যে ছোট বেলা হইতে একটা স্বাভাবিক হৃদ্যতা দেখিয়া সকলেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল যে হিরুর সহিত ক্ষ্যান্তর বিবাহ হইবে। হিরুও শৈশব হইতে উহা একটা অভ্রান্ত সত্য বলিয়াই জানিত। তাহারা গরীব বটে; কিন্তু চাষার ছেলে হইয়াও সে লেখা পড়া শিখিয়াছে। একদিন হয় ত নায়েবী পদে বহাল হইয়া বসিবে। যেমন সবাই ভাবে, তেমনি সেও ভাবিত যে সে ছাড়া ক্ষ্যান্তর উপযুক্ত বর আর কেহ নাই।

মাঠের ধারে একটা গভীর খানার মধ্যে বসিয়া পড়িয়া সামনের কচু বনের কয়েকটা কচু পাতা টানিয়া মাথাটা ঢাকিয়া সে লুকাইয়া ময়না ও ক্ষ্যান্তর কথাবার্ত্তা শুনিতে ছিল; সব কথা সে শুনিতে পাইতেছিল না। একবার শুনিল ক্ষ্যান্ত বলিতেছে, "ছোাং"। আর একবার শুনিল সে বলিতেছে, "না, ভাই আমার বড় লজ্জা করে।" সব কথা শুনিতে না পাইলেও অলক্ষ্যে ক্ষ্যান্তর মুখের এই দুটি কথা তাহাকে আশ্বস্ত করিল।

দুই

জায়গাটা গ্রামের প্রায় মাঝ-বরাবর হইবে। তিন দিক হইতে তিনটি রাস্তা আসিয়া সেখানে মিলিত হইয়াছে। পাশেই একটা সেকেলে বড় পুকুর। সবে পানা তোলা হইয়াছে—বোধ হয় মাছ ধরিবার সুবিধার জন্য। জলের রঙটা তখনও গাঢ় সবুজ দেখা যায়।

পুকুরের গা ঘেঁষিয়া দুই দিকে দুইটা রাস্তা, একটা মাঠের দিকে, অপরটা গ্রামের ভিতর চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার ভাঙ্গন রোধ করিবার জন্য পুকুরের জল হইতে রাস্তার উপর পর্য্যন্ত সারি সারি বাঁশ ও বৈথারীর বেড়া দিয়া বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। রাস্তার অপর পারে একটা ছোট ডোবা, তাহার অর্দ্ধেকটা প্রায়, গ্রামবাসিগণ ছাই ও অন্যান্য গৃহ-আবর্জ্জনা ফেলিয়া বুজাইয়া আনিয়াছে।

তেমাথার পূর্ব্বদিকে একটি পোড়ো জায়গা। গ্রামের লোক জায়গাটাকে শম্ভুর মার বেড় বলিয়া জানে। বুড়া লোকদের মুখে শোনা যায়, সেই কবে কোন পুরাণ দিনে শম্ভুর মা তাহার শম্ভুকে লইয়া সেখানে বাস করিত। জমিটার একদিকে এখনও দুইটা উঁচু মাটির ঢিবা শম্ভুর মার সেই পুরাণ ভিটার অবস্থান জানাইয়া দেয়।

বুড়ারা বলে, ঐখানেই শম্ভুর মা বাস করিত। তাহার বাটীর পোতা হইতেছে ঐ মাটির ঢিবা দুইটা। কোণের বট গাছটা নাকি সে-ই প্রতিষ্ঠা করে।

তাহারা আরও একটি করুণ কাহিনীর কথা বলে। সে নাকি অনেক দিনের কথা। গ্রামের সেই নদীটা তখন শম্ভুর মার ভিটার অনতিদূর দিয়া বহিয়া চলিত। আরও বিপুল ছিল তাহার আয়তন। তাহার গতি ছিল আরও উত্তাল। কেহ সাহস করিয়া তাহা পার হইতে

পারিত না। সাঁতরাইয়া এপার ওপার হওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার।

মায়ের আদুরে ছেলে ছিল এই শম্ভু। অসীম তাহার সাহস। অসুরের বল ছিল তাহার দেহে। শম্ভুর বয়স তখন মাত্র আঠার, কিন্তু তাহার পেশী-বহুল দেহ দেখিয়া সে-যুগের বড় বড় পালোয়ানরাও তাহার সহিত শক্তি-পরীক্ষায় সাহসী হয় নি। নিমন্ত্রণ বাড়ীতে দেড় সের নারিকেল সন্দেশ সে একাই খাইত।

একদিন বর্ষার এক দারুণ দুর্যোগে এই শম্ভু নাকি মায়ের অগোচরে মাত্র তিন সের সন্দেশ খাওয়ানোর বাজীতে রাজী হইয়া এই নদী পার হইতে স্বীকৃত হইল। বিপুল জনতার সামনে শম্ভু নদী পার হইল, কিন্তু তাহার আর ফিরিয়া আসা হইল না। অপর পারে পৌঁছাইয়া সেখানে পনের মিনিট কাল মাত্র জিরান লইয়া, শম্ভু সাঁতরাইয়া আবার গ্রামে ফিরিতেছিল। গ্রামবাসিগণের উল্লাসধ্বনি শুনিতে শুনিতে, শম্ভু নদীর মাঝখান পার হইয়া অনেকদূর পর্য্যন্ত গ্রামের দিকে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর আর তাহাকে দেখা গেল না। লোকে মনে করিয়াছিল যে, শম্ভুর সেই ডুব ইচ্ছাকৃত; কিন্তু শম্ভু আর উঠে নাই।

শম্ভুর মা যথাসময়ে সেই খবর শুনিল। সমস্ত রাত ধরিয়া সে কাঁদিয়াছিল ও সংশ্লিষ্ট পড়শীদের গালি পাড়িয়াছিল। কিন্তু সকালে শম্ভুর মাকে আর কেহ দেখে নাই। হয়ত সেও নদীতে ডুবিয়া মরিয়াছিল।

শতাব্দী প্রায় শেষ হইতে চলিল, শম্ভুর মা ও তাহার শম্ভু গ্রাম হইতে বিদায় লইয়াছে। তাহাদের মাটির ঘর দুইখানি পড়িয়া মাটির স্তূপ হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের নামটা, শুধু ভিটার গুণে, এখনও গ্রামবাসিগণের কাছে সুপরিচিত।

এই ব্রহ্মোত্তর জমির কেহ ওয়ারিশ ছিল না। এখনও পর্য্যন্ত কেহ উহা বাজেয়াপ্ত করে নাই। গ্রামের সেইটুকু ছিল একমাত্র উন্মুক্ত

স্থান। ছেলেরা সেইখানে খেলা করে। ছেলেদের বাপ-খুড়ারাও একদিন সেইখানে খেলিয়াছে।

সেদিনও সেখানে খেলা হইতেছিল, যে সকল ছেলে সেখানে খেলা করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে হিরুও ছিল একজন।

পরিধানে তাদের মালকোচা দেওয়া কাপড়। দুই একজনের গাত্রে ফতুয়া ছিল। কিন্তু অধিকাংশ বালকের গাত্র ছিল নগ্ন। সোল্লাসে চিৎকার করিতে করিতে তাহারা ডাঙ্ গুলি খেলিতেছিল।

ডাঙ্ গুলি একটী নিছক দেশী খেলা, অনেকটা বিলাতী ক্রিকেটের মত। একটা কাঠের ডাঙ্, হাতখানেক লম্বা হইবে ও একটা দুইমুখ ছুঁচলো ছোট কাঠের গুলি, লম্বায় উহা মাত্র ইঞ্চি দুই হইবে, ইহাই ঐ খেলার সরঞ্জাম।

যাহার যখন পালা আসিতেছিল, সে সেইমত ডাঙ্ লইয়া সজোরে গুলি উড়াইতেছিল। অপর সকলে দূর হইতে গুলিটা লুফিয়া, ধরিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছে।

যথাসময়ে হিরুরও পালা আসিল, সে ডাঙ্‌টি মুঠির মধ্যে ধরিয়া গুলিটা মুঠার একপাশে, ডাঙ্ ঘেঁসিয়া, সাবধানে ন্যস্ত করিল। তাহার পর সে গুলিটা উপরে ছুঁড়িয়া দিয়া, সজোরে ডাঙ্ মারিয়া উহা উড়াইয়া দিতে দিতে বলিল, "একে মুঠি, দুই-এ তুলি, তিন-এ ডাঙ্।"

অপর ছেলেরা অবাক হইয়া দেখিল, তীরের মত গুলিটি ছুটিয়া আসিয়া পঞ্চাশ হাত দূরে পড়িতেছে। কেহ কেহ ছুটিয়া আসিয়া আবার উহা কুড়াইয়া আনিতেছিল।

এইরূপ খেলার মধ্যে গুলিটা একবার এমন অদৃশ্য হইয়া গেল যে, আর উহা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সকলেই খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করিল, হিরুও উহা খুঁজিতেছিল। সেগুন কাঠের গুলি সহজে পাওয়া যায় না। খুঁজিয়া উহা বাহির করিতে হইবে।

লোকের আনাচে-কানাচে খোঁজাখুঁজির পর হিরু খুঁজিতে খুঁজিতে একেবারে ক্ষ্যান্তদের বাড়ীর পিছনে আসিয়া হাজির হইল।

যদি বাড়ীর ভিতর পড়িয়া থাকে। হিরু দুই হাতে পাঁচিলের উপর ভর দিয়া একটু উপরে উঠিয়া বাড়ীর ভিতর উঁকি দিতে ছিল।

ক্ষ্যান্ত গোয়াল ঘরের পিছনে একটা ছাগল-শিশুকে আদর করিতে করিতে কাঁটাল পাতা খাওয়াইতেছিল। এই ছাগ-শিশুটি তাহার বড় আদরের ছিল। তাহার সর্ব্বদাই ভয়, গেল বছরের মত এবারেও বুঝি বলিদানের জন্ত এই ছাগ-শিশুটিকেও তাহার পিতা ভট্টাচার্য্য বাড়ীতে বিক্রয় করিয়া দেয়। তাই সুবিধা পাইলেই সে এখানে আসিয়া ইহাকে একটু আদর করিয়া যায়।

হিরুকে পাঁচিলের উপর মুখ তুলিতে দেখিয়া ক্ষ্যান্ত বলিয়া উঠিল, "এই চোর। আমি চৌকিদার ডাকব—ডাকি ?"

হিরু ক্ষ্যান্তকে দেখিয়া, আর নামিয়া না গিয়া পাচিলটার উপর চাপিয়া বসিল। তাহার পর ক্ষ্যান্তর দিকে একটা সতৃষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া বলিল, "কি বল্লি, চোর ! আচ্ছা বেশ, আমি তাহলে চলে যাই। কেমন ?"

ক্ষ্যান্ত হিরুর কথার কোন উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া শুধু সে হিরুর দিকে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ উভয়ে চুপ করিয়া পরস্পরকে দেখিতে লাগিল। কেহ কোন কথা বলিল না। শেষে ক্ষ্যান্ত মুখটা একটু নীচু করিয়া বলিল, "হিরুদা।"

উত্তরে হিরু বলিল, "কিরে, আমাকে কিছু বলবি ! বল্।"

ক্ষ্যান্ত এইবার মুখ তুলিয়া বলিল, "না, কিছু বলব না ! যাও, আড়ী তোমার সঙ্গে। কথা বলব না।"

হিরু পাঁচিলের পাশের একটি পেঁপে গাছ ধরিয়া সড় সড় করি

নীচে নামিয়া আসিল। তাহার পর ক্যান্তর কাঁধ দুইটী একটু নাড়া দিয়া বলিল, "কিরে কথা বলবি না ত'! এ্যাঁ! বলবি না।"

কেহ কোথাও নাই, বাড়ীর এই দিকটায় এই সময় কেহ আসেও না। চারিদিক নিঝুম, সাড়া নাই, শব্দ নাই, এমন একটা নিরালা জায়গা সারা বাড়ীটায় কোথাও ছিল না।

কিশোর হইলেও ক্যান্ত একজন মেয়ে। মেয়েরা তাহাদের স্বভাব-সুলভ বুদ্ধিবৃত্তি ও দৃষ্টিশক্তি দিয়া সহজে মানুষ চিনিতে পারে। শুধু মানুষের স্বভাব নয়, মানুষের ক্ষণিক পরিবর্ত্তনও তাহাদের দৃষ্টিশক্তি এড়াইতে পারে না। সেই জন্য সহজে তাহারা সাবধান হইতে পারে। ঈশ্বর মেয়েদের দুর্ব্বল করিয়া গড়িয়াছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তাহাদের বোধ শক্তি দিয়াছেন, ছেলেদের চেয়ে ঢের বেশী। আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র হয়ত তাহাদের দেন নাই, কিন্তু আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া দিয়াছেন।

ক্যান্ত সহজেই হিরুর মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। তাহার সহজ শান্ত মুখখানি ধীরে ধীরে যেন হিংস্র জন্তুর আকার ধারণ করিতেছে। তাহাকে যেন আর বিশ্বাস করা যায় না। সভয়ে সে দুই পা পিছাইয়া গিয়া বলিল, "তুমি বড় দুষ্টু হিরুদা, যাই আমার একটা কায আছে। মা অনেকক্ষণ করতে বলেছিল। করা হয়নি।"

কথা কয়টী শেষ করিয়া ক্যান্ত চলিয়া যাইবে মনস্থ করিয়াছিল, কিন্তু ততক্ষণে হিরুর মনের ক্ষণিক চাঞ্চল্য অপসারিত হইয়া গিয়াছে। ক্যান্ত তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই তাহা বুঝিতে পারিল।

ক্যান্তর আর চলিয়া যাওয়া হইল না। সে হিরুর আরও কাছে আসিয়া বলিল, "হিরুদা, এই দেখ—"

হিরুকে ক্যান্ত কিছু বলিতে চাহিতেছিল, কিন্তু বলিতে গিয়া

তাহা তাহার মনে আসিল না। কিছু একটা বলাও উচিত। কথাটা শেষ করিতে ত হইবে! অনেক ভাবিয়া ক্ষ্যান্ত বলিল, "সেই মন্ত্রটা আর একবার শিখিয়ে দাও না, হিরুদা! যে মন্ত্র পড়লে গলায় মাছের কাঁটা ফুটলে, সেই কাঁটা নামিয়ে দেওয়া যায়। বাবাঃ, কাল ভাত খেতে খেতে যা একটা কাঁটা গলায় ফুটেছিল; কিছুতেই নামে না। আচ্ছা হিরুদা, সত্যি সত্যি কি মন্ত্রে কায হয়?"

হিরু বলিল, "সময় বিশেষে নিশ্চয়ই হয়। মন্ত্র ত একটা কথার সমষ্টি মাত্র। তোমায় যদি কেউ গাল দেয় ত তুমি নিশ্চয়ই রেগে যাও, কেমন? তেমনি সুখ্যাতি করলে তোমার আনন্দ হয়। তা হলে, সুখ্যাতির কথাগুলি হচ্ছে লোককে আনন্দ দেবার মন্ত্র। আর নিন্দার কথা হচ্ছে লোককে রাগাবার মন্ত্র। তবে মাছের কাঁটার—"

হিরুকে কথাগুলো শেষ করিতে না দিয়া ক্ষ্যান্ত সানন্দে হাততালি দিয়া বলিল, "ঠিক্, হিরুদা। মন্ত্রটা শিখিয়ে দাও আর একবার। দাওনা!"

ক্ষ্যান্তর অনুরোধের ভঙ্গীমায় হিরু বিব্রত হইয়া উঠিল। শেষে নাচার হইয়া ক্ষ্যান্তকে পুনরায় সেই মন্ত্রটা শিখাইয়া দিতে বসিল।

"গাঙ, গুল্ গুল্ ঝিঙের গাছা।
তায় করলে, কুল্যা বাসা॥
ডাল ভাঙ্গে এই মড়াৎ করে।
সরে, গলার কাঁটা, হড়াৎ করে॥"

ক্ষ্যান্ত মনে মনে মন্ত্রটা বার দুই আওড়াইয়া লইল। তাহার পর বলিল, "যাক শেখা হয়ে গেছে। এইবার চল হিরুদা ঐ ঢেঁকি ঘরটায় বসে আমরা গল্প করি।

এই রকম গল্প তাহারা প্রায়ই করিত। গুরুর কাছে শোনা ও বই

থেকে পড়া অনেক তথ্যই ঠিক সময় পাইলে ক্ষ্যান্তকে শুনাইত ও বুঝাইয়া দিত। ঠিকু পড়িয়া যাহা শিখিয়াছিল, ক্ষ্যান্ত শুনিয়া তাহার প্রায় অর্দ্ধেক শিখিয়া ফেলিয়াছে।

কিন্তু আজ যেন ঠিকু কিরূপ একটা অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল। ক্ষ্যান্তর সহিত ঠিকুর বিবাহের পাকা খবর শুনিয়াও ক্ষ্যান্ত যে কি করিয়া তাহার সহিত এত সহজভাবে কথা বলিতে পারিতেছে, তাহা সে অনেক ভাবিয়াও ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই।

ক্ষ্যান্ত কিন্তু নির্ব্বিকার। সে ঠিকুকে টানিয়া আনিয়া দুজনায় ঢেঁকি-ঘরে ঢুকিল। তাহার পর ঢেঁকির উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া তাহারা গল্প আরম্ভ করিল।

দুজনায় বহুক্ষণ নানা কথা হইতেছিল, বেলা যে পড়িয়া আসিতেছে, সেদিকে তাহাদের খেয়াল নাই। এমন সময় ময়না কোথা হইতে ক্ষ্যান্তকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেই ঘরে ঢুকিল। ক্ষ্যান্ত ও ঠিকুকে পাশাপাশি বসিয়া গল্প করিতে দেখিয়া ময়না বলিল, "ওরে বাবারে ঢেঁকি ঘরে দুপুরে ভূত, বাবারে বাবা, আর যেন তর্‌স সইছে না।"

ক্ষ্যান্ত তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া ময়নার মুখ চাপিয়া ধরিল। তাহার পর তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আয় না ভাই। একটুখানি বস না এখানে।"

ময়না একটু দুষ্টামীর চাউনি চাহিয়া লইল। তাহার পর উত্তর করিল, "দাঁড়া একটু ঘুরে আসছি। মাসীমা বললেন, মঙ্গলা গাইটা ফিরেছে কিনা দেখে আসতে। যাই, তাঁকে বলে আসি, মঙ্গলি এখনও আসেনি।"

কথা কয়টা শেষ করিয়া উভয়ের দিকে আর একবার একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হানিয়া, ময়না চলিয়া গেল।

ময়না চলিয়া গেলে, হিরুর যেন আবার সব গোলমাল হইয়া গেল। সে ময়না ও ক্যান্তর কথার ও ব্যবহারের অর্থ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। পরন্তু যেটুকু সে বুঝিল, ভুলই বুঝিল।

ততক্ষণে ক্যান্ত কিছু দূরে মেঝের উপর গিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার কিশোরী দেহের সেই রূপ লাবণ্য হিরু অবাক হইয়া দেখিতেছিল। এই সেই ক্যান্ত, তাহার আবাল্য সাথী; এত সুন্দর সে। দুদিন পরেই ত সে তাহার স্ত্রী হইবে। বাল্যের সাথী হইবে যৌবনের ঘরণী। সে ত তাহারই।

হিরু আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার মাথায় কোথায় কি গোলমাল হইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া ক্যান্তকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল।

ক্যান্ত এ জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। সে হতভম্ব হইয়া বলিল, "একি হিরুদা? তোমার! এই বুঝি মনে ছিল। ছাড়, ছাড় বলছি, আঃ! বলে দেব আমি।"

হিরু বলিল, "কেন ক্যান্ত। আমাদের ত বিয়ে হবেই, এতে দোষ কি। তুই ত আমারই বৌ হবি।"

ক্যান্ত রুদ্ধশ্বাসে বলিয়া উঠিল, "যখন হব, তখন হব, এখনও ত হইনি। তুমি আমায় ছাড়বে কিনা? ছাড় বলছি। আমি চেঁচাব কিন্তু এইবার।"

কিন্তু হিরু [illegible] ক্যান্তকে ছাড়িল না, শুধু হাত দুইটা একটু আলগা করিল মাত্র।

ক্যান্ত কিন্তু চেঁচাইতে পারিল না। প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও যখন সে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিল না, তখন অনুযোগের সহিত বলিল, "পায়ে পড়ি তোমার, সত্যি বলছি, ছেড়ে দাও। আর আমি কক্ষণও তোমার সঙ্গে কথা বলব না, কিন্তু—"

অনুরোধেও কিছু হইল না। হিরু তাহাকে আরও বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, "বিয়ের পরেও কথা বলবি না ত, শোন! কি বলে তখন আমায় ডাকবি বল, হিরুদা না আর কিছু—"

ক্ষ্যান্ত হিরুর কথার কোনও উত্তর দিল না। নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য টানাটানি না করিয়া সে এইবার অঝোরে কাঁদিয়া ফেলিল।

ক্ষ্যান্তকে কাঁদিতে দেখিয়া হিরু প্রকৃতিস্থ হইল। সে তাড়াতাড়ি ক্ষ্যান্তকে ছাড়িয়া দিয়া লজ্জায় যেন মরিয়া যাইতে লাগিল। কাঁদ কাঁদ হইয়া হিরু বলিল, "এ কি, আমি কি করলাম ক্ষ্যান্ত, মাপ কর। মাপ করবি না ত?"

ক্ষ্যান্ত কোনও উত্তর দিল না। সেখান হইতে পলাইয়াও গেল না। শুধু মুখ নীচু করিয়া ঐখানেই দাঁড়াইয়া পায়ের নখ দিয়া মেঝের মাটী খুঁড়িতে লাগিল।

হিরু অনুতাপে দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। ছুটিয়া গিয়া সে ক্ষ্যান্তর পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল, "মাপ কর ক্ষ্যান্ত। আমি বলছি তোকে, কক্ষণ এ রকম আর হবে না। আমায় বিশ্বাস কর।"

ক্ষ্যান্ত তাড়াতাড়ি হিরুকে উঠাইয়া ফেলিল। তাহার পর চোখের জল মুছিয়া বলিল, "যাও, পায়ে হাত দেবে না, ওতে আমার পাপ হবে। আর কক্ষণ হবে না ত? কক্ষণ না! ঠিক? আঁা, ঠিক ত?"

অদূরে ময়নার গলা শুনা গেল। সে ইচ্ছা করিয়াই সাড়া দিতে দিতে আসিতেছিল। ময়নার গলা শুনিয়া হিরু ও ক্ষ্যান্ত স্বাভাবিকভাবে পুনরায় সেই ঢেঁকির উপর গিয়া বসিল।

তিন

চাষার কুটীর। বাঁশ ও বাঁখারীর বেড়া ঘেরা কয় বিঘা জমির উপর চারটী খোড়ো ঘর, একটী নীচু গোয়াল ও একটা ধানের গোলা। মাঝে একটা উঠান। চারিদিক নীচু মেঠে পাচিল দিয়া ঘেরা। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বেড়ার ধারের কলা গাছের পাতাগুলি হইতে তখনও ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছিল। উঠানে বেশ একটু জল জমিয়াছে, একটী ঘর হইতে অপর একটী ঘরে যাইবার জন্য মাঝে মাঝে উঠানের উপর ইঁট পাতা। জায়গায় জায়গায় ছাই ফেলিয়া জল কমাইবার চেষ্টা হইয়াছে।

কারণ, বাড়ীতে নাকি নূতন কাহারা আসিবে। তাই দুই একজন ভাড়াটীয়া মজুর চাষী নালা কাটিয়া জল নিকাশের বন্দোবস্ত করিতেছিল। নিকটের একটা পানা পচা ডোবা হইতে কয়েকটা ব্যাঙ ডাকিয়াই চলিয়াছে। কোণের গোবর গাদাটা বৃষ্টির জলে ধুইয়া বসিয়া পড়িয়াছে। ঐ স্থান হইতে নবজাত একদল পোকা উড়িয়া আসিয়া পরিশ্রান্ত মজুরদের বিরক্ত করিতেছে। তাহারা মাঝে মাঝে গামছা দিয়া পোকা তাড়াইয়া কপালের ঘাম মুছিয়া আবার কোদালী ধরিতেছিল। ক্রন্দনরত ক্ষুদ্ধ কুটীরটীকে যেন জোর করিয়া উৎসবের বেশ পরাইবার একটা চেষ্টা চলিতেছে।

মাটীর পৈঠার উপর ক্ষ্যান্তর মা বসিয়া আছে। উঠানে ভিজা খড়ের গাদার উপর ঠেস দিয়া ক্ষ্যান্তর বাপ দাঁড়াইয়া। কোমরে গামছা, হাতে তাহার একখানি কাস্তে। তাহার বক্ষের বিশাল ছাতি ও পেশী বহুল হস্তের উপর শিরা উপশিরার নীল রেখাগুলি একবার কুঞ্চিত ও একবার প্রসারিত হইতেছিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বেশ একটা বড় রকমের কলহ হইয়া গিয়াছে। সহসা নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ক্ষ্যান্তর বাবা বলিল, "দে,

দে তামুকটা সেজে দে। বামুন বাড়ী একটা বরাত আছে। শীগগীর সেরে আসি।"

চোখের জল মুছিয়া গলাটা একটু নরম করিয়া ক্যান্তর মা বলিল, "আমার কথা আগে শোন। ভিকু আমার সোনার চাঁদ জামাই হবে। চাষার ছেলে হয়ে ভদ্রলোকের মত লেখাপড়া শিখেছে। শুন্‌ছি, শিগ্‌গীর সে কোন এক জমিদারী সেরেস্তায় নায়েবী পদে বহাল হবে। আমি বল্‌ছি, মত করে ফেল। দুটীতে বেশ মানাবে।"

বুঝিয়াও যাহারা বুঝিতে চায় না, তাহাদের বুঝান বড় শক্ত। তাহার উপর সে ভিন্ গাঁয়ের মণ্ডলদের কথা দিয়া ফেলিয়াছে। এখন মেয়ে মানুষের কথা যতই যুক্তিসঙ্গতই হউক না কেন, তাহাদের কথা শুনিয়া অনুমত করা চাষা-সমাজে একটা লজ্জাকর ব্যাপার। গামছা-খানি কোমরে বাঁধিতে বাঁধিতে ক্যান্তর বাপ বলিল, "ওদের মানালেই ত হ'ল না। আবার আমার মানান ত চাই। ভিকুর বাপের আছে কি যে পণ দেবে। দু'টাকা পণ দিতে লারে, ও দু'শ টাকা পণ দিবে কি করে রে? আমার অত বড় সোমত্ত মেয়ে দিমু। চেষ্টা করলে চারশ' টাকা পণে বিক্রী হ'তে পারে।"

পিতৃস্নেহ রূপার মোহে অনেক সময় বাঁধা পড়িলেও মাতৃস্নেহ রূপা দিয়া সব সময় চাপা দেওয়া যায় না। করতল দিয়া বার কতক কপালে আঘাত করিয়া শেষে নাচার হইয়া ক্যান্তর মা অনুযোগ করিয়া বলিল, "ওগো, আমার কথা শোন। বামুন-বাড়ীর মা ঠাকরুণ সব কথা শুনে বলছিলেন যে মোদের ঘরে—"

দেবতা-বামুনদের কথা ক্যান্তর বাপ সব সময়ই মানিয়া চলিত। কিন্তু কয়েক দিন হইল ভট্টাচার্য্য বাড়ীর বাবুরা বাকি খাজনার জন্য নালিশ করিয়াছে, টাকার যোগাড় করিতে না পারিয়া সে অন্তরে জ্বলিতেছিল, তাই চীৎকার করিয়া সে বলিয়া উঠিল, "রেখে দাও; ও

শালা ভদ্রলোকের কথা। চাষাদের উপর দরদ ওদের কত! তেনারা ত বাকী খাজনার নালিশ করেছে ; মেয়ের বিয়ে দিয়ে পণের টাকায় শুধতে হবে না ?"

কি সর্ব্বনাশ, দেবতা লোকদের এ কি শুধায়! মোড়লের মাথা খারাপ হইল না কি! ক্ষ্যান্তর মা একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, এমন সময় জ্ঞাতি ভাই, নিতাই চাষা দরজার আগোড় কিছু ফাঁক করিয়া মাথা ঢুকাইয়া বলিল, "ও মোড়লের পো, বাইরে যে তারা এসে পড়েছে ; মেয়েটা দেখিয়ে দাও।" নিতাই চাষাকে দেখিয়া ঘোম্‌টা টানিয়া একটী মাত্র চক্ষু ঘোমটার আড়ালে বাহির করিয়া ক্ষ্যান্তর মা উঠানের মধ্যকার ধানের গোলার পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

ক্ষ্যান্তর বাপ বিশেষ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "এ্যাঃ, তেনারা এসে গেছে। চল চল সব ঠিক করে ফেলি।" ক্ষ্যান্তর বাপ ত্বরিতপদে নিতাই চাষার সহিত বাহির হইয়া আসিয়া ঢেঁকি ঘরের পিছনে দাওয়ার উপর একটা মাদুর পাতিয়া ফেলিল। তাঁহার পর ঘরে ঢুকিয়া তাড়াতাড়ি গামছা ও হাতের কাস্তেখানি চৌকির উপর ফেলিয়া একটা ফতুয়া টানিয়া গায়ে দিল ও তাঁকের উপর হইতে পুরাণ জুতা জোড়াটী লইয়া পায়ে দিয়া আগন্তুকদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য রাস্তার দিকে চলিয়া গেল।

ক্ষ্যান্তর মা একবার মাত্র বলিল, "অনামুখ মিনষে, পয়সার লোভে মেয়েটাকে একটা গেঁজেলের হাতে দিবি—" আর বলা হইল না। দুই তিনবার ধমক খাইয়া সে চুপ করিল। তাহার পর আগন্তুকদের জল খাবারের জন্য গুড়ের পাটালি ও নারিকেলের বন্দোবস্ত করিতে বসিল, বিসর্জ্জনের সময় যেমন করিয়া লোকে প্রতিমার জন্য শেষ নৈবেদ্য সাজায়।

"এঁজ্ঞে আস্তাজ হয়েন" প্রভৃতি অভ্যর্থনা সূচক ধ্বনির মধ্যে কনে দেখা শেষ হইল। মা ছাড়া ক্ষ্যান্তর দুঃখ আর কেহ বুঝিল না। ক্ষ্যান্ত মায়ের

কাঁধের উপর হাত রাখিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। কি এক অজানা ভয়ে সে শিহরিয়া উঠিতেছিল। তাহার পর শিশুর ন্যায় মায়ের কোলে ঘুমাইয়া পড়িল। পৃথিবীতে মা ও মেয়ে, দুই জনে দুই জনের ব্যথা বুঝে। কিন্তু দুইজনেই অসহায়। তাহারা পুরুষ ও পুরুষ-গঠিত সমাজের খেয়াল-চালিত পুত্তলিকা মাত্র, তাহারা অপরের আত্মতৃপ্তির মূক প্রসাধন ব্যতীত আর কিছুই নয়। সহ্য করিবার জন্য উহারা জন্মিয়াছে। আঘাতের পর আঘাত সহ্য করিয়া তাহাদের বাঁচিতে হইবে। যাহারা পারিবে তাহারাই হইবে সমাজের আদর্শ নারী, সতী, সাধ্বী, সীতা ও সাবিত্রী।

মেটে পাঁচিলের ওপারে বাহিরের দিকে একটা উঁচু দাওয়া ও তাহার উপরে একটা পাতলা খড়ের ছাউনি ছিল। গোটা দুই পিঁড়ি ও একটা মাদুরের উপর, সেইখানে আগন্তুকরা আসিয়া বসিয়াছিল। কনে দেখা ও জলযোগাদির পর নাটোরের রাজা হইতে নওগাঁর বাবুদের পুরাণ লাঠিয়াল ভীমা বাগ্দির কাহিনী পর্য্যন্ত সেইখানে আলোচিত হইতে লাগিল; সাতক্ষীরের মাটি ও টাকির লাঠি, এই প্রবাদের অর্থ কি? নওগাঁর বাবুদের দানের পরিমাণ কত, কবে কাহার পূর্ব্বপুরুষ ঢেঁকি ঘুরাইয়া ডাকাত তাড়াইয়াছিল, এবার কাহার কত আড়ি ধান হইল, এমনি নানা জটীল প্রশ্নের সমাধানের মধ্যে চারিশত টাকা পণে ভিনগাঁর মণ্ডলের পো বাদলের সহিত ক্ষ্যান্তর বিবাহ ঠিক হইয়া গেল।

চার

বিবাহ বাসরের অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটী নাই। বাবুদের বাড়ী হইতে ত্রিপল আনিয়া কাঁচা বাঁশের খুঁটির সাহায্যে সমস্ত উঠানের উপরটা ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। গোটা ছয় সাত লণ্ঠনও আসিয়াছে। ভিতরকার দাওয়াগুলির উপর ছেঁড়া মাদুর পাতা। তাহার উপর ছোট বড়

মেয়েদের ভিড়। নাকে তাহাদের বড় বড় নোলক দুলিতেছিল। কাহারও কাহারও নাকে নত দেখা যায়। তাহাদের পায়ের ঝুমকো মল মাঝে মাঝে বাজিয়া উঠিতেছে। সকলেরই মুখে হাসি। কেবলমাত্র যাহার জন্য এ গ্রামে এই অনুষ্ঠান তাহার মুখেই হাসি নাই। ধীরে ধীরে উঠানে পাতা ছেঁড়া মাদুরগুলির উপর গ্রামের মাতব্বর ও চাষীরা আসিয়া ভিড় জমাইল। দুই একজন ভদ্রলোকও বিবাহ দেখিতে আসিয়াছেন। তাহাদের জন্য উঠানে টুল ও মোড়া পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে; কয়েকটা ছোট ছোট ছেলে, গলায় তাদের বড় বড় ত্রিকোণ, চৌকা ও গোল মাদুলি; কোমরে লাল ঘুনসি বাঁধা, সারা উঠানটায় তাহারা ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে।

অনেক রাত্রে বর ও কনেকে আনাইয়া উঠানের এক জায়গায় বসান হইল। লাল চেলির মধ্যে জড় সড় হইয়া থাকিয়া কোন রকমে ক্ষান্ত চোখ তুলিয়া সম্মুখের সেই অপরিচিত কৃষ্ণ মূর্তির প্রতি একবার চাহিয়া দেখিল ও তাহার পর চোখ বুজিল।

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে হিরুও ছিল একজন। প্রথমে সে ভাবিয়াছিল আসিবে না, পরে কি ভাবিয়া সেও আসিয়াছিল। বিবাহ-বাসরে ক্ষান্তকে শেষ দেখা দেখিবার বাসনা সে ছাড়িতে পারে নাই। সে মনস্থ করিয়াছিল, যেমন করিয়াই হউক শুধু-ক্ষান্তর মঙ্গলের জন্য সে ক্ষান্তকে ভুলিবে। খাটাখাটুনি, দৌড়াদৌড়ির মধ্যে সকলের মত সেও সমান ভাবে যোগ দিল। কিন্তু বার বার চেষ্টা করিয়াও সে ক্ষান্তর সম্মুখে আসিতে পারিল না। দেখিতে আসিয়াও তাহার দেখা হইল না। দূর হইতে সে মঙ্গল শঙ্খের শব্দ শুনিল। দূর হইতে সে বুঝিল যে তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল।

চাষাদের মধ্যে যেমন হয়, বহু বাদানুবাদের পর ভোর পাঁচটায় বিবাহ শেষ হইয়া গেল। পরিবেশনাদি কার্য্য শেষ করিয়া, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে

হেলিয়া পড়া একটা সজনে গাছের উপর দেহটা এলাইয়া দিয়া ভোরের আলোয় হিরু লক্ষ্য করিল, বাল্য সখী ময়নার স্কন্ধে ভর দিয়া কম্পিত কলেবরে ক্যান্ত ঘরে উঠিতেছে। পিছনে পিছনে আসিতেছে বাদল। অনেকক্ষণ এইভাবে হিরু দাঁড়াইয়া রহিল।

খানিকটা রৌদ্র তাহার চোখে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সেদিকে তাহার খেয়াল নাই, হঠাৎ সে শুনিল ময়না ডাকিতেছে, "শোনো, সই ডাকছে।"

হিরু কথা বলিতে পারিল না। শুধু তাহার মুখ দিয়া অস্ফুট শব্দ বাহির হইল, "আমাকে? কেন?"

"তা বাপু জানি না, বল্লে হিরুদাকে একবার ডেকে আন। এসো না!" বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া ময়না অনেকবার টানিল। কিন্তু হিরু নড়িল না। তখন ময়না আবার বলিল, "ওগো মাসীমা ডাকছে, চল না।" "ওঃ মাসীমা ডাকছে? ক্যান্ত নয়!" কথাটা কতকটা যেন হিরুর বিশ্বাস হইল।

"চল যাই।" বলিয়া নিশ্চল পুতুলের মত হিরু ভিতরের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

বেলা হইয়াছে, নব দম্পতি এতক্ষণে প্রথামত, জমিদার সীতারাম ভট্টাচার্য্যের পায়ে নগদ চারিটা টাকা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

হিরুকে দেখিয়া ক্যান্তর মা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "বাবা হিরু, বাপ আমার, এদের আশীর্ব্বাদ কর বাপ।"

হিরুর চোখে জল আসিল, কিন্তু হাত উঠিল না। ঘোমটার আড়ালে ক্যান্তর মুখ দেখা গেল না। পাল্কি আসিয়া পড়িয়াছে। বর পক্ষ বার বার তাড়া দিতেছে। সমবেত হাসি কান্নার মধ্যে বর-কনে পাল্কিতে উঠিল। হিরু ক্যান্তকে কিছু বলিল না। শুধু বাদলের হাতটা ধরিয়া নাড়া দিয়া, অতি কষ্টে মুখে প্রীতির ভাব আনিয়া বলিল, "আচ্ছা সাঙাৎ,

আবার দেখা হবে, কেমন ?” আরও কয়টা কথা হিরু বলিতে যাইতেছিল ; হঠাৎ পাড়ার মনসা যাত্রার দলের জন ছয় সাত ছোকরা আসিয়া একেবারে পাল্কির সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। বাবরি কাটা তাদের চুল। হাতে খেঁটে লাঠি। বাদলকে লক্ষ্য করিয়া [illegible] বলিল, “বাপু বারোয়ারী চাঁদা না দিয়া আর আগুনো হচ্ছে না। রাস্তা শিয়ালকাঁটা দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছি। চার টাকার কম কখনও তা উঠবে না।”

বর পক্ষীয়েরা পিছনে এক খানা গরুর গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিল ; ব্যাপার বুঝিয়া তাহারা নামিয়া আসিল ; দুই পক্ষে অনেক বাদানুবাদ চলিল। হিরুর আর ভাল লাগিতেছিল না। সে ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া, রায়েদের দীঘির পাড়ের নীচে বসিয়া সুখোয়ে কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

‘হুকুম হুকুম হুম্, সাড়া ভারি হুম্’, শব্দে পাল্কিবাহিরা ছুটিয়া চলিয়াছে। ছেলে মেয়েরা খানিকটা পিছন পিছন ছুটিয়া চলিয়া পরে পিছাইয়া পড়িল। মা ও প্রতিবেশিনী মেয়েদের চোখের জলের সহিত ক্ষ্যান্তও অনেক চোখের জল ফেলিল। সকলে বুঝিল, এ সময়ে যেমন সকলে কাঁদে, ক্ষ্যান্তও বুঝি তেমনি কাঁদিতেছে।

বোসেদের থাম-খিলান ওয়ালা পোড়োবাড়ীর পাশ দিয়া রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপ পিছনে ফেলিয়া দলে দলে গ্রাম্য লোকের চোখের সম্মুখ দিয়া, বাসের বাগানের ধারে রাস্তার বাঁকে আসিয়া পাল্কি গ্রাম ছাড়িল। গ্রাম ছাড়িয়া মাঠের পথে আসার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষ্যান্তর বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। সে যেন এক নিরালা মরুর দেশে আসিয়া পড়িয়াছে, পাল্কির মধ্যে অচেনা বাদলকে তাহার মনে হইল, যেন সে একটা রূপকথার দৈত্য। তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে।

দুই ধারে আল বাঁধা ধানের ক্ষেত। চাষারা হাঁটু-জলে দাঁড়াইয়া ধানের বীজ পুঁতিতেছে। মধ্যে উঁচু নীচু রাস্তা। রায়েদের দীঘির শে.

উঁচু পাড়টার উপর হিরু বসিয়াছিল সেখান হইতে মাঠের পথ স্পষ্ট দেখা যায়। হিরু দেখিল—হুম্ হুম্ শব্দে পাল্কিবাহিরা মাঠের পথ ধরিয়া চলিয়াছে। ধীরে ধীরে পাল্কি ছোট হইয়া আসিল। বিস্তীর্ণ মাঠ পার হইয়া, ক্ষীণ শ্যামল বৃক্ষাদির রেখার মধ্যে দিকচক্রবালের পরপারে পাল্কি বিলীন হইয়া গেল। হিরু চক্ষু বুজিয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িল।

পাঁচ

সব শেষ করিয়া হিরু পাদ্রিদের স্কুলে ফিরিয়াছে। বিশ বিঘা জমির উপর খানকতক ঘর। একটা পুকুরের পাড় ঘিরিয়া ঘরগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। চারিদিকে কাঁটাতারের বেড়া। ধারে ধারে ক্রোটন গাছ, কাঁকর দেওয়া রাস্তা, বেশ পরিষ্কার।

পানা পুকুর, পচা ডোবা, আশ্‌শেওড়া ও কচুবন বোঝাই উঠান, পড়ো বাড়ী, গোয়াল ধোয়া গোবর, জল-জমা খানার ধার দিয়া আসিয়া পাদ্রিদের এই রমণীয় উদ্যান বাটীর সামনে আসিয়া পথিক মাত্রেরই একবার সম্ভ্রমের সহিত দাঁড়াইতে ইচ্ছা করে। নিরালায় একটা পাথরের উপর বসিয়া হিরু ভাবিতেছিল। পাদ্রিসাহেব ধূলা মাখা গ্রাম্য ছেলেদের লজেঞ্জস্ ও বিস্কুট বিতরণে ব্যস্ত। হিরুর কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। সে অনেক কথাই ভাবিতেছিল। সেই ছোট-বেলাকার কথা। কেমন করিয়া সে ক্যান্তর সহিত নুন দিয়া আম খাইত। কবে ঝড়ের দিনে ছুটিয়া আম কুড়াইবার সময় পড়িয়া তাহার হাঁটু ভাঙিয়াছিল। ক্যান্ত নিজের কাপড় ছিঁড়িয়া তাহার হাঁটু বাঁধিয়া দেয়। একবার ছুরি দিয়া হাত কাটিয়া গেলে ক্যান্ত কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। ক্যান্তর পুতুলের সহিত ময়নার পুতুলের বিবাহে তাহার কাঠের গাড়ী তৈয়ারী করিয়া ক্যান্তর পক্ষ হইতে ময়নার বাড়ীতে বর বউ

সমেত গাড়ী টানিয়া আনা, কেনেস্তারা বাজাইয়া বিয়ের বাজনার বন্দোবস্ত করা—

খেজুর গাছে উঠিয়া চুরি করিয়া, ফাঁপা পাঁকাটীর সাহায্যে মাঠ হইতে কবে সে সঁধজের রস চুরি করিয়া খাইয়াছিল! শিউলিরা সেই রসে ধুতরা দিয়াছিল। রস খাইয়া সে অসুস্থ হইয়া পড়ে। কেমন করিয়া ক্ষ্যান্ত বকুনি দিতে দিতে তাহার সেবা করিয়াছিল। তাহার দোষ নিজের ঘাড়ে লইয়া কতবার সে পাঠশালার গুরুর কাছে মার খাইয়াছে। বিনা দোষে সে ক্ষ্যান্তকে মারিয়াছে, ক্ষ্যান্ত রাগিয়া চলিয়া গিয়া, পরে আবার ঘুরিয়া আসিয়া বলিয়াছে, হিরুদা, আমাকে মাপ কর।

মাতুলালয়ে থাকিবার কালীন সেই সব স্মৃতি-বিজড়িত এক একটী দৃশ্য তাহার চোখের সামনে ছবির মত ভাসিয়া উঠিতে থাকে। আরও পুরাণ দিনের কথা। হিরু কালীগুরুর জন্য পাঠশালায় তামাক সাজিত। ক্ষ্যান্ত গুরুর মাথার পাকা চুল তুলিত, তাই একদিন খুসী হইয়া গুরুমহাশয় বলিয়াছিলেন—দেখ, দুজনার এই, ই'রে! এই বিয়ে দিয়ে দেব। সেইদিন হইতে কতবার কতজনার মুখে তাহারা সেই একই কথা শুনিয়া আসিয়াছে। চোখ দিয়া তাহার জল গড়াইয়া পড়িতেছিল, সহসা এক খুব পরিচিত ধ্বনি কানে আসিয়া তাহার চিন্তা থামাইয়া দিল। সুন্দর ও সুস্পষ্ট সুরে কে গাহিতে ছিল—

আপন বলিস তুই যাহারে,
সে কিরে তোর দিল বিচারে—
শুল বদনে ফুঙ্কসে ভুলে—
থাকিস নারে ভাই"
নইলে তখন মরবি কেঁদে
দেখবি সময় নাই।
থাকতে সময় ভাবরে সদা ভাই।

যে গাহিতেছিল, সে বাউলদা। হিরুর বাল্য বন্ধু। ছেলেবেলা হইতে বিনা বেতনে তাহারা মিশনারী স্কুলে পড়িত। একই প্রদীপে এর ওর পুরাণ বই চাহিয়া আনিয়া পড়াশুনা করিত। গ্রামের তল্লাটে ইংরাজী জানা লোকে ছিল না। তাই কাদা ভাঙিয়া দুই মাইল দূরে নবাবপুরের হরি মিত্রের বাড়ী গিয়া পড়া বুঝিত কখনও বা রাত্রে পাদ্রি সাহেবের বাঙলোয় গিয়া পড়িয়া আসিত। বাউল ছিল পাদ্রি সাহেবের প্রিয় ছাত্র। তাহার বাইবেল পাঠ ও খৃষ্ট ভক্তি দেখিয়া সকলে ভাবিয়াছিল যে সে খৃষ্টান হইয়া যাইবে। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীতে উঠার পর হঠাৎ একদিন সে বৈরাগী হইয়া সরিয়া পড়িল। অনেকদিন তাহার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। কেহ বলিত সে চাঁদপুরে মিশনারীর কাজ করিতেছে। আবার কেহ বলিত সে হিন্দু সাধকরূপে হিমালয়ে বিরাজ করিতেছে।

সহজসুলভ আলাপী লোক ছাড়িয়া দিলে বন্ধু বলিতে হিরুর বাউলদাকে মনে পড়িত। বহুদূর হইতে বর্ষার দিনেও তাহারা জামা-জুতা খুলিয়া এক হাঁটু কাদা ভাঙিয়া এই স্কুলে আসিত। বাল্যবন্ধুর সুধাসুর সহসা একতারার ঝঙ্কারে কানে বাজিয়া উঠায় হিরু চমকাইয়া উঠিল। বহু দাঁড়াইয়া উঠিয়া নির্ব্বাক ভাবে সেই সুরের পথে চাহিয়া রহিল। বহু দিন পর গৈরিক বসন পরিহিত বাউলদাকে সম্মুখে দেখিয়া সে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। যেন তাহার অন্তরাত্মা এতক্ষণ ইহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

মিশনারীদের বাগিচায় ইটের পাঁজার ধারে খোঁদা নীচু মাটী। মাঝখানে পোড়া ইটের স্তূপ। একটা ইষ্টকস্তূপের উপর বসিয়া দুই বন্ধুতে কথা হইতেছিল। মনের ব্যথা প্রিয়জনের কাছে বলিতে পারিলে মন হাল্কা হয়। দরদী বন্ধু বাউলকে অযাচিত ভাবে পাইয়া হিরু সব কথা তাহাকে বলিয়া যাইতে লাগিল। হিরু বলিতেছিল—

ভাই! সে চলে গেছে। যাবার সময় আমার অন্তরের সবটুকু আলো সে নিয়ে গেছে। পয়সার মোহে মোড়লের পো তিন গাঁয়ে মেয়ের বিয়ে দিলে। বুঝলে না, আমি যত তাকে ভালবাসি তার চেয়ে সে আমাকে ঢের বেশী ভালবাসে। প্রাণ, ভালবাসা, সততা, কিছুরই মূল্য কি জগতে নেই? আছে শুধু টাকার মোহ!

বাউলদা হাসিয়া উত্তর করিল, আচ্ছা হিরু, তুমি সত্যই তাকে ভালবাস?

হিরু আকুল হইয়া বলিল, আমি তাকে ভালবাসি, ভালবাসি বলেই আমি তার সঙ্গে দেখা করব না। কারণ দেখা করা উচিত নয়। তাতে তার ক্ষতি হতে পারে। আমি তাকে ভুলে যাব। ঈশ্বরের কাছে আকুল প্রার্থনা, সে যেন তার স্বামীকে ভালবাসতে শেখে, আমায় ভুলে যায়।

বাউলদা আবার একবার হাসিল; তাহার পর বলিল, আচ্ছা হিরু! তুমি বলতে পার, তুমি কি চাও?

হিরু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, পারি।

বাউল বলিল, আচ্ছা বল ত?

হিরু বলিতে যাইতেছিল, ভুলতে, কিন্তু এই ছোট একটা কথা তাহার মুখে আটকাইয়া গেল। হিরু চুপ করিয়া রহিল। কি বলিবে সে নিজেই জানে না।

বাউলদা বলিল, দেখছ ত হিরু, তুমি কি চাও তা তুমি নিজেই জান না। তুমি একটা জিনিস জোর করে চাও। আর তোমার অন্তর চায় আর একটা জিনিস। এতেই বুঝতে পারছ, মানুষের ক্ষমতা কতটুকু। ভয় নাই, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। যাঁর করবার তিনি এসে সব ঠিক করে দেবেন। তুমি শুধু শক্ত হয়ে তাঁর আসন ঠিক করে রাখ।

হিরু বাউলদার কথা বুঝিতে না পারিয়া বলিল, কি বলছ বাউলদা, ভগবান ঠিক করে দেবেন! মানুষের এই তুচ্ছ পাপ পুণ্যের ভিতর তিনি এসে দাঁড়াবেন? আর ভগবান, তিনি যে আছেন এমন প্রমাণ ত' আমি জীবনে পাই নাই!

বাউল হাসিয়া উত্তর করিল, ভাই, পাপ পুণ্য মনের বিকার। কোনটা পাপ আর কোনটা যথার্থ পুণ্য তাহার সঠিক ধারণা আমাদের নেই। একদিন আমি সবচেয়ে বড় নাস্তিক ছিলাম। আজ আমি বড় আস্তিক। লোকে নাস্তিক হয়, কারণ তাদের মন ঈশ্বরকে খুঁজতে যায় মনের বাহিরে। তুমি যদি বাহির ও অন্তরের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে পার ত তুমি হয়ে যাবে সোঽহং। সব কাজ তোমার সহজ হয়ে যাবে।

হিরু বুঝিয়াও বুঝিল না। অন্তর যাহার বেদনাতুর, মন যাহার পরকীয়া চিন্তায় ভরপুর, দর্শন তাহার কাছে অমূলক। হিরু উত্তর করিল, হতে পারে তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু পরের স্ত্রী কাউকে মনে রাখা কি পাপ নয়? পরিবর্ত্তনশীল সমাজ হয়ত একদিন ক্ষমা করবে। সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা ধর্ম্মও হয় ত তা একদিন মেনে নেবে। কিন্তু যে সোঽহং তার অন্তরাত্মা তাতে কি সায় দেবে?

সস্নেহে হিরুর পিঠে হাত বুলাইয়া বাউল বলিল, অন্তরাত্মা সংস্কারমুক্ত হ'লে সত্যকে মেনে নেবেই নেবে।

হিরু উত্তেজিত হইয়া বলিল, তোমার দর্শন বুঝলাম না ভাই। বাড়ীতে আমি যাবো না। সংসারে আমার কোন লোভ নেই। এ মহাপাপ হতে আমায় রক্ষা কর। তাকে ভোলবার উপায় বলে দাও। আমায় পথ দেখাও ভাই।

বাউল পুনরায় হাসিয়া উত্তর করিল, ভাই! প্রকৃত অন্ধকে পথ দেখান যায় না। অন্তরের আলোয় লোক সঠিক পথ চিনে নেয়, বাহিরের আলোয় নয়। সংসারে তোমার লোভ আছে বলেই তুমি বলতে পারছ

তোমার লোভ নেই। পথ তুমি নিজেই চিনে নিতে পারবে। একটা কথা মনে রেখ, ভালবাসা কোন অবস্থাতেই পাপ নয়। বিজ্ঞান যখন উত্তর দিতে পারে না, মানুষ তখন দর্শন চায়। দর্শন যেখানে নীরব, মানুষ সেখানে অনাদৃত ধর্ম্মের দিকে ছুটে চলে। ধর্ম্ম যেখানে নিরুত্তর সেইখানেই আরম্ভ হয় প্রেম। মানুষের জ্ঞান যে প্রেম ধর্ম্মে সমাপ্ত হয়েছে তা নয়, প্রেম হতে তাহার উৎপত্তিও হয়েছে। জগতের ইতিহাস হ'তে দেখা যায়, প্রেমের উপর ভিত্তি করেই সাহিত্য ও ধর্ম্ম গড়ে উঠেছে। ধর্ম্মের পর দর্শন ও দর্শনের পর বিজ্ঞান। প্রেমেই আরম্ভ ও প্রেমেই শেষ। লোকাচারের ভয়ে প্রেম ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিবার চেষ্টা করো না।

হিরুকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বাউল বলিল, চুপ করে শোন, আমি গান গাই। বাউলদা নিঃশব্দে একতারা তুলিয়া লইয়া গাহিতে লাগিল—

ভালবাসা পাপ নহে ধরায়,
সদা যে সে দুঃখ তাপ ভুলায়॥
বিরহে যার হৃদয় কাঁদে
পেলে পড়ে ভবের ফাঁদে
ভুললে পরে একেবারে
জীবন ঝরে যায়।
তুমি ভালবাস তারে
মনে রেখ বারে বারে,
দেখ প্রাণে ফুটবে হাসি
অসীম বেদনায়।

একতারার ঝঙ্কারে গীতহিল্লোল আকাশ বাতাস ভরিয়া দিল। জ্যোৎস্নার আলোয় বসিয়া শুনিতে শুনিতে হিরু তন্ময় হইয়া

গেল। গান কখন থামিয়া গিয়াছে; কিন্তু সুর তখনও থামে নাই। অনেকখানি আবেগ লইয়া হিরু বলিল, বেশ সুন্দর গাও বাউলদা, তোমার গান আমার চোখ খুলে দিয়েছে। পারবো না মানে? নিশ্চয় পারব। তুমি বিশ্বসংসার ভুলতে পেরেছ, আমি একজনকে ভুলতে পারব না; এই ত পথ। চল তোমার সঙ্গে যাই, বাউলদা!

বাউল বলিল, আবার ভুল বুঝলে ভাই! আমি বিশ্বসংসার ভুলে তোমাকে শুধু ভগবানকে ভালবাসতে বলি নি। বরং ভগবানকে ভুলে তাঁর প্রিয়-বন্ধু মানুষকে ভালবাসতে বলেছি।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বাউল আবার বলিল, কেন ভুলতে চাও হিরু? স্মৃতির আনন্দটুকু থেকে নিজেকে [illegible] বঞ্চিত করবে ভাই। আমাদের উদার বৈষ্ণব ধর্ম্ম ভুলতে শেখায় না। শেখায় স্মৃতির পূজা করতে। আর ভোলা যতটা সহজ মনে কর, ততটা সহজ নয়। তুমি যত ভুলতে চেষ্টা করবে, ভোলা তোমার পক্ষে তত শক্ত হয়ে উঠবে। ভালবাসা পাপ নয়। এস, আমি তোমায় পথ দেখিয়ে দেব। তুমি আমার গান শুনেছ। কিন্তু তার মর্ম্ম বুঝ নাই।

এমনি কথায় কথায় অনেক রাত্রি হইয়া গেল। সহসা বাউল ও হিরু চাহিয়া দেখিল, চন্দ্রমা তাহাদের মাথার উপর আসিয়া থামিয়া গিয়াছে। জ্যোৎস্নার আলোয় চারিদিক ভরপুর।

হিরু এইবার কতকটা শান্তিলাভ করিল। উভয়ে এইবার পাদ্রি-সাহেবের বসিবার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। উজ্জ্বল তৈল-প্রদীপ ও মোমবাতির আলোয় পাদ্রীসাহেব অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত পুস্তক রচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। তাহার অবারিত দ্বার ঘর খোলাই থাকিত।

ক্ষ্যান্ত শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে। ছিল সে বনের পাখী। এখন তাহার খাঁচার পাখীর অবস্থা ঘটিয়াছে। এ তাহার সুখনীড় বাঁধিয়া ঘর করা নয়। শাসন-কঠোর কারাপীঠে শিক্ষানবিশের কাজ করা। চারিদিকে বাধানিষেধের গণ্ডী। মাথার কাপড় একটু সরিলেই বিপদ। কেমন করিয়া রন্ধন করিতে হয়, কাপড় কখানা রৌদ্রে দেওয়া হয় নাই কেন, কখন 'দুম্' করিয়া ঘড়াটা মাটিতে রাখিয়া দোষ করিয়া ফেলিল, ইত্যাদি কৈফিয়ৎ ও বকুনির মধ্যে তাহার দিন কাটিয়া যায়। পাণ হইতে চুণ খসিলেই তাহাকে বাপান্ত শুনিতে হইবে।

শ্বশ্রুগৃহ শাসন—কারাগার। একদিনে একটি ১৫ বৎসরের মেয়েকে ৩০ বৎসরের একটি মেয়ের মত বুদ্ধিমান ও বিবেচক হইতে হইবে; নহিলে বিপদ। কোন দিক হইতে [illegible] কেহ না বধূর মুখ দেখিয়া ফেলে। এই সব বাধা [illegible] পুকুর হইতে জল আনা, কাপড় কাচা হইতে গৃহের সব কায অলক্ষ্যে করিয়া যাইতে হইবে, যেমন করিয়া ঠুলি বাঁধা বলদ, কলুর ইঙ্গিতে ঘানি টানিয়া যায়। তাদের চেয়ে বয়সে বড় একটী গাঁয়ের মেয়েকে যখন সে দাওয়া হইতে লাফাইয়া নামিতে দেখে তখন তাহারও মন তাহার অনুধাবন করিতে ইচ্ছা করে। তাহাকে যথেচ্ছা ছুটিতে ও খেলিতে দেখিয়া ক্ষ্যান্তরও তাহার সহিত যোগ দিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বধূত্বের শিকল তাহার পায়ে বাজিয়া উঠে। সে স্থির থাকে।

ছোট বড় সকলের কৌতুক-দৃষ্টির মধ্য দিয়া, আলপনার সারি-লিপির উপর দিয়া, যেদিন সে প্রথম সোয়ামীর ঘরে উঠিল, সেইদিন হইতেই তাহাকে এই ভাবে চলিতে হয়। এখন অনেকটা গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে। সেই কবে তাহার পিতা দেখা করিতে আসিয়া চলিয়া যাইবার পর, সে কয়দিন কাঁদিয়াছিল। তাই পিতৃ সাক্ষাৎ তাহার বন্ধ। সোমর্থ

মেয়ের পিতৃ গৃহে যাওয়া একেবারে নিষেধ। মাঝে মাঝে শুনে যে পিতা আসিয়াছে। কিন্তু দেখা করা বারণ। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর সে শুইতে যায়। মনসা যাত্রার পালা শেষ করিয়া গাঁজা খাইয়া যখন তাহার সোয়ামী ঘরে ফিরে তখন ক্যান্তর ঘুম ভাঙ্গান শক্ত হইয়া পড়ে। প্রেমময় সোয়ামীর ন্যায় বাদল কেশের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চার দ্বারা, মৃদু আঘাতে তাহার ঘুম ভাঙ্গায় না। গাঁজার ঝোঁকে তাহাকে চুলে ধরিয়া উঠায়। শেষ প্রহরের তৃপ্তি সুখ হইতেও সে বঞ্চিত। কপাল গুণে বিবাহের পর বাদল আবার গাঁজা খাইতে শিখিয়াছে।

সেদিন গ্রীষ্মের আধিক্য একটু বেশী হইয়াছিল। প্রখর তাপে মানুষের প্রাণ ভাজা ভাজা হইয়া যাইতেছে। ঘরের খড়ো চালগুলি পর্য্যন্ত বুঝি পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়।

সারাটা সকাল কঠোর পরিশ্রমের পর সোয়ামী ও দেওরকে খাওয়াইয়া কৃষক বধূ ক্যান্তমণি [illegible] একটু বিশ্রাম করিতেছিল। সকাল হইতে তাহার একটু জ্বরভাব হইয়াছে। তাহার উপর এই গরমে, আগুনের তাতে তাহাকে আরও কাহিল করিয়া দিয়াছে। এখনও কত কাজ বাকী। আর সে ভাবিতে পারে না। ময়লা আঁচলখানি মাটীর দাওয়ার উপর পাতিয়া সে তাহার ক্লান্ত দেহটা এলাইয়া দিল। কিন্তু সেখানেও শান্তি নাই। পৃথিবীর যত মাছি আসিয়া তাহাকে অতিষ্ঠ করিতে থাকে। প্রতিবেশী জ্ঞাতি গোপ দাসের মেয়ে মেনি গুল দিয়া দাঁত মাজিতে মাজিতে ক্যান্তদের বাড়ীর ভিতরকার উঠান দিয়া ঘাটে যাইতেছিল। ক্যান্তকে এইভাবে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, "কি গো বৌ, আবার জ্বর এল নাকি?"

ক্যান্ত একটু উঠিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "হাঁ দিদি, ওনাকে আর দেবরকে খাইয়ে সবে উঠেছি, আর কাঁপুনি এসেছে। তিনটা বাজল, এখনও কত কাজ বাকী রয়েছে দিদি। মা আবার বকবে।"

এই মেনি ছিল ক্ষ্যান্তর একমাত্র বন্ধু। মেনি গাঁয়ের মেয়ে, বধূ নয়। একটু মেজাজি তাই সোয়ামীর ঘর করা তাহার হইয়া উঠে নাই। বাপের কাছে সে থাকে আর পাড়ার খবরদারি করিয়া বেড়ায়। অবিচার সে কখনও সহিতে পারে না। তাই বেশ একটু চেঁচাইয়া মেনি বলিল "কি? বকবে! ভোর চারটা থেকে ত' খেটে মর্‌ছিস্। ঘোড়া দেখলে লোকে খোঁড়া হয় না? কাঁথাটা গায়ে দিয়ে শুয়ে থাক। আমি আসছি।" তাহার পর গামছাটা কাঁধে ফেলিয়া, মেনি বিরক্তির সহিত ক্ষ্যান্তদের বাড়ীর ভিতর দিয়া ঘাটের দিকে চলিয়া গেল।

এদিকে স্নান শেষ করিয়া কাপড় নিঙ্‌ড়াইতে নিঙ্‌ড়াইতে শ্বশ্রু ঠাকুরাণী বাপরে বাপরে করিতে করিতে, দৌড়াইয়া আঙিনার লাউ মাচার তলায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তপ্ত বালু মাটীর তাপে তাহার পায়ে গোটা দুই ফোস্‌কা হইয়া গিয়াছে। উঠানে পাতা একটা কাঠের পিঁড়ির উপর ভিজা গামছাটা ফেলিয়া তাহাতে পা দিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। বধূমাতাকে দাওয়ার উপর নিশ্চিন্ত মনে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া সমস্ত রাগটা পুঞ্জিভূত হইয়া তাহার উপর পড়িল। তিনি গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হ্যালা বৌ, কখন তোকে কাপড় ক'খানা কেচে আনতে বলেছি না! নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছিস্!"

শাশুড়ীর হুঙ্কার শুনিয়া বধূটী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "এই যে মা যাচ্ছি, গা'টা বড় ম্যাজ ম্যাজ করছিল তাই—"

শ্বশ্রু ঠাকুরাণীর রাগ আগে হইতেই হইয়াছিল। ক্ষ্যান্তর কথায় তাহা আরও বাড়িয়া গেল।

"তবে রে আবাগীর বেটী, ছেনালী? রাজ্যির ময়লা কাপড় জড় করা রয়েছে। উঁর এখন গা ম্যাজ্ ম্যাজ্ করছে, কথা কয়টা কোন রকমে শেষ করিয়াই শাশুড়ী ঠাকুরুণ উঠান হইতে গরু বাঁধিবার একটা গোঁজ

উপড়াইয়া লইয়া বধূটির মাথায় ও পিঠে বেশ ঘা কতক বসাইয়া দিতে লাগিলেন।

"আর মের না মা, যাচ্ছি মা," বলিতে বলিতে ক্ষ্যান্ত হাত দিয়া আটকাইতে চেষ্টা করিল। আঙ্গুলের প্রতি গাঁঠ তাহার আঘাতে ফুলিয়া কাল হইয়া গেল।

এতক্ষণে মেনি উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া গোঁজটি কাড়িয়া লইয়া বলিল, "অমন করে মারে? ওর যে জ্বর হয়েছে জ্যেঠাইমা! মরে যাবে যে!"

মেনির কথায় ক্ষ্যান্তর শাশুড়ী আবার একবার হুঙ্কার দিয়া উত্তর করিল, "থাম্‌লো থাম্। মরলে আমাকেই সব করতে হবে! তুই এসে করে দিবি? আমার বউকে আমি মারছি, তোর কি লা? মরুক না আবার বেটার বিয়ে দিয়ে নিয়ে আসব।"

মেনিও ছাড়িবার পাত্রী নয়। সাংঘাতিক মেয়ে সে। পাড়ায় কলহে তার বেশ একটু নাম আছে। মুখের সহিত তাহার হাতও চলে। তাকে একটা বেফাঁস কথা বলায়, পাড়ায় সুয়ো ঠাকুরকে এই সেদিন স্নানের ঘাট হইতে গলায় গামছা দিয়া সে টানিয়া আনিয়াছিল। কোমরে আঁচল জড়াইয়া সেও ঘুরিয়া দাঁড়াইল। দুইজনে তুমুল কলহ আরম্ভ হইল। বেগতিক দেখিয়া ক্ষ্যান্তর শাশুড়ী কাপড় ছাড়িবার জন্য ঘরে ঢুকিলেন।

শাশুড়ী রণে ক্ষ্যান্ত দিয়া ঘরে ঢুকিলে ক্ষ্যান্ত মেনিকে বলিল, "কেন দিদি আমার জন্য কথা শোন। মারত আমার রোজকার পাওনা।"

মেনি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "তুই সহ্য করিস্ কেন? দিবি উল্টে পিটিয়ে! যতদিন এক তরফা মারা চলে, ততদিন ও চলবেই। যেদিন থেকে মারামারি সুরু হবে সেদিন থেকেই মার বন্ধ হবে। ওরা জানুক খামকা মারলে মার খেতে হয়। তা শাশুড়ীই হক্ আর সোয়ামীই হক্।"

মেনি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, "আমার মা'কে আমার দেবর রোজ পিটুত। আর সে শুধু কাঁদত। বড় জোর বলত, আরো মার, মেরে ফেল। এই অবধি। তারপর আমি শিখিয়ে দিলাম, দিবি উল্টে বেলুন পেটা করে। অবিশ্যি সেদিন সে একটু বেশী বাখারী পেটা খেয়েছিল, ব্যস, তারপর থেকে মার বন্ধ।"

মেনি চলিয়া যাইলে, ক্ষ্যান্ত ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া বাকি কাজগুলি সারিতে মনস্থ করিল।

পুকুরের জল প্রায় সব শুকাইয়া গিয়াছে, যা একটু আছে, তাহাতেই কাপড় কাচা গা-ধোয়া সবই সারিয়া লইতে হয়। বগলে কাপড়ের একটা বড় বোঁচকা ও হাতে এক গোছা বাসন লইয়া ক্ষ্যান্তমণি ঘাটে নামিল। হাত দিয়া আটকাইতে গিয়া হাতেই তাহার বেশী লাগিয়াছিল। সমস্ত হাতখানি ফুলিয়া উঠিয়াছে। হাত সে নাড়িতেই পারে না, কাজ সে করিবে কি করিয়া! তালগাছের পৈঠার উপর বসিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। সেই কবে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। তাহার পর হইতে সে সংসারে বলদটীর মতই খাটিয়া আসিয়াছে। কাহারও মুখে সে একটি সান্ত্বনার কথাও শুনে নাই। প্রহার; প্রহার ত' তার রোজকার পাওনা। কি শাশুড়ী কি সোয়ামী, কি দেবর, যে যখন ছুতা পাইয়াছে তাহাকে পিটাইয়া দিয়াছে। অনেক কথাই তাহার মনে আসিতে লাগিল। মনে আসিতেছিল বাড়ীর কথা, মারু কথা, সবার উপর হিরুদা'র কথা। সে স্নেহ কি সে আর পাইবে। হিরুর কথা মনে পড়াতে, ক্ষ্যান্তকে আরও আকুল করিয়া দিল। তাহার এই দুঃখের কথা জানিতে পারিলে, সে না জানি কত ব্যথাই পাইত। কি ভাবিয়া, ক্ষ্যান্ত তাহার চিন্তার ধারা অন্য পথে চালিত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু

শত চেষ্টায়ও তাহার হিরুর কথা মনে পড়িতে লাগিল। শেষে নিজের উপর বিরক্ত হইয়া ক্যান্ত মনে মনে বলিল, ছিঃ, তার কথা, আর ভাবাই উচিত নয়। সে যেখানেই থাক, যেন সুখে থাকে। তাহার পর পুকুরে নামিয়া হাতের কাছের পানাগুলা সরাইয়া বাসনগুলি মাজিতে সুরু করিল। বাসন মাজিতে মাজিতে তাহার আর একবার মনে হইল, হিরুর সঙ্গে যদি তার বিবাহ হইত, তাহা হইলে হয়ত তাহারা এতক্ষণে কেমন সুখে সেই আগেকার দিনগুলির মতই বৈঁউচ বনে মাঠের আলে আলে বেড়াইয়া বেড়াইত। যখন তখন দুজনা মিলিয়া মা'য়ের কাছে ছুটিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু পরক্ষণেই একটা ভীতি-শিহরণ তাহাকে সেই সুখস্বপ্ন হইতে জোর করিয়া টানিয়া আনিল। কি ভাবিয়া সে নিজের মনেই বলিয়া উঠিল, "কি এ পাপ চিন্তা সে করিতেছে! এখন যে, সে তার ভাই, ভগবান্!'

সাত

পুরা একটা বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। হিরু মিশনারী স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া ভাবিতেছিল, কি করিবে! হিরুর বাপের ইচ্ছা সে মিশনারী সাহেবকে ধরিয়া কলিকাতায় একটি চাকুরী জুটাইয়া লয় ও দশজনের মত গ্রাম হইতে "ডেলি পেসেঞ্জারী" করে। কিন্তু হিরুর মন আর দেশে টিকিতে চাহে না। ক্যান্তর অন্যত্র বিবাহ তাহাকে বেশ একটু আঘাত দিয়াছিল। সে বিবাহও করিলই না, গ্রামেও থাকিতে পারিল না। চেষ্টা করিয়া মণ্ডপপুরের রাজষ্টেটে একটা নায়েবী চাকুরী যোগাড় করিল। তাহার ইচ্ছা বহু জেলায় বিস্তৃত এই রাজষ্টেটের মহল্লায় মহল্লায় ঘুরিয়া সে বাকি জীবনটা কাটাইয়া দিবে। দেশে আর সে ফিরিবে না। সে চাহিয়াছিল ক্যান্তকে ভুলিতে, কিন্তু

ভোলা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। বহু চাকুরী পরগণা ঘুরিয়া-ঘুরিয়া শেষে এই ক্ষ্যান্তর শ্বশুর বাড়ীর দেশেই সে নায়েব হইয়াছে। রাজাবাবুরা নূতন এই পরগণাটা কিনিয়া কোন রকমে এর সুবন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাই হিরুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করিয়া তাহাকে এই পরগণার ভার দিয়াছেন।

কাছারীর জানালার ধারে কেদারার উপর বসিয়া অদূরের তালগাছের আড়ালে ক্ষ্যান্তদের বাড়ীর দিকে তাকাইয়া হিরু ভাবিতেছিল। বাউলদার যাবার দিনের সেই শেষ কথাটা তাহার বারে বারে মনে আসিতেছে, "হিরু, যতই ভুলতে চেষ্টা করবে তোমার পক্ষে ভোলা ততই শক্ত হবে।" সত্যই সে ভুলিতে পারিল কই? সে আসিয়াই শুনিয়াছে যে বাদলের মত গেঁজেল এ অঞ্চলে নাই। তাহার প্রাণ একটা অব্যক্ত বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছে। সে ভাবিতে লাগিল, আহা, এরা তাহার ক্ষ্যান্তকে কি কষ্টই না দেয়। সে সবই শুনিয়াছিল। কি ভাবিয়া সে খাজাঞ্চিকে ডাক দিল। খাজাঞ্চিবাবু তখন পাশের ঘরে একটী গদিপাতা তক্তাপোষের উপর বসিয়া একটা ছোট নীচু চৌকির উপর খাতা পত্রাদি রাখিয়া হিসাব নিকাশ করিতেছিলেন। নূতন নায়েবের ডাকে চশমা জোড়াটি কপালে তুলিয়া, সরের কলমটা কানে গুঁজিয়া, তাড়াতাড়ি হিরুর সামনে হাজির হইলেন। হিরু তাহাকে খাজনার জমা বই আনিতে বলিয়া দূরের তাল গাছটার দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল।

সে বৎসর প্রথমে খুব বৃষ্টি হইলেও শেষের দিকে বর্ষণ হয় নাই। ফসল একেবারেই হয় নাই। বাদলদের মত জোতদারদেরও বহু টাকা খাজনা বাকি পড়িয়াছে। হিসাব বই দেখিতে দেখিতে হিরু একবার ভাবিল, বাদলদের উপর একটা নালিশ জুড়িয়া দিয়া বেশ একটু জব্দ করিয়া দেয়। ইহাতে তাহার ভিটা-মাটী নীলাম

হইয়া জমীদারের খাসেও চলিয়া আসিতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই সে লজ্জিত হইয়া ভাবিল, ছিঃ ছিঃ, এতে ক্ষ্যান্তরই ক্ষতি হবে। বাদল যে ক্ষ্যান্তর স্বামী। তাকে ত তার ঈর্ষা করা উচিত নয়। ক্ষ্যান্তর মত বাদলকেও তার ভালবাসা উচিত। হিরু তাদের বকেয়া খাজনা এ বৎসরের মত কি করিয়া মাপ করিতে পারা যায়, তাহাই ভাবিতে লাগিল।

হিরু গ্রামের বহুস্থানে গমনাগমন করিত। কিন্তু ক্ষ্যান্তরা যেদিকটায় থাকিত, সেদিকে কখনও সে যায় নাই। দেখা করিয়া, নূতন করিয়া ক্ষ্যান্তর মনে দুঃখ দেওয়া যে সমীচীন নয়, কিন্তু তবুও তাহাকে দেখিবার জন্য তাহার মন ব্যাকুল হইত। সেদিন রাত দশটা পর্য্যন্ত রেওয়তদের লাঠি ও কোস্তা খেলা দেখিয়া ও তাহাদের ডঙ্কা বাজনা শুনিয়া, গ্রামের ইতর ভদ্রের সহিত গল্পগুজব শেষ করিয়া, হিরু শুইবার যোগাড় করিতেছিল। হঠাৎ একটা কোলাহল শুনিয়া সে রোয়াকের উপর বাহির হইয়া আসিল। চেঁচামেচি শুনিয়া পাইকদেরও কয়জন সেখানে ছুটিয়া আসিল।

হ্যারিকেন ও লম্ফ হস্তে ইতর ভদ্র সকলে অন্ধকার বাগান ও পথের উপর দিয়া একটা পুকুর পাড়ে জমা হইতেছিল। বাগিচা ও পথের বুক চিরিয়া আলোর সারি বাঁধিয়াছে। শুনা গেল, বাদলের স্ত্রী নাকি জলে ডুবিয়াছে। একপ্রকার পাগলের মত হইয়া ছুটিয়া গিয়া, দুই চারিটা বেড়া ঘেরা বাগিচা ডিঙাইয়া, হিরু জলে পড়িল। নায়েবকে জলে পড়িতে দেখিয়া গ্রামের সকলেই জাল পোলো প্রভৃতি লইয়া জলে নামিয়া পড়িল। এমন কি যাহারা সাঁতার জানে না, তাহারাও ভাসমান ঘড়ার সাহায্যে জলে নামিল। পাড়ের চারিদিকে লম্ফ, হ্যারিকেন ও জলন্ত প্যাকাটীর তাড়ার গাঁতি লাগিয়া গেল। কেবল অকর্ম্মা বাদল পাড়ে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছিল, ওই ওখানে

কি ভাস্‌ছে। ওগো ওই রয়েছে। হ্যারিকেন লন্ঠন ও পাটের মশালের আলোয় পুকুর ও চারিপাশের অনেকখানি জায়গা আলোকিত হইয়া গিয়াছে। কয়েকটা ভাসমান নারিকেল, গামলা ও শুকনা ঝুড়ি ছাড়া আর কিছুই জাল ফেলিয়া বা হাতরাইয়া পাওয়া গেল না।

ক্যান্তকে পাওয়া গেল না। হতাশ হইয়া সকলে কাপড় নিঙড়াইতে নিঙড়াইতে, প্রায় ঘণ্টা দুই চেষ্টার পর একে একে জল হইতে উঠিল। হিরু কোন রকমে জল হইতে উঠিয়া নীচের আধ ভাঙা সানের পৈঠার উপর বসিয়া পড়িল। একবার যদি দেহটাও দেখিতে পাইত। সে ভাবে নাই, এমন করিয়া ক্যান্তর মহাপ্রাণ শেষ হইবে।

সকলের মনেই বিষাদ। এমন সময় মেনি পাঁচিলের উপর মুখ তুলিয়া চেঁচাইয়া বলিল, "কি করেন আপনারা মিছামিছি। বৌ ত ঘরেই আছে। পিটুনির ভয়ে বেচারা তক্তপোষের নীচে লুকিয়েছে।" স্তম্ভিত হইয়া সকলে কথাটা শুনিল। অন্তরে অন্তরে জ্বলিতে জ্বলিতে সকলে কিয়ৎকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রুদ্ধ আক্রোশে বাদলকে লক্ষ্য করিয়া হিরু বলিল, "কি হয়েছিল সত্য করে বল।" বাদল বলিল, "ঘরে না দেখতে পেয়ে বার বার ডাকলাম, ও বৌ, ও বৌ। কিন্তু কোন উত্তর পেলাম না। তারপর বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় পুকুরে কি একটা ঝুপ্ করে পড়ার শব্দ শুনলাম। বোধ হয় একটা বড় নারকেল জলে পড়েছিল। আমি মনে করলাম ক্যান্ত জলে পড়ল। তাই চেঁচিয়ে উঠেছিলাম।"

বাদলের এই উত্তর শুনিয়া সকলে মারমুখী হইয়া বাদলের উপর পড়িল—"মার বেটাকে, উল্লুকের বাচ্চা।" হিরু কোন রকমে জনতাকে শান্ত করিয়া বাদলকে লইয়া, তাহার বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে চলিল। ঐ বাদলদের কুটীর। অনেকখানি আশা লইয়া হিরু বাদলের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার আশা ছিল, অন্ততঃ কৃতজ্ঞতার-

খাতিরে বাদল তাহাকে একবার ভিতরে লইয়া যাইবে। সে ক্যান্তকে দেখিবে। কিন্তু বাদল তাহাদের কথা জানিত। তাই ঈর্ষান্বিত বাদলের পক্ষে হিরুকে ক্যান্তর কাছে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইল না। বাহিরের উঠানে দাওয়ার উপর একটা টুল পাতিয়া দিয়া বাদল হিরুকে বসিতে বলিল, কিন্তু হিরু বসিল না। বাহিরের উঠানে দাঁড়াইয়া ক্যান্তর নিন্দা-বিষ কোন রকমে গলাধঃকরণ করিয়া, ব্যর্থ মনোরথ হইয়া গৃহে ফিরিল।

দোষটা পুরা মাত্রায় বাদলের হইলেও, আজিকার এই কেলেঙ্কারীর জন্য বাটীর সকলে ক্যান্তকে দায়ী করিল। সকলের পুঞ্জীকৃত রাগটা ক্যান্তর উপরই নানা ভাবে পড়িতে লাগিল।

সকলের সামনে আজিকার এই অপমান ক্যান্ত সহ্য করিতে পারিল না। সহ্যের সীমা সে বহু দিন পূর্ব্বে অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু নিষ্কৃতি পাইবার উপায় তাহার এতদিন জানা ছিল না; আজিকার ঘটনা তাহার চোখ খুলিয়া দিল। আত্ম-হত্যার কথা পূর্ব্বে সে কখন ভাবে নাই, আজিকার ঘটনার পর তাহার মনে হইল আত্মহত্যা ভিন্ন তাহার নিষ্কৃতির অন্য পথ নাই। সে মনস্থ করিল, এ পাপ জীবন আর সে রাখিবে না।

আট

প্রত্যুষে ক্ষুব্ধ মনে বিছানা হইতে উঠিয়াই ক্যান্তর কথা হিরুর প্রথম মনে পড়িল। কল্যকার ঘটনা তাহার অন্তরে কাঁটার মত বিঁধিতেছিল। কোথা হইতে যেন একটা সুর আসিয়া তাহার কানে আঘাত দিতে-ছিল, "হিরুদা, তুমি আমায় বাঁচাও! তুমি আমাকে কেন ভুলে গেলে হিরুদা?" হিরু পাগলের মত হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, বাদলের

সহিত ভাল ব্যবহার করা উচিত হয় নাই। সে ত এই মহল্লার নায়েব।
সে ত এখুনি তাহাকে ডাকাইয়া ধমকাইতে পারে। দুইজন পাইক্
ডাকিয়া হিরু হুকুম দিল, যা সদানন্দের ছেলে সাতকড়িকে ধরে নিয়ে
আয়। বাদলের ভাল নাম সাতকড়ি। কায়দা মত সেলাম করিয়া, 'যো
হুকুম' বলিয়া যষ্টি হস্তে পাইকদ্বয় অপরাজিতা-ঢাকা গেটের পরপারে
অদৃশ্য হইল। পাইকদ্বয় চলিয়া যাইবার পর অলিন্দায় পদচারণ করিতে
করিতে হিরু আপন মনে বলিতেছিল, বাদল, আমি শুধু চাই—তুমি
ভাল হও, ক্ষ্যান্তকে সুখী কর। ভাবিতে ভাবিতে হিরু উত্তেজিত হইয়া
অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিল, "সুখী কর কি? করতে হবে! না পার আমি
ক্ষ্যান্তকে নিয়ে যাবো। তার কষ্ট আমি দেখতে পারবো না।"

নিম্নস্বরে কথা কয়টা উচ্চারণ করিয়া হিরু চমকাইয়া উঠিল। এ কি?
এ সব কি মনে আসিতেছে? সে যে পরস্ত্রী! হিরু অস্ফুট আর্তনাদে
বলিয়া উঠিল, "বাউলদা, আমাকে পথ দেখাও, ভোলবার চেষ্টা করে
আমি যে সব ভুলে যাচ্ছি।" ভাবিতে ভাবিতে হিরুর কপালের শিরা-
গুলি পর্য্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠিল। হিরু ভাবিতেছিল, পাইক পাঠান হয়ত
অন্যায় হইল। ক্ষ্যান্ত হয়ত স্বামীর অপমানে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে। অস্থির
হইয়া সে পাইকদ্বয়কে ফিরাইবার জন্য অপর এক পাইক পাঠাইতে
যাইতেছিল। এমন সময় দেখা গেল দুইজন লোকসহ পাইকদ্বয় ফিরিয়া
আসিতেছে। তাহারা বেশ পরস্পর কথা বলিতে বলিতে আসিতেছিল
যেন কাহারও কোন বিরাগ নাই। কিন্তু হিরুর নিকট আসিয়া পাইকদ্বয়
সহসা শত্রুভাবাপন্ন হইয়া লোক দুইজনের গলদেশ ধারণ করিল; তাহারা
হিরুকে দেখাইয়া তাহাদের ধাক্কা দিতে দিতে লইয়া আসিয়া বলিল, "খাড়া
রহ শালা।" তাহাদের মধ্যে একজনও সাতকড়ি ওরফে বাদল ছিল না।

হিরু একসঙ্গে নিশ্চিন্ত ও অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ দুজনকে
কোথা হতে আন্‌লি?" পাইক দুইজন উত্তর দিল, "এজ্ঞে এরা দুজনে

দুভাই। দুজনেই এরা বাদল ওরফে সাতকড়ির জ্ঞাতি। দুকড়ি আর পাঁচকড়ি। সাতকড়িকে ত পেলাম না। তাই এদের নিয়ে এলাম।" কাছারীর খাজাঞ্চীবাবু নিকটেই বসিয়াছিলেন। হিরুকে অবাক হইয়া যাইতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "তা বেটাদের বুদ্ধি ভালো, পাঁচকড়ি আর দুকড়ি মিলিয়ে সাতকড়িই হবে। এরাই সাতকড়ির খাজনা উশুল করবে, হুজুর।"

খাজনা আদায় করিবার বহু হাস্যকর উপায় হিরু তাহার পুরান কর্ম্মচারীদের মুখে শুনিয়াছিল। কিন্তু এরূপ অভিনব উপায় সে শোনে নাই। রাগ করিবে কি, সেই অঙ্ক শাস্ত্রের দিগ্‌গজ পণ্ডিতদ্বয়ের কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল, এমনি সময় ক্ষেত্র বাগ্‌দীর ছেলে ননকু খবর দিল যে, বাদলের স্ত্রী ক্ষ্যান্ত কলকে ফুলের বীচি খাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। কলকে ফুলের বীচি এক প্রকার সেঁকো বিষ। কথাটা যেন হিরু প্রথমে বুঝিয়াও বুঝিতে পারিল না। সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর দেহটা কোন প্রকারে টানিয়া লইয়া ক্ষ্যান্তদের বাটীর দিকে চলিল।

বাদলের বাটী লোকে লোকারণ্য। দাওয়ার উপর ছেঁড়া মাদুরে অনাবৃত একখানি পরিস্ফুট-যৌবন। দেহ নিশ্চল, মুখ হইতে ফেণা নির্গত হইতেছে; ক্ষ্যান্তর শাশুড়ী ঠাকরুণ মৃত বোধে ক্ষ্যান্তর দেহ হইতে রৌপ্য অলঙ্কারাদি খুলিয়া লইতে ব্যস্ত। এমন সময় 'নায়েব আসছে রে, নায়েব আসছে রে', শব্দে জনতা সরিয়া দাঁড়াইল। গ্রামের প্রধান ব্যক্তি হিসাবে অহেতুক মৃত্যুর তদন্ত নায়েবদের করিতে হয়। তাহার উপর সে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট ছিল। সকলেই ভাবিল, হিরু সেই জন্যই আসিয়াছে।

বাদল সবই জানিত ও বুঝিত। সে ভাবিল, হিরু হইতে এইবার তাহাদের হাতে দড়ি পড়িবে। সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া হিরুর পা

জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "হিরুদা, বাঁচাও আমাদের, ক্ষ্যান্ত আমাদের ধনে-প্রাণে ডুবিয়ে গেল।"

হিরু শুধু উত্তর করিল, "হুঁ।" তাহার পর দাওয়ায় উঠিয়া ক্ষ্যান্তর দেহ পরীক্ষা করিল। কতদিন পরে আবার হিরু ক্ষ্যান্তকে দেখিল। তাহাকে স্পর্শ করিল। ক্ষ্যান্ত তখনও মরে নাই। পাদ্রীদের স্কুলে হিরু প্রাথমিক চিকিৎসা কিছু কিছু শিখিয়াছিল। বাসা হইতে ঔষধ আনাইয়া হিরু একবার শেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। নিকটে ডাক্তার নাই। তিন ক্রোশ দূরে নারায়ণগঞ্জে জেলা বোর্ডের একটা ডিসপেনসারী ছিল; সেখানে একজন ডাক্তারও থাকে। কিন্তু তাহাকে আনিতে আনিতে হয়ত সব শেষ হইয়া যাইবে। ভাগ্যক্রমে রাজাবাবুদের একটী হস্তী নূতন মহল্লায় চড়িতে আসিয়াছিল। হিরু হস্তী সহ একটী লোককে ডাক্তার আনিতে পাঠাইল।

যথা সম্ভব শীঘ্র ডাক্তার আসিল। ক্ষ্যান্ত বাঁচিয়া গেল। ইহার পর ক্ষ্যান্তর পন্থা অবলম্বন করিয়া গ্রামের কত নির্য্যাতিতা নারী প্রাণ-ত্যাগ করিয়া মরিয়া বাঁচিল। কিন্তু ক্ষ্যান্ত বাঁচিয়া ক্ষণে ক্ষণে মরিতে লাগিল। দিন যেরূপ পূর্ব্বে চলিত, এখনও সেইরূপ চলে। তবে ক্ষ্যান্তর একমাত্র সান্ত্বনা যে সময় সময় হিরুদার দেখা মিলে। মনে মনে গজরাইলেও বাহিরে কেহ বড় একটা বাধা দেয় না।

নয়

গ্রাম্য পুষ্করিণী। পাড়গুলা বেশ উঁচু। চারিধারে শুধু বাঁশ বন। সব সময় সূর্য্যের আলো সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। আঁকা বাঁকা পথ দিয়া কাপড়ের একটা বড় বোঝা লইয়া ক্ষ্যান্ত কাঁদিতে কাঁদিতে সেখানে উপস্থিত হইল। একটু বকুনি ও দুই এক ঘা প্রহারও খাইয়া-

ছিল। এই সময় হিরুও কি একটা কাজে সেখানে উপস্থিত হইল। হিরুকে দেখিয়া ক্যান্ত আরও জোরে কাঁদিয়া ফেলিল। ক্যান্তকে কাঁদিতে দেখিয়া হিরু বলিল, "কাঁদিস্ কেন ক্যান্ত, আবার বুঝি তোকে মেরেছে ?"

ক্যান্ত কোঁপাইতে কোঁপাইতে বলিল, "হাঁ হিরুদা, আজ শুধু শুধু মারলে। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই হিরুদা। সেদিন বাবা এসে-ছিলেন। তেনাকে চুপি চুপি বললাম, আর তিনি উল্টে আমাকেই বকে দিলেন।"

হিরু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কিন্তু আমি নিকটে থেকেও অনেক দূরে ক্যান্ত। কি করব বল্ ?" জমিদারের নায়েব আমি। আমার অনেক ক্ষমতা স্বীকার করি। কিন্তু তোর উপর অত্যাচার বন্ধ করতে গেলে, তোর উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়বে বই কমবে না। তোকে যে ওদের সঙ্গেই থাক্তে হবে।"

আজ ক্যান্তমণির মা নেই, সে সঙ্গে কেহই নাই, আছে শুধু হিরুদা ; কিন্তু সে নিকটে থাকিয়াও অনেক দূরে, তাহা সে ভাল রকমই বুঝিত। চোখ মুছিয়া সে বলিল, "যাই হিরুদা। কাপড় ক'খানা কেচে নিয়ে, আবার বাড়ী গিয়ে ধান ভান্তে হবে। না হলে আজকেও খেতে দেবে না।"

"ওঃ, তোকে বড্ড মেরেছে ত। ও ভাঙ্গা হাত নিয়ে কি করে কাজ করবি ?" সহানুভূতির স্বরে কথা কয়টী বলিয়া, হিরু ক্যান্তর কাছে একটু আগাইয়া গেল ও তাহার পর কাপড়ের বোঁচ্‌কাটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া, নিজেই কাপড় কাচিতে চাহিল। ক্যান্তমণি বারণ করিয়া বলিল, "ছিঃ হিরুদা, লোকে বলবে কি ?" হিরু অপ্রস্তুত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

রৌদ্রে কেহ বড় একটা বাহির হইতেছে না। শুকনা পাতা পড়ার টুপ টাপ শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না। ইতিমধ্যে তাড়াতাড়ি-

কাজগুলি সারিয়া পাড়ে হেলিয়া-পড়া একটা বকুল গাছের তলায় দাঁড়াইয়া তাহারা কথায় কথায় সময় কাটাইয়া দিতেছিল। চমকাইয়া ক্ষ্যান্তমণি দেখিল বেলা পড়িয়া আসিতেছে। সে বলিয়া উঠিল, "আসি হিরুদা! আবার ধান কটা ভানতে হবে।"

—"আচ্ছা যা, আবার যেন না মারে," বলিয়া হিরুও উঠিয়া পড়িল।

ক্ষ্যান্ত চলিয়া যাইতেছিল। কি ভাবিয়া হিরু তাহাকে পুনরায় ডাকিল। তাহার পর ক্ষ্যান্তর কাছে গিয়া হাত দুইটী তাহার স্কন্ধে রাখিয়া তাহাকে নিজের কাছে একটু টানিয়া আনিল। তাহার পর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, কি ভাবিয়া হিরু বলিয়া ফেলিল, "চল না ক্ষ্যান্ত, আমরা একদিকে চলে যাই।"

যদিও ক্ষ্যান্তর অন্তর এই কথাটাই হিরুর মুখে বহুবার শুনিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে এই কথাটা সত্য সত্যই হিরুর মুখে শুনিবে, তাহা সে আশা করে নাই। স্বামী ভক্তি হিন্দু মেয়েদের মজ্জাগত সংস্কার, অন্তর যাহাই চাউক বাহির হইতে সংস্কার-বিরুদ্ধ বিপরীত কিছু শুনিলে তাহাদের রাগই হইয়া থাকে। কিন্তু প্রিয়জন বিশেষ একটা অন্যায় আচরণ হঠাৎ করিয়া ফেলিলে, অনেক সময় রাগ করা যায় না। ক্ষ্যান্ত হিরুর উপর রাগ করিতে পারিল না। সে প্রথমটা চমকাইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "ছিঃ হিরুদা, তোমার মন এত দুর্ব্বল; এই তুমি আমায় ভালবাস! যাও হিরুদা। আর দেরী কর না। আবার কে এসে পড়বে।" কথা কয়টা বলিয়া তাড়াতাড়ি বুকের ও মাথার কাপড় ঠিক করিয়া লইয়া সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। হিরুর কথায় লজ্জায় তার মুখ রাঙা হইয়া গিয়াছিল।

তাহার কথা শেষ করিয়া, হিরুও লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। তাহার মনে হইল যে তাহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। অনুশোচনায়.

অতিষ্ঠ হইয়া সে ক্ষ্যান্তর নিকটে আসিয়া বলিল, "মাপ করিস্ ক্ষ্যান্ত। আবার ভুল হয়ে গেল। যে যাকে সত্যিকারের ভালবাসে, সে তাকে কখনও বিপথে নিয়ে যেতে পারে না। যদি তুই তোর কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে ভুল করে বসিস্ ত আমার কর্ত্তব্য, তোর ভুল শুধরে দেওয়া, ভুলের পথে এগিয়ে দেওয়া নয়।"

ক্ষ্যান্ত কথা কয়টা চুপ করিয়া শুনিল। তাহার পর নীচু হইয়া হিরুকে একটা নমস্কার করিয়া, কোন কথা না বলিয়া ত্বরিত পদে গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

চারিদিকে পাড়ের উপর বিস্তৃত বাঁশের বন। শুষ্ক বাঁশ পাতায় সারা জমিটা ঢাকিয়া আছে। কয়েকটা ছেলে, প্যাকাটির তাড়ায় অগ্নি সংযোগ করিয়া, সেই বাঁশ পাতা স্থানে স্থানে ধরাইয়া দিতেছে। সমস্ত পাড় ও তৎসংলগ্ন জমি অগ্নিময় হইয়া উঠিতেছিল। কিছুটা তপ্ত আলো হিরুর মুখেও আসিয়া পড়িল। কিন্তু হিরুর সেদিকে খেয়াল নেই। ক্ষ্যান্ত বহুক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু হিরু তখনও সেখানে দাঁড়াইয়া, তাহার সেই ক্ষণিকের দুর্ব্বলতার কথা ভাবিতেছে। হিরু ভাবিতেছিল, ক্ষ্যান্তর কথা, বাউলদার কথা ও বাউলের বাবার দিনের কথা কয়টার অর্থ।

ছেলেদের দল আগুনের আশে পাশে হাততালি দিতে দিতে গাহিতেছিল। চমক ভাঙ্গিয়া হিরু তাহাদের কাজ দেখিতে লাগিল। তাহারা বাঁশ পাতায় আগুন ধরাইতে ধরাইতে গাহিতেছিল—

"ফাগুনের বাঁশেতে আগুন
ব্যাড় গ্যাস নাশে।
আর কলিকাতাবাসী
শুধু কানে শুনে হাসে।"

ক্ষ্যান্ত ও হিরু উভয়েই মনে করিয়াছিল তাহাদের এই সান্ধ্য মিলন কেহ দেখে নাই। কিন্তু যাহা মনে করা যায়, তাহা সব সময় সত্য হয় না। বাড়ী ঢুকিতেই ক্ষ্যান্তমণি শুনিল, শাশুড়ী ঠাকরুণ বলিতেছেন, "ওরে আবাগীর বেটী, ও লাগরটা কে—লা? আসুক বাড়ী, তোর শতেকখোয়ারী না করি ত কি বলেছি।"

এত বড় অপবাদ বোধ হয় মেয়েদের আর নাই। ক্ষ্যান্তমণি আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে বলিল, "যা তা বলবেন না মা।"

—"চুপ কর্ হারামজাদী, চুপ কর্! অন্যায় কর্‌বি আবার—" কথা কয়টা শেষ না করিয়াই শাশুড়ী ঠাকরুণ ছুটিয়া গিয়া বধূর মাথাটী চালের খুঁটির সঙ্গে বার কতক ঠুকিয়া দিল। তাহার পর বধূকে, কৃত অপকর্ম্মের জন্য আরও শাস্তি দিবার আগে তাহার অপরাধটা পাড়ায় একবার জাহির করিয়া দিবার জন্য গজ গজ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

দশ

নদীর ঘাট। বহুদিন পূর্ব্বে ঘাটটি বাঁধান ছিল। এখন স্থানে স্থানে মাত্র কয়েকটি ইষ্টক পড়িয়া আছে। বাঁধাঘাটের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। পাশে একটি বড় বটগাছ পূর্ব্ব দিনের সাক্ষ্য দিতেছে। অনেকগুলি শাশুড়ী জাতীয়া, প্রৌঢ়া মহিলা, সেখানে সেদিন জড় হইয়াছিল। বেশীর ভাগ ঘর সংসারের কথাই হইতেছিল। কাহার ছেলের চাকরী হইল। এবার বেয়ান তত্ত্ব করিল কিরূপ। কে কাহার বৌকে কিরূপ সায়েস্তা রাখিয়াছে, এমনি কত কি!

ঘাটের এক পার্শ্বে গ্রাম্য বধূরা একে একে জল তুলিতেছিল, কাপড় কাচিতেছিল।

উৎপীড়িত মূক বধূ-জীবন। চুপ করিয়া সকল অত্যাচার সহ্য করিয়া, তাহাদের বেশীর ভাগই ঐরূপ অপর এক মূক বধূর জন্য পতিদেবতাকে ছাড়িয়া দিয়া সীতা, সতী, সাধ্বী নাম লইয়া, অকালে ইহলোক ত্যাগ করে। কেবলমাত্র তাহাদের মধ্যে যাহারা শাশুড়ী ঠাক্‌রুণদিগের মত কলহ-কুশল হইয়া আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হয়, তাহারাই কোন রকমে জীবন-যুদ্ধে টিকিয়া যায়। নিজে জ্বলিয়া অপরকে জ্বালাইয়া, লোকের নিন্দনীয়া হইয়া, তাহারাই বাঁচিয়া থাকে। সুশিক্ষিত সভ্য সমাজের মুষ্টিমেয় প্রাণী ক'জন মাত্র? তাহাদের ছাড়িয়া দিলে, কলিকাতার বাহিরে যে এই প্রকাণ্ড বাংলাদেশ পড়িয়া রহিয়াছে তাহার সর্ব্বত্রই এই একই কাহিনী। সুদূর পল্লীগ্রামের খবর ক'জন আর রাখে!

বধূগণ আপন মনে কাজ করিয়া যাইতেছিল, শাশুড়ীদিগের সম্মুখে সহজভাবে পরস্পরের মধ্যে কথোপকথন করিবার দুঃসাহস কাহারও ছিল না। চোখের সতর্ক ইসারা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে ভাবের আদান প্রদান তাহাদের মধ্যে সম্ভব ছিল না।

বামুন বাড়ীর মেজবউ ভিজা কাপড়ে এক ঘড়া জল লইয়া ঘাটের পথে উঠিতেছিল। অপর বাড়ীর একজন বধূর এইরূপ একটা সতর্ক ইসারার প্রত্যুত্তর দিতে গিয়া অসাবধানতায় হঠাৎ পা পিছলাইয়া ঘড়া শুদ্ধ সে পড়িয়া গেল। বেচারা ব্যথায় অস্থির হইয়া উঠিতে পারিতেছিল না। বামুন বাড়ীর মা ঠাকরুণ তখন আসরের গল্প জমাইতেছিলেন। তাহার বধূটীকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া ক্ষিপ্তের মত ছুটিয়া আসিয়া ঘড়াটী তুলিয়া লইলেন। তাহার পর ভূমিশায়ী বধূর প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আহা আহা! ঘড়াটা ভেঙ্গে ফেলবে। আমার কাশীর ঘড়া গা। দু যায়গায় টোল খেয়ে গেল। কোথা থেকে হাড় হাবাতের মেয়ে এসে জিনিসপত্র সব তছ্‌নছ্‌ করে ফেললে গা!"

এই সময় ক্ষ্যান্তও বাড়ীর সব কাজ সারিয়া গা ধুইবার জন্য ঘাটে আসিয়াছিল। বামুন বাড়ীর এই মেজবউটীকে সে অন্তরের সহিত ভক্তি করিত। ভোর চারিটার সময় উঠিয়া আধ অন্ধকারে মিত্রদের বিস্তীর্ণ বাঁধা' ঘাটের বিভিন্ন স্থানে বসিয়া ভদ্র ঘরের ও চাষী বধূরা যখন বাসন মাজিত তখন কেবলমাত্র ঐ বামুন বাড়ীর মেজবউ তাহাকে চাষীর মেয়ে বলিয়া ঘৃণা না করিয়া তাহার সহিত কথা বলিত। তাহাকে নিজের দুঃখের কথা বলিত ও তাহার দুঃখের কথা শুনিত। নিজেদের দুঃখের কথা পরস্পরকে জানাইয়া, তাহারা অনেকটা শান্তি লাভ করিত। এই বধূটীরও অবস্থা কতকটা ক্ষ্যান্তরই মতন। সে কিছু লেখাপড়াও শিখিয়াছে। একজন "ডেপুটী" নাকি তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু কুলীনের কৌলিন্য রক্ষার জন্য তাহাকে এইখানে বিবাহ দেওয়া হয়।

বধূটী পড়িয়া যাইবার পর কেহ তাহাকে তুলিল না দেখিয়া, ক্ষ্যান্ত তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহাকে উঠাইতে উঠাইতে অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, "মা ঠাকরুণ! একে আগে তুলুন, তারপর বকবেন। এর লেগেছে দেখছেন না?"

ক্ষ্যান্তর কথা কয়টা শেষ করিতে না দিয়াই, বামুন বাড়ীর মা ঠাকরুণ বলিয়া উঠিলেন, "বেশ হয়েছে, মরল না কেন?" তাহার পর একটা বিশেষ ভ্রূভঙ্গি করিয়া পুনরায় বলিলেন, "আমার কাশীর ঘড়া তুবড়ে যাবে, তা না হলে, এই ঘড়ার বাড়ি দিতাম বসিয়ে—"

ক্ষ্যান্তর শাশুড়ীও সেখানে উপস্থিত ছিল। ক্ষ্যান্তকে এইরূপ কথা বলিতে দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার গালে একটি ঠোনা মারিয়া বলিল, "আ মর, বামুনদিরও মুখের উপর কথা। তাহার পর বামুন ঠাকরুণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঘোর কলি মা ঠাকরুণ, ঘোর কলি। বউ শাশুড়ীকে চোখ রাঙায় মা ঠান্।"

বামুনদি বেশ গর্ব্বের সহিত উত্তর করিলেন, "তোমরা ছোটলোক, তাই। আমাদের ভদ্রলোকের ঘরের হলে, অমন বউএর পিঠের চামড়া তুলে ফেলে দিতাম না! এই উত্তর করেছিল বলে, আমার ছোট-বউটাকে বেলুন-পেটা করলুম সেদিন।"

শব বিষ গলাধঃকরণ করিতে করিতে বামুন বাড়ীর সেই মেজ-বউটী ক্ষুব্ধ মনে নদীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পিঠটা ব্যথায় তখনও তাহার টন্ টন্ করিতেছিল। কথা বলিতে বলিতে, হঠাৎ তাহার দিকে লক্ষ্য হওয়ায় বামুন ঠাকরুণ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "হালা! ওধারে কি দেখছিস্? ছোঁড়াগুলি নৌকা করে যাচ্ছে, না। যা পাত্তাকো'য় চান করগে যা।"

বধূটী থতমত খাইয়া বলিয়া উঠিল, "কই মা, আমি ত কিছু দেখি নি।"

বামুন ঠাকরুণ আরও চটিয়া উত্তর করিলেন, "তবে রে আবার ঢং। আমি বুড়ো চোখে দেখতে পাচ্ছি, উনি কচি চোখে দেখতে পাচ্ছেন না!"

ইহার পর ছুটিয়া গিয়া, ঐ বধূর গালে একটা ঠোনা মারিতে গিয়া, অসাবধানে, পাশের অপর এক বাড়ীর বধূকে ঠোনা মারিয়া বসিলেন। সেই বধূটীর শাশুড়ীও সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। নিজে শত দোষ করিলেও, লোকে অপরের একটি দোষও সহ্য করিতে পারে না। তিনি নিজে যাহাই করুন, অপরে বিনা দোষে তাঁহার বউকে ঠোনা মারিবেন কেন? তিনি তিক্তস্বরে বলিলেন, "আ, মর মাগী, মারবি নিজের বউকে মার। অপরের বউকে মারিস কেন? আমার বউকে আমি মারতে জানি না?"

ঝঙ্কার দিয়া কথা কয়টা বলার পর, তাহার রাগটা বামুন ঠাকরুণের উপর হইতে একেবারে নিজের বধূর প্রতি পড়িল। তিনি বধূকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "হালা, জোট বেঁধে দেখা হচ্ছিল। তাই তোর ও-বাড়ীর মেজবউয়ের সঙ্গে এত ভাব। যা বাড়ী যা।"

দূরে নদীর উজান স্রোত বাহিয়া দুইখানি ছিপ-নৌকায় একদঃ ছেলে পাল্লা দিয়া দাঁড় টানিতেছিল। ঘাটের ভিড় তাহাদের লক্ষ্যে বাহিরে ছিল। বধূরাও তাহাদের দেখে নাই। শ্বশ্রূঠাকরুণদের কথায় প্রথম তাহারা চাহিয়া দেখিল, গৌরকান্তি একদল ছেলে সবেগে পাল্লা দিয়া দাঁড় টানিতেছে। আর পাশাপাশি দুইখানি ছিপ-নৌকা বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। উৎক্ষিপ্ত জলকণা তাহাদের সহাস্য মুখ ও উৎফুল্ল চোখ বোঝাই করিয়া দিতেছিল। বাম হাতে চোখের জল মুছিতে মুছিতে, নদীর বুক চিরিয়া, তাহারা ডান হাতে দাঁড় টানিতেছে, ছপ্ ছপ্ ছপ্। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বধূগণ মুখ ফিরাইয়া লইল।

এগার

তুলসীমঞ্চে মাটীর দীপটী জ্বালিয়া দিয়া, একটি প্রণাম করিয়া, ক্ষ্যান্তমণি দেবতার স্থানে হৃদয়ের বেদনা জানাইয়া বলিতে যাইতেছিল, "ঠাকুর!" হঠাৎ সে ফিরিয়া দেখিল, স্বামী তাহার চুল ধরিয়া বলিতেছে, "শালী!"

মোড়লদের ওখান হইতে গাঁজা খাইয়া বাদল ফিরিতেছিল। পথে মাতার মুখে স্ত্রীর কীর্ত্তির কথা শুনিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারে নি। মস্তিষ্ক তখনও তাহার সুস্থ হয় নাই। গাঁজার ঝোঁকে অসংলগ্ন ভাবে সে একবার বলিল, "কি? নায়েবের সঙ্গে প্রেম!" তাহার পর ছুটিয়া গিয়া আধ ঘণ্টা ধরিয়া কিলচড় লাথি সুবিধামত যত পারিল মারিল। তাহার পর গলা ধাক্কা দিতে দিতে ক্ষ্যান্তকে বাটীর বাহির করিয়া দিয়া আসিল। আজিকার প্রহারটা ক্ষ্যান্তমণির সহ্য হইতেছিল না। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টা যেন সমস্ত বিশ্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ইহার চেয়েও কঠিন অত্যাচার সে সহ্য করিয়াছে। কিন্তু

আজিকার এ অত্যাচার অনুপাতে তত কঠোর না হইলেও, সে আর তাহা সহ্য করিতে পারিল না। এ ত তাহার অপমান নয়, এ যে তাহার নারীত্বের অবমাননা। যাহাকে আশ্রয় করিয়া তাহার এই নারীত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে সেই যদি তাহাতে আঘাত দেয়, ত তাহা শেলের মতই লাগে। সে সোজা মুখুয্যেদের বড় পুকুরের পাড়ের উপর বাঁশ বাগানটা যেখানে খুব ঘন হইয়া গিয়াছে, তাহার কাছে গিয়া বসিয়া পড়িল। পাড়ের কিছু দূরে হিরুর কাছারী বাড়ী। অভ্যাস মত এই দিনও রাত্রি-ভোজনের পর, এই পাড়ের নীচেই একটা পরিষ্কার যায়গায় বসিয়া হিরু বাঁশী বাজাইতেছিল। উপরে কান্নার শব্দ শুনিয়া সে ছুটিয়া আসিল।

"একি, ক্যান্ত? তুই এখানে!" বলিয়া হিরু তাহার কাছে বসিল।

সামনে হিরুদাকে দেখিয়া তাহার সব বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, "হাঁ হিরুদা—" বলিয়া সে দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিল। ক্যান্তর সমস্ত দেহটা হিরুর বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছিল। ক্যান্তর দেহের স্পর্শ হিরুর অঙ্গে ও অপাঙ্গে একটা শিহরণ আনিয়া দিল। একবার সে মনে করিল, ক্যান্তকে সে সরাইয়া দেয়। কিন্তু এমন নিশ্চিন্ত ভাবে সে হিরুর বুকের উপর মুখ রাখিয়াছিল যে হিরুর তাহাকে সরাইতে সাহস হইল না।

ক্যান্তর মুখখানি দুই হাতে ধরিয়া নিজের মুখের কাছে তুলিয়া আনিয়া হিরু বলিল, "একি রে?" জোছনার স্পষ্ট আলোকে ক্যান্তমণির মাথায় জমাট রক্তের চাপ দেখা যাইতেছিল।

ক্যান্ত আর একবার কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "আজ শুধু শুধু মারলে হিরুদা!" হিরু উত্তর করিল না। অনেকক্ষণ ক্যান্তর মুখের দিকে সে চাহিয়া থাকিল। তাহার মন ক্রমেই বেদনা-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে ক্যান্তকে একেবারে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া—

হিরু বলিল, "চল আমরা একদিকে চলে যাই। যেখানে সমাজ নেই। মানুষের বাস বিরল, সত্যকার ভালবাসায় বা প্রেমে বাধা দিবার কেউ নেই। হিংসা দ্বেষ কম। এমন একটা বিজন দেশে, জংলী জায়গায়, আমরা চলে যাই।"

এ কথা ক্ষ্যান্ত অনেকবার হিরুর মুখে শুনিয়াছে। কিন্তু সে রাজী হয় নাই। আজ কিন্তু হিরুকেই তাহার সব চেয়ে আপনার বলিয়া বোধ হইল। "চলো যাব—" এ কথা ক্ষ্যান্ত একবারও ভাবে নাই। কিন্তু এইটিই আজ তাহার সব চেয়ে সহজ সরল ও উচিত পথ বলিয়া মনে হইল। তাহার নারীত্ব আজ ক্ষুব্ধ। সে আজ সহ্যের সীমার বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। বাংলা দেশের অনেক নির্য্যাতিতা মেয়েরা এমন এক একটী অবস্থায় আসিয়া পড়ে যে তখন তাহাদের নিস্তার পাইবার তিনটি মাত্র উপায় থাকে। কেহ কেহ মনঃক্ষুব্ধ অবস্থায় থাকিয়া শেষে যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগগ্রস্ত হইয়া জীবন লীলা শেষ করে। কেহ আত্মহত্যা করে, কেহ বা না ভাবিয়া দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া সকল মায়া বন্ধন ছিঁড়িয়া ঝোঁকের মাথায় বাহির হইয়া আসে। পরে ফিরিবার পথ না থাকায়, বাঁচিয়া মরিয়া থাকে। ক্ষ্যান্ত ছিল শেষোক্ত ধরণের মেয়ে। তাহার পর মেয়েরা যখন ভালবাসে, তখন প্রাণ দিয়াই ভালবাসে। ছেলেদের মধ্যে থাকে বকামীর ভাগই বেশী। ক্ষ্যান্তর কপাল ভাল। সে হিরুর মত একজন সত্যকার বন্ধু পাইয়াছিল। হিরুকে সে বিশ্বাস করিত।

কি ভাবিয়া ক্ষ্যান্ত বলিল, "যাবে, সেই ভাল। চল হিরুদা। আর ভাবতে পারি না হিরুদা, চল।"

উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া, সকল বাঁধন ছিঁড়িয়া, অন্ধকারের পথে দ্রুত বিলীন হইয়া গেল। পিছনে পড়িয়া রহিল তাহাদের কয়দিনের সুখ দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত ক্ষ্যান্তর শ্বশুর বাড়ীর দেশ মহুয়া গ্রাম।

বার

সাবেক কালের জমিদার বাড়ী। জমিদারীর বহু অংশ আজ নীলামে উঠিলেও জমিদার বাড়াটী ভগ্নাবস্থায়ও তাহার পূর্ব্ব গৌরবের পরিচয় দিতেছিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বাহিরের ঘরে বসিয়া নওগাঁর জমিদারের ছেলে হরিশ, পাড়ার শিরোমণি ঠাকুর ও নূতন ডেপুটী বন্ধু নরেনের সহিত গল্প করিতেছিল। তক্তপোষের উপর সাবেককালের গালিচা তাকিয়া প্রভৃতি পাতা, উপরে ভারি কাঁঠি বাঁধা কাঁচের ঝাড় লণ্ঠন ঝুলিতেছে। চৌকির সামনে আধুনিক কয়েকখানি কেদারা। বর্ষাকাল। মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়িতেছিল আবার থামিয়া যাইতেছিল।

একখানি কেদারার উপর শিরোমণি ঠাকুর বসিয়াছিলেন। হঠাৎ বৃষ্টি আসিয়া পড়ায় তিনি আর উঠিতে পারিতেছিলেন না। শিরোমণি ঠাকুর স্বভাব সুলভ শুদ্ধ ভাষায় বলিলেন, "দেখতো নরেন, গবাক্ষপথে হস্ত প্রসারিত করে বৃষ্টি পতিত হচ্ছে কি না ?"

শিরোমণির বিদ্যার দৌড় নরেনের ভালরকমই জানা ছিল। বিদ্যার চেয়ে বিদ্যার অভিমানই ছিল তাঁর বেশী। এমন অনেক উপদেশ তিনি অপরকে দিতেন, যার ধার দিয়াও তিনি কখনও যান্ নি। অন্তরের দৈন্য লোকে বাহিরের ঐশ্বর্য্য দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করে। তাই তাহার ভাষার প্রতি শব্দের মধ্যেই তিনি তাঁহার পাণ্ডিত্য জাহির করিবার চেষ্টা করিতেন।

শিরোমণিকে লইয়া নরেনের একটু তামাসা করিবার ইচ্ছা হইল। তাঁহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া সে বলিল, "আচ্ছা ঠাকুর, কাল যে ভেট্‌কী মাছটা নিয়ে যাচ্ছিলেন, সেটা কি বাড়ীর জন্য ?"

কথাটা শুনিয়া শিরোমণি ঠাকুর চমকাইয়া উঠিলেন। বাহিরে

তিনি বলিতেন, মৎস্য মাংস ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ ও অখাদ্য। পতিত· ব্রাহ্মণেরা উহাতে আসক্ত থাকে। কিন্তু গোপনে তিনি মাঝে মাঝে উহার সদ্ব্যবহার করিতেন। একটু আমৃতা আমৃতা করিয়া তিনি উত্তর করিলেন, "আঁরে বাবাজীবন! বাড়ীতে একটা বিড়াল শিশু আছে কিনা? জান ত আমি আমিষ ভক্ষণ করি না।"

নরেনও ছাড়িবার পাত্র নয়। পাড়ার খবর সে একটু বেশী রাখিত। বুজরুকি জিনিষটা তার সহ্যের বাহিরে ছিল। তাহার মতে গুরুজনকে ভক্তি করিতে হইবে যতটা করা উচিত ঠিক ততটা। তাহার বেশীও নয়, কমও নয়। উচিত কথা বলিতে সে ছিল ওস্তাদ। একটু শ্লেষের সহিত পণ্ডিতি ভাষার অনুকরণে সে বলিল, "সে কি ঠাকুর! আপনার বাটীর পাশ দিয়া আজ প্রত্যুষে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, গন্ধে চারিদিক উদ্ভাসিত করে মৎস্যাদি উঠানে রন্ধন হচ্ছে। বহু আত্মীয় কুটুম্বাদির সমাবেশ হয়েছে।'

শিরোমণি ঠাকুর মুস্কিলে পড়িলেন। কন্যা ভ্রাতা সহ জামাতা আসিয়াছিল। সেই জন্য তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও গৃহিণীর প্রবল ইচ্ছায়, প্রকাশ্য উঠানে কয়েকটী ভেট্‌কী মাছ রন্ধন হইয়াছিল। খবরটি এতদূর আসিয়া পড়িবে, তাহা তিনি আশা করেন নাই। [illegible] শিষ্য-সমাজও ব্যাপারটা জানিয়া ফেলে, এই ভয়ে একটু ভীত হ[illegible] পড়িলেন। কিন্তু তিনি দমিবার পাত্র নন। ভক্তি আসিবার আগেই তিনি শিষ্যের মস্তকে পা তুলিয়া দিয়া থাকেন, মুখের জোরেই তিনি শিষ্য-সমাজে সমাদৃত। তিনি নিঃসঙ্কোচে উত্তর করিলেন, "ও, বাবাজীবনের ওধারে গমন হয়েছিল বুঝি? আজ যে মৎস্যযজ্ঞের আয়োজন হয়েছে। দ্বাদশ বৎসর অন্তর এ যজ্ঞ মদ্ গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। তা বাবা প্রসাদাদি গ্রহণ করে আসবে।"

শিরোমণির কথায় হরিশ ও নরেন উভয়েই হাসিয়া উঠিল।

এমন সময় ক্ষ্যান্তর শ্বশুর রাধু মণ্ডল ও তাহার ছেলে বাদল, ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "দোহাই হুজুর মোদের ঘর রক্ষা করুন।"

হরিশ বলিল, "কি চাও।"

বাদল উত্তর করিল, "আপনার রেইয়ত সদানন্দের ছেলে হিরু, আমার ইস্ত্রীকে বার করে নিয়ে এসেছে। আপনারা দয়া না করলে—"

শিরোমণি ঠাকুর গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "বেরো হারামজাদা বেটারা, বেরো। ও সব ছোটলোকের কথায় থেকো না, খোকাবাবু।"

"কি বলেন ঠাকুরদা, এত বড় একটা অত্যাচার এ যুগেও হবে!"

শিরোমণি ঠাকুর বলিলেন, "ওতো আখছার হচ্ছে, খোকাবাবু। সময়স্য বিচিত্রা গতি।"

না এর একটা বিহিত করবই, বলিয়া জমীদারের ছেলে হরিশ একটা হাণ্টার চাবুক দেওয়াল হইতে পাড়িয়া লইল।

তাহার পর বলিল, এস নরেন। আমরা এর বিচার করব।

নরেন নিজে বিচারক। তাই বিচারের মোহ তাহার ছিল না। নূতন ডেপুটী হইলেও বিচার সে বোঝে। হরিশের হাতের চাবুকটী দেখাইয়া সে বলিল, "বিচারের আগেই যখন তুমি শাস্তির বন্দোবস্ত করেছ, তখন বিচারের নামে তুমি অবিচারই করবে। আচ্ছা চল তো, দেখা যাক্।" ইহার পর শিরোমণির জন্য অপেক্ষা না করিয়া দুজনে দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

তাহারা চলিয়া গেলে, শিরোমণি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহাকে না ডাকিয়া তাহারা চলিয়া যাওয়ায় তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে তিনি ভাবিলেন, তাই ত ছেলে মানুষ নারীর উপর অত্যাচারের কথা শুনিয়াছে। তারপর আবার অল্প বয়স্কা নারী, আবার সুন্দরীও হইতে পারে। মনে মনে একটু ভাবিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, এক্ষেত্রে চাক্ষুষ দর্শনই শাস্ত্র সম্মত। বুড়া হইলেও তিনি চক্ষু বিহীন ছিলেন না। তিনিও তাহাদের অনুসরণ করিলেন।

তের

বহুদিন পরে হিরু নিজ গৃহে আসিয়াছে। হিরুর পিতা, চাকর ফাগুয়ার জিম্মায় বাড়ী রাখিয়া দোকানের জন্য কলিকাতায় সওদা করিতে গিয়াছে। রাত্রির অন্ধকারে হিরু ও ক্ষ্যান্তর আগমন কেহ টের পায় নাই। হঠাৎ ফাগুয়া খবর দিল যে, জমীদারের ছেলেকে নিয়ে ক্ষ্যান্তর শ্বশুর বাড়ীর সকলে এই দিকেই আসিতেছে।

ক্ষ্যান্তর মুখ ভয়ে শুকাইয়া গিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে অনুশোচনায় তাহার মন দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল। ঝোঁকের মাথায় সে চলিয়া আসিয়াছে। এখন সে ফিরিয়া আসিতে চায়। কিন্তু ফিরিবার উপায় সে দেখিতেছিল না। কি এক অজানা আশঙ্কায় থাকিয়া থাকিয়া সে শিহরিয়া উঠিতেছিল। চলিয়া আসার যুক্তি-সঙ্গত কোন কৈফিয়ৎই তাহার মনে আসিতেছিল না। যেখান হইতে সে চলিয়া আসিয়াছে। সেখানে আর তাহার স্থান নাই। এখানেই বা সে কাহার কাছে থাকিবে। যে হিরুদা তাহাকে এত ভালবাসে, তাহার কলঙ্কের বোঝা হইয়া থাকিতে তাহার মন চায় না। সে আর ভাবিতে পারিতেছিল না। সে মনে করিয়াছিল যে, কুলটা বোধে তাহাকে কেহ আর চাহিবে না কেহ তাহার খোঁজ করিবে না। কিন্তু এক্ষণে ফাগুয়ার মুখে তাঁহা[illegible] আসার কথা শুনিয়া তাহার নূতন ভাবনা উপস্থিত হইল। সে ভীত অবস্থায় অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিল, "কি হবে হিরুদা! ওরা যে এসে পড়ল।" এতক্ষণ হিরুও ক্ষ্যান্তর মত অনুতপ্ত হইয়া ভাবিতেছিল, কাযটা ভাল হয় নাই। সে ভাবিতেছিল, কি উপায়ে আবার ক্ষ্যান্তকে তাহার পূর্ব্বস্থানে রাখিয়া আসিতে পারা যায়। কিন্তু উহাদের এই হঠাৎ আগমনে সেও ক্ষ্যান্তর মত ভয় পাইল। কিন্তু সে যদি সাহস হারায় ত ক্ষ্যান্তর অবস্থা কি হইবে। অনেকক্ষণ ভাবিয়া হিরু বলিল, "না, লক্ষীটি আমার। তুই

যাসনি। তোকে যেতে দেব না। ওরা তাহলে তোরে একেবারে মেরে ফেলবে। তোর আর আমার এই পুণ্য সম্বন্ধ কেউ বুঝবেও না, আর বিশ্বাসও করবে না।"

হিরুর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই, বাহির হইতে জমীদারের ছেলের ডাক আসিল, "এই, কে আছিস্!"—"আজ্ঞে" বলিয়া হিরু বাহির হইয়া আসিল। হরিশ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এর স্ত্রীকে নিয়ে এসেছ?"

জমীদারের ছেলের কথায় হিরু সত্য কথাই বলিতে যাইতেছিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, আজ যদি উহারা ক্ষ্যান্তকে লইয়া যাইতে পারে—উঃ কি শাস্তিই না দিবে। তপ্ত লৌহ শলাকার আঘাত, উপবাস, কাঁচা কঞ্চির চাবুক, নখাগ্রে বেল কাঁটা ফুটাইয়া দিয়া—আর সে ভাবিতে পারিল না। বলিয়া ফেলিল, "হুজুর, ও আমারই স্ত্রী। ওদের সব মিছে কথা!"

জমীদারের ছেলে ফাঁপরে পড়িলেন। একটু ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "নিয়ে আয় তোর ইস্ত্রীকে। আমি নিজে পুছবো।" ক্ষ্যান্তকে ডাকা হইল। হিরুর কথা শুনিয়া সে চমকাইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সেও তাহার মতন অনেক কথাই ভাবিয়াছিল। একটা দারুণ ঘৃণা ভয় ও লজ্জা তাহার মনটাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কি ভাবিয়া সেও ঘোমটার ভিতর হইতে ক্রন্দনের সুরে বলিল, "হিরু দাসের কথাই ঠিক।"

ক্ষ্যান্তর কথা শুনিয়া বাদল সরোষে বলিয়া উঠিল, "আজ্ঞে না, সব মিছে কথা। বেটীর বাপকে দোগাছিয়া গ্রাম থেকে ডাকিয়ে আনিয়ে জিজ্ঞাসা করুন হুজুর।"

শিরোমণি এইবার সুবিধা পাইয়া সরোষে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দেখছ ত। বল্লাম খোকাবাবু, এই ছোট লোকদের কথায় থেক না। দেখ আবার কজনা বেটীর বাপ হয়ে আসে।" কথা কয়টা বলিয়া শিরোমণি ঠাকুর ক্ষ্যান্তর প্রতি একবার তীক্ষ্ণ কটাক্ষে চাহিলেন।

তাহার পর তাহার শম্বুক কৌটা হইতে কয়েক টীপ নস্য লইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বিষ্টু বিষ্টু সদা বিষ্টু!" যেন এই [illegible]ার দর্শন জনিত অনেকখানি পাপ তাঁহার ক্ষয় হইয়া গেল।

জমীদারের ছেলে কোন রায় দিতে পারিল না। ঠিক হইল মেয়েটীর বাপ ও তাহার গ্রামের মোড়লদের ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে।

কিন্তু বাদল তাহার স্ত্রীকে হিরুর বাড়ীতে আর এক রাত্রিও রাখিতে চাহিল না। সে অনুনয় করিয়া বলিল, "হুজুর, ও মণ্ডবপুরের রাজাবাবুদের পেয়ারের নায়েব। রাতারাতি আবার কোথায় চালান করে দেবে। ওর বাপ না আসা পর্য্যন্ত না হয় আপনার বাড়ীতে রাখুন।"

কথাটা শুনিয়া সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "এঁ্যা! রাজাবাবুদের নায়েব! হিরু অনেক দিন দেশ ছাড়া। কেহ তাহার খবর রাখিত না। কাহার কথা বিশ্বাস করা উচিত ঠিক বোঝা গেল না।

বিচার করিতে আসিয়া, একটী মেয়েকে কাহার বধূ কে জানে,— সে নিজ বাটীতে লইয়া আসিবে, এরূপ একটা চিন্তা হরিশ কল্পনা করিতে পারিল না। তাহার কান ও মুখ রাঙা হইয়া গেল। সে বলিল, "না বাপু, আমার বাড়ীতে নয়।"

ছোট লোকের মেয়ে যে দেখিতে এমন সুন্দর হইতে পারে তাহা শিরোমণি ঠাকুর ভাবে নাই। তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "তা নয় আমার বাড়ীতে থাকতে পারে।"

হিরু অনেক দিন দেশ ছাড়া হইলেও শিরোমণি ঠাকুর সম্বন্ধে অনেক কথাই সে জানিত। সে আপত্তি করিয়া বলিল, "না খোকাবাবু, আপনার বাড়ীতে থাকতে পারে, কিন্তু শিরোমণির বাড়ীতে আমি রাখতে রাজী নই। আমি জানি, ক্ষ্যান্ত কোন অবস্থাতেই আত্মরক্ষার্থে অক্ষম নয়, কিন্তু জেনে শুনে খামকা কেন সে অপমান বরণ করবে। আমি ওঁকে জানি।"

এরূপ কথা তাঁহাকে কেহ বলিতে পারে, শিরোমণি তাহা কখনও ভাবিতে পারেন নি। তিনি প্রথমটা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। পরে ক্ষিপ্ত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি বেল্লিক! অর্ব্বাচীন! আমি ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ, আমাকে অবিশ্বাস! স্বপল্লীতে প্রাপ্ত হলে গাত্র হতে চর্ম্ম স্খলিত করে নিতাম।"

ক্রোধে শিরোমণি ঠাকুর কাঁপিতে ছিলেন। হরিশ ও নরেন তাঁহাকে বুঝাইয়া অনেকটা শান্ত করিল। কতকটা শান্ত হইয়া শিরোমণি আবার বলিতে লাগিলেন, "দেব দ্বিজে ভক্তি হারিয়ে বেটাদের সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। আগে এক বিঘে জমীতে বেটাদের দশ আড়ি ধান হত, এখন দেব দ্বিজে ভক্তি হারিয়ে সেখানে দু আড়ি ধানও হয় না, তবু বেটাদের আক্কেল হয় না।"

শিরোমণি ঠাকুর আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় ক্ষ্যান্তর বাপ রাধু মণ্ডল ও তাহার গ্রামের মোড়লরা সেখানে উপস্থিত হইল। তাহারা পূর্ব্বেই খবর পাইয়াছিল। খবর পাওয়া মাত্র তাহারা এই ছয় ক্রোশ হাঁটিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে।

ক্ষ্যান্তর বাপ ও মোড়লরা রক্ত চক্ষু হইয়া বলিয়া গেল, "মেয়েটা বাদলেরই ইস্ত্রী। হিরু দাসের সঙ্গে পালিয়েছিল।" সকলে অবাক হইয়া বলিয়া উঠিল, "ঘোর কলি।" শিরোমণি ঠাকুর একবার আড় চোখে ক্ষ্যান্তর দিকে চাহিয়া, যুক্ত হস্তে আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "নারায়ণ গতির্মম।"

প্রমাণ হইবা মাত্র বাদল তাহার স্ত্রীর কেশগুচ্ছ ধরিয়া টানিতে টানিতে বাহিরে আনিয়া বলিল, "আগে হুজুর; বেটীকে নিয়ে যাই। মাঝে মাঝে প্রবল মুষ্ট্যাঘাত ক্ষান্তমণির পিঠে পড়িতেছিল, গুম্ গুম্।

ভিড়ের মধ্য হইতে কে বলিয়া উঠিল, "অমন বৌকে আবার ঘরে যায়গা দিস্।" উত্তর আসিল, "বেটীকে কিনতে সাড়ে সতের গণ্ডা পণ লাগছে বাঠাকুর। এখনও শুধতে নারছি। চল বেটি—"

চৌদ্দ

গ্রামের জন সংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেকের উপর লোক [illegible]দিন বাদলদের বাড়ীতে ভিড় জমাইয়াছিল। উঠানটা মেয়ে ও [illegible]ে বোঝাই হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া রাস্তায়ও লোক জমিয়াছিল বিস্তর, কয়েকটা ছেলে বেড়ার ওপারে নারিকেল গাছ বাহিয়া উঠিয়া বাড়ীর ভিতর উঁকি দিতেছে। একটি ছেলে আবার বেড়া টপকাইয়া আসিয়া ভিতরকার একটা সজিনা গাছের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল। পথ চলিতে চলিতে পথিকগণ, অভ্যাসমত থমকাইয়া দাঁড়াইয়া মৃৎ-প্রাচীরের ওপারে নারী নির্য্যাতনের কারণ নির্ণয় করিবার প্রয়াস পাইতেছিল।

বাড়ীর উঠানে [illegible] সেই যে আছড়াইয়া পড়িয়াছে, আর সেখান হইতে তাহাকে উঠা[illegible] সর্ব্বাঙ্গে তাহার রুধির ধারা। কপাল, হাঁটু ও [illegible]াতে কয়েকটা কাল্‌শিরার দাগ। মুক্ত কেশ দিয়া কোন রকমে মুখ ঢাকিয়া সে উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিল।

লোকের ভীড় ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে দেখিয়া ক্ষ্যান্তর শাশুড়ী মার-মুখী হইয়া জনতাকে তাড়া করিতে করিতে বলিল, "মর যত হুতোম প্যাঁচার দল। তোদেরও ঘর একদিন পুড়বে। ঝি বৌ নিয়ে সকলকেই ঘর করতে হয়। মজা দেখ্‌তে নেগেছে সব। বেরো মুখপোড়ারা।"

তাড়া খাইয়া উঠানের ও আশেপাশের জনতা দৌড়াইয়া পিছাইয়া বেড়ার ওপারে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষ্যান্তর শাশুড়ী তাহাদের পিছন পিছন তাড়া করিয়া একেবারে তাহাদের বাড়ীর বাহির করিয়া দিয়া আসিল।

জনতা সরিয়া গেলেও ক্ষ্যান্ত উঠিল না। বাদল কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ক্ষ্যান্তর শ্বশুর বলিল, "নিয়ে যা, ঘরের ভিতর টেনে। মরদ বাচ্চা নস্ তুই! দেখ্‌ছিস্ কি দাঁড়িয়ে? বনের বাঘভাল্লুক, চোর

ডাকাত বশ হয় আর একটা বৌ বশ হয় না, ও মেয়ে মানুষকে নাই দিলেই মাথায় উঠবে। বেউগ্গে মাগি—"

ক্ষ্যান্ত এতক্ষণ চুপ করিয়া মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল। পৃথিবীটা নড়িয়া চড়িয়া মোচড় খাইয়া, কাঁপিয়া যেন তাহাকে লইয়া ঘুরপাক খাইতেছে। শেষের কথা দুইটা তাহার কানে যাইবামাত্র সে একবার রুদ্ধ আক্রোশে চোখ তুলিল। কিন্তু অদূরে দণ্ডায়মান কৃষক বধূগণের প্রতি নজর পড়িবামাত্র, সে দুই হাতে বুকটা চাপিয়া ধরিয়া পুনরায় মাথা নিচু করিল। তাহার বলিবার আর কিছু ছিল না।

বাপের কথায় বাদল ছুটিয়া আসিয়া ক্ষ্যান্তর চুলের মুঠি ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিয়া দাওয়ায় তুলিল ও তাহার পর তাহাকে ঘরের ভিতর ঠেলিয়া দিল। ক্ষ্যান্ত বাধা দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মুখে কিছু বলিল না।

ক্ষ্যান্তকে বাদলের সহিত ধস্তাধস্তি করিতে দেখিয়া ক্রোধে বাদলের বাপ বলিল, "ছুড়ো হয়েছে, দে ছুড়োমিপানা বার ক'রে। নিয়ে যা ঠ্যাঙ্ ধরে ভিতরে টেনে।"

বেচারা বাদল। কতটুকু ক্ষমতা তার। নগদা পয়সার লোভে নূতন "মিলে" চাকুরি লওয়ায়, সকাল বিকাল মেটে রাস্তা দিয়া, মাইল তিন দৌড়াদৌড়ির ফলে তাহার স্বাস্থ্য আগে হইতেই ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। ইদানিং চেহারা হইয়াছিল তাহার কতকটা খড়কে কার্ত্তিকের ন্যায়। যেটুকু ছিল গাঁজা ও তাড়ী খাইতে শিখিয়া তাহাও সে শেষ করিয়াছে। ক্ষ্যান্তকে জোর করিয়া তুলিতে গিয়া, তাহাকে লইয়া সে হুমড়ী খাইয়া চৌকাটের উপর পড়িয়া গেল। মুখটা চৌকাঠে ঠুকিয়া যাওয়ায় ক্ষ্যান্তর ঠোঁট কাটিয়া অনেকখানি রক্ত সেইখানে পড়িল। কিন্তু কাহারও সেদিকে দৃষ্টি নাই। তুচ্ছ একটা ব্যাপার বৈত নয়। এই ভাবে পড়িয়া যাওয়ায় আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বাদল ক্ষ্যান্তকে গড়াইয়া ঘরের ভিতর

অনেকটা দূর ঠেলিয়া দিল। তাহার পর পুরুষের পৌরুষত্ব দেখাইবার জন্য একবার পুরুষ-সিংহের ন্যায় বুক চিতাইয়া দরজার সামনে দাঁড়াইল, যেন সে বুঝাইয়া দিতে চায় যে, সে পুরুষ, কাপুরুষ নয়। বৌ শায়েস্তা রাখিতে সেও জানে!

কিছুক্ষণ সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বাদল তাহার কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া লইল। তাহার পর সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতর হইতে খিল আঁটিয়া দিল।

ঘরের ভিতরও ক্ষ্যান্ত একই ভাবে মুখ গুঁজিয়া মেঝের উপর পড়িয়া রহিল। কাহাকেও মুখ দেখাইতে আর তাহার ইচ্ছা নাই। অত্যাচারের ভয়ে আজ সে আর ভীত নয়। অত্যাচারের সঙ্গে যেন সে মিতালি পাতাইয়া লইয়াছে। সে নিজেকে মেঝের উপর এলাইয়া দিয়া নূতন কোনও এক আঘাতের অপেক্ষায় পড়িয়া রহিল। কাতরাণি ও চেঁচামেচির পালা শেষ করিয়া শেষের দিকে ছাগ শিশুগণ যেমন যূপকাষ্ঠের ভিতর নিশ্চিন্ত মনে গলা দিয়া অজানা আঘাতের অপেক্ষায় চুপ করিয়া শুইয়া থাকে।

ঘরে খিল আঁটিয়া ঘরের ভিতর মুখ ফিরাইতেই বাদল দেখিল, ক্ষ্যান্ত চৌকির পাশে উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। মস্তকের ও পৃষ্ঠের বসন নাই। তাহার ছিন্ন মলিন বস্ত্রখানি তাহার সমস্ত দেহখানি আর ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। কাপড়খানি টানা-টানিতে ছিঁড়িয়া যাওয়ায় তাহার বক্ষ ও স্কন্ধের কিয়দংশ অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

বাদল তাহাকে সজোরে দুই-চারিটা লাথি ও কিল মারিয়া মনের ঝাল মিটাইবে মনে করিয়াছিল। কিন্তু সে তাহা পারিল না। এমন করিয়া ক্ষ্যান্তকে সে কখনও দেখে নাই।

এতদিন ক্ষ্যান্তকে সে নিকটে পাইয়াছিল রাত্রির নিভৃত অন্ধকারে, শয্যার মধ্যে। ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া গভীর রাত্রে ক্ষ্যান্ত শয়ন করিতে

পাইত ; আর শ্বশুর শাশুড়ীর উঠিবার বহু পূর্ব্বে এক প্রহর রাত্রি থাকিতে তিরুর অগোচরে সে উঠিয়া আসিত—চাষী সমাজে যেমন নিয়ম। দিনের আলোয় এত নিকটে সে তাহাকে কখনও দেখে নাই। এ যেন নিশীথ শয়নের সেই ক্ষ্যান্ত নয়। দিনের আলোয় তাহার সত্যকার রূপ উথলাইয়া পড়িতেছিল। তাহার সুগঠিত দেহ, তাহার কম্পমান মসৃণ বক্ষ বাদলকে পাগল করিয়া দিল।

যে জিনিষ সহজলব্ধ তাহার দিকে বেশীক্ষণ লোকের আকর্ষণ থাকে না। কিন্তু যাহা দূরে সরিয়া যায়, সহজে যাহা ধরা যায় না, তাহার দিকেই লোকের আকর্ষণ হয় বেশী। বাদলেরও হইয়াছিল তাই। এইরূপ এক মনোভাবের জন্যই ঘরে সুন্দরী স্ত্রী থাকিতে কুৎসিতা পরস্ত্রীর উপর পুরুষের লোভ হয়।

বাদল এক দৃষ্টে ক্ষ্যান্তর দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। নিজেকে যেন সে কিসের মধ্যে হারাইয়া ফেলিতেছিল। তাহার পর কি ভাবিয়া সে ছুটিয়া গিয়া সজোরে ক্ষ্যান্তকে জড়াইয়া ধরিয়া রহিল।

কিন্তু আজ আর ক্ষ্যান্ত স্বামীর বুকে নিজেকে এলাইয়া দিতে পারিল না। যাহা সে কখনও পায় নাই, আজ সে আর তাহা চায় না। সে তাহার মত স্থির করিয়া লইয়াছে। সে কিছুতেই বাদলকে আর স্বামীর আসনে বসাইতে পারিল না। বাদলের আচরণ যেন তাহার কাছে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়া মনে হইল না। ইহা তাহার কাছে লুণ্ঠনের ন্যায় মনে হইতে লাগিল। ইহার মধ্যে প্রীতি ছিল না, ছিল শুধু জ্বালা।

একদিন ছিল যখন ক্ষ্যান্ত এইটুকুর জন্য নিজেকে পাগল করিত। বাদলের দিক হইতে এইরূপ একটা উন্মাদনা ও আবেগের আশায় মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষায় জাগিয়া থাকিত। ঈশ্বরের কাছে আকুল প্রার্থনা করিত। কিন্তু আজ সে চায় রেহাই পাইতে। সে আজ ইহাদের কেহ নয়। অত্যাচারিতা বন্দিনী মাত্র—অপহৃতা নারী।

ক্ষ্যান্ত প্রাণপণে নিজকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিল। যাহাকে স্বামী বলিয়া মনে করিতে পারিল না, তাহাকে সে কিছুতেই নিজ দেহ ছাড়িয়া দিবে না, ইহাই সে স্থির করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু বাদল তখন উন্মাদ, মাংসলোলুপ হিংস্র জন্তুর ন্যায়। দুইজনায় ভীষণ ধস্তা-ধস্তি আরম্ভ হইল। পায়ের দাপটে চৌকিটা খানিকটা সরিয়া গেল। কোণের মাটির কলসীটা পড়িয়া গিয়া সারা মেঝেটা জলে ভিজাইয়া দিল। চৌকির কোণ লাগিয়া ঘরের জালাটা ভাঙ্গিয়া গিয়া ভিতরকার চালগুলি মাটিতে আসিয়া পড়িল। কিন্তু ক্ষ্যান্ত কিছুতেই আত্ম সমর্পণ করিল না।

ক্ষ্যান্তর শাশুড়ী দেওয়ালে বীজ ধানের গোছা কয়টা টাঙাইয়া দিবার অছিলায় দাওয়ায় উঠিয়া দরজার উপর কান পাতিয়া ভিতরকার ব্যাপার বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। ভিতরকার ব্যাপার বুঝিবা মাত্র চীৎকার করিয়া তিনি বলিলেন, "কি রে? হাড়-হাবাতের মেয়েটা বলে কি? দে না মুখটা থেঁতো করে। আবার দস্যি পানা হচ্ছে।"

ক্ষ্যান্তর ব্যবহারে বাদলের রাগ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে ছিল। মাতার গলার আওয়াজ পাইয়া সে ক্ষ্যান্তকে ছাড়িয়া দিল। তাহার পর কাঠের পিলসুজটা জানালা হইতে তুলিয়া লইয়া ক্ষ্যান্তর মাথায় বার কতক বসাইয়া দিল।

পিলসুজটা তুলিবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষ্যান্ত মাথাটা পাতিয়া দিল। যেন আঘাতগুলি গুণিয়া গুণিয়া সে মাথার উপর তুলিয়া লইতে চায়।

ক্ষ্যান্তর এইরূপ নিশ্চিন্ত ভাব দেখিয়া বাদল আরও রাগিয়া গিয়া চৌকির নীচে হইতে পাথরের নোড়াটা তুলিয়া লইয়া সজোর ক্ষ্যান্তর বুকের উপর ছুঁড়িয়া মারিল।

শুধু একটা অস্ফুট শব্দ, ওঃ বাবারে, উঃ মা—ক্ষ্যান্ত ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

বাদল ছিল স্বভাবতঃই ভীরু। ক্ষ্যান্তকে সংজ্ঞা হারাইতে দেখিয়া ভয়ে তাহার মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি কোন রকমে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া মাকে ডাকিল, "মাগো —ওমা—আ।"

মাতা নিকটেই ছিলেন। বাদলের গলা শুনিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন। ক্ষ্যান্তকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া প্রথমে তিনি মনে করিয়াছিলেন বিশেষ কিছু আঘাত তাহার লাগে নাই। ভাল করিয়া ক্ষ্যান্তর দিকে না চাহিয়াই তিনি তিক্তস্বরে বলিলেন, "ন্যাকামী ভিরমী খেয়ে পড়া হয়েছে। বিটকেলেমী দেখে আর বাঁচি না।"

কথা কয়টা শেষ করিয়া ক্ষ্যান্তকে চুলে ধরিয়া উঠাইবার জন্য ছুটিয়া আসিয়া ক্ষ্যান্তর সত্যকার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তিনিও চমকাইয়া উঠিলেন।

ক্ষ্যান্তর মুখ দিয়া ফেনাইয়া ফেনাইয়া রক্ত বাহির হইতেছিল। ক্ষ্যান্তর শাশুড়ী ব্যস্তভাবে ক্ষ্যান্তর নাকের কাছে হাতখানি একবার ধরিলেন ও তাহার পর চারিদিকে একবার দেখিয়া লইয়া বাদলকে বলিলেন, "কি করলি রে হতভাগা, ফাঁসী কাঠে ঝুলবি? যা শীগ্‌গীর। মিন্‌সে কামার বাড়ী লাঙ্গলের ফাল বানাতে গেছে, যা চুপি চুপি তেনাকে ডেকে নিয়ে আয়।"

বাদল বার দুই ক্ষ্যান্তর দিকে তাকাইয়া লইয়া ঘরের দুয়ারটা ভেজাইয়া দিল। তাহার পর টলিতে টলিতে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাদল চলিয়া গেলে ক্ষ্যান্তর শাশুড়ী রসুই ঘরে গিয়া খানিকটা বাটা হলুদ জলের সহিত গুলিয়া ক্ষ্যান্তর বসনে ও দেহের উপর ছড়া দিতে লাগিল। বাকিটা তাহার পাছার উপর ঢালিয়া দিল।

বাদলের বাপ সেকেলে চাষার ছেলে। এখনও সে এক খামি মুড়ী ও

চারিটা নারিকেল দিয়া জল খাবার খায়। এক গামলা ভাত সে অনায়াসে খাইয়া ফেলে। বুকের মতন মনেরও তাহার জোর আছে। সব শুনিয়া পথেই সে তাহার কর্ত্তব্য ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিল। ঘরে ঢুকিয়া বাদলের বাপ ক্ষ্যান্তর আপাদমস্তক ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। বিপদে অযথা ধৈর্য্য হারাইয়া লাভ নাই। তাই বিচলিত না হইয়া, সে গম্ভীর ভাবে বাদলকে বলিল, "যা শম্ভু খুড়োকে চুপি চুপি ডেকে নিয়ে আয়।"

শম্ভু খুড়ো পাড়ার একজন মাতব্বর লোক। বিপদে যুক্তি ও মামলায় সলা পরামর্শ দেওয়াই তাহার পেশা। তাহার তাঁবে অনেক লোক জন আছে। পূর্ব্বে এমনি বিপদ থেকে তিনি অনেককে উদ্ধার করিয়াছেন। লাস রাতারাতি এমনি পাচার করিয়া দিয়াছেন যে, দারোগা পুলিশ খুনের কোনও কিনারা করিয়া উঠিতে পারে নাই।

বাদল চলিয়া গেলে, ক্ষ্যান্তর শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, কি করবে? ওলাউঠা হয়েছিল বলে জ্বালিয়ে দেবে, না গলায় দড়ী দিয়ে টাঙিয়ে রাখবে?"

ক্ষ্যান্তর কাপড়ের সেই হলুদ ছড়ার দাগগুলা দেখিতে দেখিতে বাদলের বাপ ইসারায় তাহাকে চুপ করিতে বলিল।

পনের

ক্ষ্যান্ত জ্ঞানহারা হইয়াছিল মাত্র। প্রায় চারি ঘণ্টার পর তাহার জ্ঞান হইল। চক্ষু চাহিবামাত্র তাহার নজর পড়িল তাহার বক্ষের দিকে। সারা বুকটায়, কি একটা পাতার রস মাখান। কতকগুলি নিঙড়ান পাতার একটী প্রলেপ তাহার বুকের উপর রাখা। এক টুকরা কাপড় দিয়া পাতাগুলি বুকের উপর বাঁধা ছিল। মাথার চুলগুলা ভিজা। শুশ্রূষার

চেষ্টা তাহা হইলে কিছু হইয়াছিল। তাহার মনে হইল তাহাকে বুঝি জিলা বোর্ডের হাসপাতালে আনা হইয়াছে। কিন্তু ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া সে বুঝিল, যে তাহাকে স্থানান্তরিত করা হয় নাই। দুয়ারের দিকে নজর পড়িতেই সে বুঝিতে পারিল, যে উহা বাহির হইতে টানিয়া বন্ধ করা হইয়াছে। সে উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। সর্বাঙ্গে তাহার অসহ্য বেদনা। সে চুপ করিয়া সেইখানেই শুইয়া রহিল।

তৃষ্ণায় ক্ষ্যান্তর জিব শুথাইয়া আসিতেছিল। একটু সে জল চাহে। কাহার কাছে সে জল চাহিবে? কিন্তু দেহ মানা মানে না। উঁচু নীচু মেটে মেঝের উপর খানিকটা জল জমা ছিল। উপুড় হইয়া তাহারই খানিকটা সে চাটিয়া চাটিয়া তৃষ্ণার শান্তি করিল।

ক্ষ্যান্ত ভাবিতে লাগিল তার হিরুদার কথা আর এই বাদলের কথা। এই দুইজনেই মানুষ। কিন্তু কত তফাৎ। সে অবাক হইয়া ভাবিল, কি করিয়া এতদিন সে বাদলকে চাহিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু ক্ষ্যান্ত এই কদাচার বাদলকে কখনও চাহে নাই। কোন মেয়েও এইরূপ স্বামীকে চাহিতে পারে না। চাহে শুধু তাহাদের যৌবন। ক্ষ্যান্ত এইবার বুঝিতে পারিল যে, সে তাহাকে কখনও চাহে নাই। চাহিয়াছিল তাহার যৌবন, তাহার অনাদৃত ও উদ্দাম যৌবন; কিন্তু তাহার আজিকার সংযত মন আর তাহাকে চায় না।

ক্ষ্যান্ত একটা নূতন সত্য উপলব্ধি করিল। আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার যা কিছু লজ্জা ও ভয় ছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। সে দ্বিধা শূন্য মনে হিরুর কথা ভাবিতে লাগিল, কে জানে তাহার কি অবস্থা ঘটিয়াছে। আত্মহত্যা করে নাই ত? সে কি গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে? এমনি কত কি। কিন্তু ভাবনার শেষ কোথায়? সে ভাল করিয়া ভাবিতে পারে না। সব যেন গোলমাল হইয়া যায়।

ক্ষ্যান্ত অস্থির মনে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিল। সহসা বাহির

হইতে একটা বিরাট গোলমাল বেসুরা ভাবে কানে আসিয়া তাহার চিন্তার ধারা ছিন্ন করিয়া দিল। বাহিরে তাহার দেবরের কর্কশ গলা শুনা যাইতেছিল—"ফেঁড়ে ফেলে দেবো অমন বৌকে। বাপ পিতিমের নাম ডোবান বৌ—"

এতক্ষণ ক্ষ্যান্তর এই গুণধর দেবরটীর দেখা মিলে নাই। সে ভিন-গাঁয়ে তাগাদায় গিয়াছিল। গ্রামে ফিরিয়া ক্ষ্যান্তর আসার খবর শুনিয়া সে উগ্র মূর্ত্তিতে পথ হইতে একটা ইঁট তুলিয়া ছুটিতে ছুটিতে বাড়ী ঢুকিতেছিল।

ক্ষ্যান্ত ভাবিল তাহার অদৃষ্টে যেটুকু অপমান বাকি ছিল সেটুকুও বুঝি শেষ হইয়া যায়। কিন্তু পরক্ষণেই একটা সকরুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া চমকাইয়া উঠানের দিককার জানালার ধারটায় গিয়া দাঁড়াইল। ক্ষ্যান্তর দেবর উঠানের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল।

—"ও মাগো—ও। আমায় বোধ হয় কিসে খেলে গো। আরে বাপ!"

রাগে জ্ঞানহারা হইয়া ক্ষ্যান্তর দেবর সুদাম সোজা পথ ছাড়িয়া রসুই ঘরের পাশের কচুবনের উপর দিয়া বাড়ীর ভিতর আসিতেছিল। কচুবনে পা দিবা মাত্র বুঝি তাহার পায়ে কিসে কামড়ায়। বোধ হয় সাপ হইবে। গোড়ালীর কিছু উপরের দুইটী স্থান হইতে ফিন্‌কি দিয়া রক্ত বাহির হইতেছিল।

সুদাম উঠানে আছড়াইয়া পড়িবামাত্র তাহার বাপ, মা, ভাই সকলেই সেখানে ছুটিয়া আসিল। পাড়া প্রতিবেশীরাও অনেকে আসিল। পূর্ব্ব পাড়ার মুখুয্যেদের ঠাকুর বাড়ীর বিস্তীর্ণ উঠানে ছেলেদের দল মহাসমারোহে কপাটী খেলিতেছিল। খবর পাইয়া তাহারাও ছুটিয়া আসিল।

দুইটা শক্ত রশি দিয়া সুদামের হাঁটুর উপর ও গোড়ালীর নীচেটায় শক্ত করিয়া দুইটি গিট বাঁধা হইল, যাহাতে বিষ উঠা নামা করিতে না পারে। সুদাম নিস্তেজ হইয়া শুইয়া রহিল। সকলেরই মনে বিষাদভাব।

কেহ কথা কহে না। শুধু সুদামের মা থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠে, "ওরে সর্ব্বনেশে জাতকুল খাওয়া বৌরে-এ। আমার বাচ্চাটাকেও কি শেষে খেলিরে-এ।

দেখিতে দেখিতে উঠানে পাড়া পড়শীর একটা বড় রকমের ভিড় জমিয়া গেল। বাগ্দিপাড়া হইতে সাপুড়ে আসিয়াছে বিষ ঝাড়াইতে। মাটির উপর অনেকগুলি আঁচড় কাটিয়া, তাহার উপর একটা পিতলের রেকাবি রাখিয়া, সাপুড়ে হাত চালিতেছিল। আলতো ভাবে রাখা হাতটা, আপনি আপনি ভরিয়া গিয়া থালি সমেত নড়া চড়া করিতে লাগিল। যতই ক্ষণ যায় ততই হাতখানি ভারি হইয়া উঠে। এক জায়গায় থাকিতে চায় না। নড়িতে নড়িতে উহা মাটীর উপর ইটের কুঁচি দিয়া কাটা, বড় রেখাটীর শেষ সীমায় আসিয়া স্থির হইল।

হাত তুলিয়া লইয়া সাপুড়ে, বিপনে বাগ্দী গম্ভীর ভাবে ঘোষণা করিল, শঙ্খচূড় গোখরা। বলতে পারি না কতদূর কি করতে পারব। জাত সাপে খেয়েছে।

ঘেঁটু ঠাকুরের দোর ধরা ছেলে এই সুদাম। ছেলে বেলায় অনেক মানত করিয়া তাহাকে বাঁচান হইয়াছিল। বরাবরই সে বাপ মায়ের আদুরে ছেলে ছিল। তাই জাত সাপের নাম শুনিবা মাত্র সুদামের বাপ মাথায় হাত দিয়া মাটির উপর বসিয়া পড়িল! ক্ষ্যান্তর শাশুড়ী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রোগী জ্ঞানহারা হইবার উপক্রম করিল।

সাপুড়ে সকলকে ধমক দিয়া চুপ করিতে বলিয়া আপন কাজে মন দিল। সমবেত জনমণ্ডলী নিস্তব্ধ হইয়া ঝাড়-ফোঁক দেখিতে লাগিল। পিতলের রেকাবীর উপর রোগীকে বসাইয়া, তাহার গায়ে ধানের শিষ দিয়া মারিতে মারিতে, সাপুড়ে মন্ত্র পড়িতে লাগিল।—

আয়রে ডাকিনি আয়রে যোগিনী,
গাঙ পার হতে রক্ত শোষিণী॥

সাপুসে হুপুস্ শুযেনে নাগিনী।
ধুচুনি ধুচুন আসছে বেদিনী॥
ওপারেতে কালী এপারে বা[illegible]।
নিকোষা নিকোষি দাঁতোলা দামিনী॥

* * * *

ধাঁকোড় ধোঁকোড় চক্ চক্ চক্।
ধাউসে উঠাও ঠ্যাঙওলা বক॥
জুরধুম জুরমুম ঘাউল রাত।
উঠারে বিষ শুনরে বাত॥

* * * *

কার আজ্ঞে হাঁড়ীর ঝির আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে ওলাচণ্ডীর আজ্ঞে॥

প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরিয়া ঝাড় ফুঁক চলিতে লাগিল। বিষ আর নামে না। পাড়া পড়সী আত্মীয়জন সকলেরই মন উৎকণ্ঠায় অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল। সুদাম বুঝি আর বাঁচে না।

ক্ষ্যান্ত তখন বন্ধ ঘরের জানালার ফাঁকে বাহিরের ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল চীৎকার করিয়া উহাদের বলিয়া দেয়, ওগো ভয় নাই। দুই ঘণ্টাতেও যখন বিষ উঠিল না, তখন উহা আর উঠিবে না। সাপে কামড়ায় নাই। কামড়াইলেও বিষ পড়ে নাই।

সেই অতীত দিনে, তাহার বিবাহের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত, হিরুর কাছে অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের সহিত সাপ ও সাপের বিষ সম্বন্ধেও ক্ষ্যান্ত অনেক কিছু শুনিয়াছিল। পাদ্রী সাহেবের দেওয়া বইগুলি হইতে তর্জ্জমা করিয়া অনেক নূতন কথা হিরু ক্ষ্যান্তকে শুনাইত। এইরূপে তাহার জ্ঞানের প্রসার সাধারণ চাষী মেয়েদের ছাড়াইয়া অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছিল। তবে তাহাতে সুবিধার চেয়ে অসুবিধা হইয়াছিল তাহার

বেশী। যাহাদের চিন্তার ধারা প্রতিবেশী ও আত্মীয়জনের চিন্তার ধারা ছাড়াইয়া অনেক দূর উপরে উঠে তাহাদের সকলকেই এইরূপ অসুবিধার পড়িতে হয়।

অপর কেহ না বুঝিলেও ক্যান্ত সহজেই ব্যাপারটা বুঝিয়া ফেলিল। কিন্তু ক্যান্ত নিজে বুঝিলে কি হয় অপরকে বুঝাইবার উপায় তাহার ছিল না। আর যাহারা অবুঝ তাহাদের সে কি করিয়াই বা বুঝাইবে।

ক্যান্ত ভাবিতে লাগিল, মূর্খ ওরা, কে উহাদের আসল কথা বলিয়া দিবে। আর বলিলেই বা উহারা শুনিবে কেন? আর বলিবার প্রয়োজনই বা কি? উহাদের সহিত সম্পর্ক ত সে চুকাইয়া দিয়াছে; কিন্তু, সে দোষ কাহার; সে ত তাহাদের আপনার করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু উহারা তাহাকে চাহিল কৈ?

অনেকক্ষণ ধরিয়া ক্যান্ত এমনি কত কি ভাবিল। তাহার পর বিরক্তির সহিত উঠানের সেই অজ্ঞ জনতার প্রতি চাহিয়া দেখিয়া জানালার কপাট দুইটা চাপিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

বোল

রাত্রি বারটা বোধ হয় তখন বাজিয়া গিয়াছে। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। সাড়া নেই—শব্দ নেই। শুধু দূরে গ্রাম্য চৌকিদারের কর্কশ গলার আওয়াজ শুনা যাইতেছিল,—ছোটবাবু জাগল হো ও ও। ও মুখুয্যে মুশোই—ওই ই ই হো-ও।

দীর্ঘ যষ্টি ও চোরা লণ্ঠন হস্তে সাদা কাপড়ের উপর নীল কোর্তা চাপাইয়া, কোমরে সরকারি তক্‌মা আঁটিয়া, দুলে পাড়ার রাঘব দুলে ওরফে রাঘবচন্দ্র দুর্লভ হুঙ্কার দিয়া পাড়া জাগাইতেছিল।

চৌকিদারের হাঁকে কেহই সাড়া দিতেছিল না। সাড়া দিতেছিল

শুধু প্রকাণ্ড একটা গ্রাম্য কুকুর। গ্রামেই সে থাকে ও ইচ্ছামত এর ওর বাড়ী গিয়া যাচ্ছ ভাত খাইয়া আসে। আহারের পরিবর্ত্তে সেও সারা রাত্রি জাগিয়া গ্রামখানি পাহারা দেয়। তাহার গাঢ় মসীময় দেহে বল ছিল অসীম। তাহার দেহের শক্তির চেয়ে মনের বল ছিল আরও বেশী। তাহার ভয়ে গ্রামে কোনও দুর্ব্বৃত্ত আসিতে পারিত না। গ্রামে অচেনা লোক ঢুকিলে, সে গায়ের গন্ধ শুঁকিয়া বুঝিয়া লইত আগন্তুক কিরূপ প্রকৃতির লোক। গ্রামের লোক আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিল—ভুলো।

চৌকিদারের হুঙ্কারের প্রত্যুত্তরে ভুলোও হুঙ্কারিয়া উঠিতেছিল, ঘেউ ঘেউ—ঘেউ উ উ—ঘেউ।

এই ভুলো কুকুর ও রাঘব চৌকিদার ছাড়া গ্রামের ইতর ভদ্র সকলেই সুষুপ্ত। শুধু বন্দিনী ক্ষ্যান্তর চোখে ঘুম নাই। দরজা তেমনি বন্ধ। কেহ ঘরে ঢুকে নাই। পাগলিনীর ন্যায় বুকটা বাম হাতে চাপিয়া ধরিয়া ক্ষ্যান্ত বদ্ধ ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। চোখ দুইটা তাহার হিংস্র জন্তুর ন্যায় প্রতীত হয়।

অহেতুক খুঁচাইলে নিরীহ বিড়ালও বাঘিনীর ন্যায় দুর্দ্দান্ত হইয়া পড়ে। ক্ষ্যান্ত প্রথমে পলাইবার পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু চারিদিকেই শক্ত মাটির দেওয়াল। কোন পথই দেখা যায় না। শেষে ভাবিল, দিয়াশলাই দিয়া খড়ের চাল জ্বালাইয়া দিবে। কিন্তু একটা দিয়াশলাইও ঘরে ছিল না।

ক্ষ্যান্ত চায় আগুন। আগুন দিয়া সে আগুন নিবাইবে। বহু খোঁজাখুঁজির পর সে শ্বশুরের তামাক ধরাইবার পাথরের চকমকিটা ঘরের কোণ হইতে বাহির করিল। দুই টুক্‌রা পাথর, মাঝে একটা শোলা। মেঝের উপর জানু পাতিয়া বসিয়া ক্ষ্যান্ত পাথরে পাথরে ঠুকিতেছিল। পাথর হইতে আগুন ঠিক্‌রাইয়া আসিয়া শোলাটা ধরাইয়া দিল।

জলন্ত শোলা লইয়া ক্ষ্যান্ত দাঁড়াইয়া উঠিতেছিল, এমন সময় সে শুনিতে পাইল, কানাচের জানালার কপাটে টোকা দিয়া কে তাহাকে ডাকিতেছে।

এত রাত্রে কানাচের জানালায় এমনভাবে কে তাহাকে টোকা দিয়া ডাকিবে! ক্ষ্যান্ত মনের ভিতর আশার আলো দেখিতে পাইল। সে তাড়াতাড়ি ফুঁ দিয়া শোলার আগুন নিবাইয়া জানালার দিকে ছুটিয়া গেল। তাহার পর জানালার কপাট খুলিয়া চাপা সুরে আবেগের সহিত বলিল, "তুমি—এসেছ, কখন এসেছ? যাও—ওপাশ দিয়ে ঘুরে এসে দরজাটা খুলে দাও শীগ গীর।"

ক্ষ্যান্ত মনে করিয়াছিল, টুকু আসিয়াছে। কিন্তু জানালা খুলিয়া সে দেখিল মেনি গোটা দুই থান ইঁট মাটির উপর উপরি উপরি রাখিয়া, তাহার উপর ডিঙি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাম হাতে সে জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ডান হাতে তার এক বাটী দুধ। গলার স্বর দরদে ভরা, চোখে তাহার জল।

উত্তরে মেনি বলিল, হাঁ বৌ, আমি এসেছি। তাড়াতাড়ি এই দুধটুকু খেয়ে ফেল, দুঃখু করিসনি ভাই। এর প্রতিফল ওরা পাবেই। গ্রামে ওলাউঠা এলো বলে। যতই শেতলা ঠাকুর আর ওলাইচণ্ডির পূজা করুক, কেউ ওদের বাঁচাতে পারবে না। এত পাপ দেবতারা কিছুতেই সইবে না।

পাড়ার সব কয়টী মেয়ে ও বৌ ক্ষ্যান্তকে ভালবাসে। ক্ষ্যান্তই একমাত্র তাহাদের মধ্যে লেখাপড়া জানে। বাপের বাড়ীর চিঠিগুলি পড়াইবার জন্ম তাহাদের বামুন বাড়ী ছুটিতে হয় না। ক্ষ্যান্তই চিঠিগুলা পড়িয়া তাহাদের শুনাইত। চিঠির জবাবও সে লিখিয়া দিত। ক্ষ্যান্ত ছিল তাহাদের দুঃখের সাথী, দরদী বন্ধু। মূক বধূগুলি তাহার জন্ম দুঃখিত হইবে তাহা সে জানিত। এইটুকু ভরসা

তাহাদের ক্ষ্যান্তর সামনে আসিবার সুযোগ নাই। সে কাহাকেও আর মুখ দেখাইতে চায় না, কিন্তু ভয় ছিল তার এই মেনিকে। কি জানি কখন বা সে উগ্র মূর্ত্তিতে আসরে অবতীর্ণ হয়।

ক্ষ্যান্ত মেনিকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। এত শান্ত ভাব তাহার সে কখনও দেখে নাই। নিজেকে সংযত করিয়া সজল চোখের দৃষ্টিটুকু মাটির সহিত মিশাইয়া দিয়া ক্ষ্যান্ত বলিল, "দিদি, যদি তুমি আমায় ভালবাস, ত দরজাটা খুলে দাও, আমি নদীর পথে চলে যাই। বাঁচবার সাধ আর আমার নেই।"

মেনি বলিল, "সেই জন্যই ত এসেছি, বৌ। এখন তাড়াতাড়ি, দুধটুকু খেয়ে ফেল ত।"

ক্ষ্যান্ত বড় দুর্ব্বলতা অনুভব করিতেছিল। অনাহারে ও দুশ্চিন্তায় তাহার চলিবার ক্ষমতা যেন লোপ পাইয়াছে। কি ভাবিয়া সে দুধটুকু নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিল। তাহার পর বলিল, "কৈ দিদি আর দেরী কর না। লক্ষ্মী দিদি, কে আবার এখনি এসে পড়বে, আর আমাকে এই নরকে থেকে যেতে হবে।"

মেনি উত্তরে বলিল, "হাঁ বৌ, তুই কি সত্যি সত্যিই নায়েবের সঙ্গে গিছলি। আমি ওদের বললুম, ওরে না, ক্ষ্যান্ত সে রকম মেয়ে না। ও নিশ্চয়ই নিজের বাপের ঘরে পালিয়েছিল। এমন ত অনেে যায়। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে না।"

ক্ষ্যান্ত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর করিল, "হাঁ দিদি, হিরুদার সঙ্গেই গিছলাম। এ ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না।"

মেনি বলিল, "তাতেই বা হয়েছে কি। গ্রাম সম্পর্কে দাদা হয়, গেলেই বা সঙ্গে। যত দোষ মেয়েদের বেলা। এই ত তোর গুণধর দেওর সুদাম, সেদিন নগা কৈবর্ত্তের বৌএর ঘরে ঢুকেছিল, কেবলা তেওর জানতে পেরে দোরে শিকলি তুলে দিয়ে ধরিয়ে

দিলে। ফলে হল কি—না বৌটায় মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে তাড়িয়ে দেওয়া হল। আর দুলাল আমার মাত্র দু এক ঘা চড় চাপড় হজম করে ঘরে ফিরে এলেন। এই ত বিচার।”

মেনির চোখ দুইটা সজল হইয়া আসিল। সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল, “বৌটা কত ভাল ছিল। দয়া মায়া এমন কারও দেখি নি। বেচারা কেঁদে শেষে নাচার হয়ে, এখন খিলের লাইনে ঘর ভাড়া করেছে। এক দিনের একটা ভুলের জন্য, বাপ পিতিম, কেউ তাকে স্থান দিলে না।”

মেনির শেষ কথা কানে যাইবা মাত্র ক্ষ্যান্ত চমকাইয়া উঠিল। সে মেনির গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, “দিদি, তুই আমাকে বাঁচা, আমার কি হবে বলে দে। আমার একটা গতি কর।”

মেনি বলিল, “ভয় কি বৌ। আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি। ওরা কাল তোর মাথার চুল কটা কেটে দেবার সলা করছিল, আজই পালাতে হবে। আমি তোকে নিয়ে যাব।”

ক্ষ্যান্ত অসহায় শিশুর ন্যায় বলিয়া উঠিল, “কোথায় যাব আমরা, কেউ কি আর আমাদের আশ্রয় দেবে দিদি?”

মেনি বলিল, “ভগবান দেবে বৌ। এখন ত চল, আমরা বোষ্টম পিসির বাড়ী যাই।” এই বোষ্টম পিসি মেনির নিজেরই পিসি, বিধবা অবস্থায়—এ বাড়ীর এই সনাতন জ্বালা যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হইয়া নিস্তার পাইবার আশায় ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসে। এখন সে নদীর ওপারে শিউড়িতে এক বৈরাগীর সঙ্গে কণ্ঠি বদল করিয়া, সুখে ঘর-কন্না করিতেছে। এক মেনি ছাড়া কেহই তাহার খবর রাখে না। গ্রামে তাহাকে মৃত বলিয়া প্রচার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেবার ত্রিবেণীর মেলায় মেনি তার সন্ধান পায় মাত্র।

কথা কয়টা বলিয়া, মেনি আর দেরী না করিয়া ঘুরিয়া আসিয়া

দরজায় শিকল খুলিয়া দিল। তাহার পর হত বিহ্বল ক্ষ্যান্তর হাত ধরিয়া বাগানের শেষে বেড়ার ওপার পর্য্যন্ত টানিয়া আনিল।

বেড়ার ধারে একটা মাটির মালসায় ঘুঁটের আগুন জ্বলিতেছিল। মেনিকে মালসাটা তুলিয়া লইতে দেখিয়া, ক্ষ্যান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "এ মালসার আগুন কি হবে দিদি। কোন তুক্ তাক্ করছ নাকি আবার।"

মেনি বলিল, "না ভাই, ওতে পাপ হয়। তা না হলে, আমি যা তুক্ জানি, তাতে সব কটাকেই অনেক আগে সাবাড়ে দিতে পারতাম। তুক্ কেন? বাণই মেরে দিতাম। আমিই ত সেবার বাণ মেরে হেমার শাউড়ীকে ঘায়েল করেছিলাম।"

ক্ষ্যান্ত জ্ঞানী না হইলেও, জ্ঞানার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা তাহার ছিল। এই বিপদের মধ্যেও সে একবার কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ দিদি,—তুকই বা কি? বাণই বা কি করে মারে।"

মেনি বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তুক একরকম হাওয়া। আমলকী, বিশুকি, কিংশুক, এমনি অনেক গাছ বনে পাওয়া যায়,— যার শুক্‌না পাতা, পুরান গন্ধক ও সন্ধব নুনের সঙ্গে মিশিয়ে জ্বালিয়ে সেগুলা একটা কলার মুচি করে যাতায়াতের পথের উপর রেখে দিতে হয়। ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার সময় তার হাওয়া নাকে লেগে লোকের শক্ত অসুখ করে। আর বাণ হচ্ছে একরকম মন্ত্র—সেই মন্ত্র বলে যার নামে ধুনা পড়া দেবে, তার আর নিস্তার নেই। বাবা, কি ভীষণ মন্ত্র। দাঁড়া, কটা লাইন তোকে শোনাচ্ছি।"

মেনি চারিদিকে চাহিয়া লইয়া মালসাটার উপর ধুনার গুঁড়া ফেলিতে ফেলিতে রক্ত চক্ষু করিয়া বলিতে লাগিল—

এস মা কালী, বস মা কালী।
ধরি গো তোমার পায়॥

এই যার সঙ্গে লাগি—
কিনা তার বুকের কলিজার
আমি রক্ত চুষে খাই।

ক্ষ্যান্ত সভয়ে বলিয়া উঠিল, "ও কি দিদি, কার নামে ধুনা ফেলছ।"

মেনি হাসিয়া বলিল, "দূর পাগলী। একি বাণ মারছি নাকি? এমনি তোকে শোনাচ্ছিলাম।"

ক্ষ্যান্ত উত্তর করিল, "তবে ও রকম করে ধুনা জ্বালাচ্ছো কেন?"

মেনি বলিল, "পথে দরকার হবে। মঞ্জু গাঁয়ে মেলা হচ্ছে। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মাঠের পথে আজকাল লোক যাতায়াত করে। মাথায় মালসা রেখে আমরা ধুনা জ্বালাতে জ্বালাতে যাব। মাঝে মাঝে মাঠের উপর অন্ধকারে আগুন জ্বলতে দেখে লোকে মনে করবে আলেয়া ভূত, কেউ কাছে আসবে না। এমনি করেই ত আমাদের দিদিমা ঠাকুরমারা আগেকার দিনে রাতের অন্ধকারে বাপের বাড়ী পালাত।" বুঝলিনে কি—

ক্ষ্যান্ত অবাক হইয়া মেনির দিকে চাহিয়া রহিল। হিরুর মুখে সে শুনিয়াছিল, আলেয়া ভূত নয়, উহা এক প্রকার গ্যাসের আলো। জলা যায়গায় এই গ্যাস তৈয়ারী হয়। আপনি হইতেই থাকিয়া থাকিয়া জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু উহা ছাড়া আর এক প্রকারের যে আলেয়া আছে, তাহা সে জানিত না।

বিমূঢ়া ক্ষ্যান্ত এইবার মেনির নির্দ্দেশ মত কচু বন ও আস্‌শেওড়া বোঝাই বাগিচাগুলির উপর দিয়া সাবধানে চলিতে লাগিল।

রাত্রির অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। চারিদিককার বড় বড় গাছগুলি যেন রূপকথার দৈত্যের ন্যায় পাহারা দিতেছে। মাঝে মাঝে দূরে অদূরে সড় সড় আওয়াজ শুনা যায়।

মেনি তালি দিয়া শব্দ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল। চারিদিকে

তাহার সতর্ক দৃষ্টি। ক্ষ্যান্ত একবার জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ দিদি এমনি করে তালি দিচ্ছ কেন?"

মেনি উত্তরে বলিল, "দেখছিস না তালি শুনে সড় সড় করে সাপ এদিক ওদিক পালিয়ে যাচ্ছে। তা না হলে কার গায়ে পা দিয়ে বসব, আর দেবে কামড়ে। গ্রীষ্মকালে এ বনে সাপ বোঝাই থাকে। নীচের বিলটা জলে বোঝাই হ'য়ে গেছে কি না। তাই মাঠের আল্‌কেউটে-গুলো সব এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে।"

ক্ষ্যান্ত সভয়ে মেনিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "সাপ যদি কামড়ে দেয়! কি হবে দিদি? আমার ভয় করছে।"

মেনি বলিল, "ভয় কিরে। নেহাৎ গা মাড়িয়ে দিলে, তবে ওরা কামড়ায়। নইলে মানুষের সাড়া পেলে ওরা পালিয়ে যায়। প্রাণের ভয় সবারই আছে। আর কথায় বলে, সাপের লিখা আর বাঘের দেখা। সহজে সর্পাঘাত হয় না। বুঝলি!"

বনের পথে আরও কিছুক্ষণ চলিয়া, মেনি ক্ষ্যান্তকে লইয়া বিখ্যাত দাশের বাগানে আসিল। দশখানা গ্রামের লোক এই দাশের বাগানের নাম জানে। ছোট ছোট ছেলে মরিলে তাহাদের না পুড়াইয়া এইখানে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

বিস্তীর্ণ এই বাগান। ছোট বড় জংলী গাছ ও ঝোপ-ঝাড়ে পরিপূর্ণ। চলিতে চলিতে কাপড়ে কাঁটা আট্‌কাইয়া যায়। সাবধানে ছাড়াইয়া লইয়া তাহারা চলিতে সুরু করে। কতকটা জঙ্গল সাবধানে পার হইয়া, তাহারা একটা খোলা জায়গায় আসিয়া পড়িল। অনেকগুলি কচি মাথার খুলি সেইখানে পড়িয়াছিল। মাঝে মাঝে দুই একটা ঝোঁপ ঝাড় ও বাবলা গাছ। নিদাঘ বায়ু বাব্‌লা গাছ কাঁপাইয়া ছোট বড় মড়ার খুলিগুলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া আওয়াজ করিতেছি—সোঁ সোঁ সোঁ-ও-ও—সোঁ।

অদূরে একটা উঁচু জায়গায় মুসলমানদের গোরস্থান। উঁচু নীচু মাটীর ঢিবি, বাঁশের বেড়া দিয়া গোল করিয়া ঘেরা। তাহার নিম্নে আবার গো ভাগাড়। যত রাজ্যির গরুর কঙ্কাল ও তাহাদের সদন্ত শুভ্র মস্তকগুলি সেখানে জমা করা ছিল।

চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া গা ছম্ ছম্ করিয়া উঠে। পায়ে পা আটকাইয়া যায়।

লোক চলাচলের পথের চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত আবার এইখানে আসিয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এইখানে আসিয়া মেনিরও বুক কাঁপিয়া উঠিল। পা যেন জড়াইয়া আসে। যতই বনের মধ্যে তাহারা ঢুকিয়া পড়ে, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেইখানেই আসিয়া পড়ে। মাঠের পথে শত চেষ্টা করিয়াও তাহারা বাহির হইতে পারে না।

কচি ছেলের গলার আওয়াজ অদূরে কে যেন সুর করিয়া কাঁদিতেছিল।—কেঁ্যা, এ্যা, ওঁ, কেঁ্যা, এ্যা, ওঁ।

ক্ষ্যান্ত কাঁপিতে কাঁপিতে মেনিকে জড়াইয়া ধরিল। মেনি জোর করিয়া চোখ মেলিয়া একবার সেই কাঁদুনে সুরের পথে চাহিয়া দেখিল। একটা বড় আমগাছের মাঝে ডালে বসিয়া একটা প্রকাণ্ড পেঁচা বিকট সুরে আর্ত্তনাদ করিতেছিল, কেঁ্যা এ্যা ওঁ, কেঁ্যা এ্যা ওঁ। অদূরে অপর একটী গাছের ডালে বসিয়া তাহার সঙ্গিনী পেঁচাটি প্রিয়তমের প্রিয় সম্ভাষণের প্রত্যুত্তর করিতেছিল, ট্যা, ওঁ অ্যাঁ, ট্যা ওঁ অ্যাঁ।

মেনি সস্নেহে ক্ষ্যান্তর মুখটি বাম হাতে তুলিয়া ধরিয়া ডান হাত দিয়া পাখী দুইটী দেখাইয়া বলিল, দেখছিস্, "ওই সেই হুতুম পেঁচা। রাত্রে অমনি করে ওরা কেঁদে বেড়ায়।"

হঠাৎ সামনের ঝোপ কয়টা কাঁপিয়া উঠে। একটা আওয়াজ কানে আসে, ঘ্রোত, ঘ্রোওত, ঘ্রোন্। এ আবার কি নূতন বিপদ।

মেনি চাহিয়া দেখিল সামনের ঝোপ কয়টা সজোরে নড়িয়া উঠিল। গাছগুলি দোল দিয়া উঠিতেছে।

নিমিষে ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া মেনি ক্যান্তকে টানিয়া লইয়া একটু পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। মাত্র আধ মিনিটের ব্যবধান। আশে-পাশের সমস্ত গাছ গাছড়া কাঁপাইয়া তিনটী বুনা শুয়ার সোজা ছুটিয়া আসিয়া সামনের জঙ্গলটায় ঢুকিয়া পড়িল।

ক্যান্ত কাঁপিতেছিল। মেনি তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, "ভয় নেই। ওগুলো বুনো শূয়োর। শূয়োরের গোঁর কথা শুনেছিস ত? ওরা সোজা ছুটে যায়। আসে-পাশে চেয়েও দেখে না, একটু পাশে সরে দাঁড়ালে আর কোন ভয় থাকে না। শূয়োরে তাড়া করলে চট্ ক'রে পাশে সরে যেতে হয়, আর সাপে তাড়া করলে এঁকে বেঁকে দৌড়তে হয়। এরা কেউ সহজে মোড় ফিরতে পারে না, বুঝলি?"

খোলা যায়গায় বেশীক্ষণ দাঁড়ান ঠিক নয়। সকালও হইয়া আসিতেছে। মেনি ক্যান্তকে টানিয়া লইয়া বনের পথে আর একবার ঢুকিয়া পড়িল। জোছনার আলো বনের মধ্যে পড়ায় যায়গায় যায়গায় আলো দেখা যাইতেছিল। হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া কোন রকমে বনের অপর পারে আসিয়া তাহারা দেখিল ভোর হইয়া গিয়াছে।

সামনেই বিস্তীর্ণ বিল। নাবাল জমীর ওপারে উঁচু জায়গা উপর মাঠের পথ।

মেনি বলিল, "তাই তো বৌ! ভোর হয়ে গেল যে! অনেকক্ষণ আমরা বাগানে ঘুরেছি। এতক্ষণ হয় ত খোঁজাখুঁজি আরম্ভ হয়েছে। মাঠ ত আর পার হওয়া যাবে না।" ক্যান্ত সভয়ে বলিয়া উঠিল, "কি হবে তা হলে, দিদি?"

মেনি বলিল, "ভয় কি? দিনটা এই জঙ্গলেই লুকিয়ে থাকব। ঘরের বাইরে পা দেবার সঙ্গে আমাদের পিছনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আমাদের যা কিছু পথ, তা সামনে।"

সন্তের

একটা দুঃসহ যন্ত্রণার গুরুভার লইয়া হিরুও সেই রাত্রেই গ্রাম ছাড়িল। সারা গাত্রে তৈল সিক্ত করিয়া প্রকাণ্ড যষ্টি হস্তে, হিরুর ঠাকুর্দার আমলের বিশ্বাসী ভৃত্য কাণ্ডরা তাহার বিরাট বপু লইয়া রক্ষক রূপে তাহার সঙ্গে চলিল।

গ্রামের দুষ্ট ছেলের দল এই অনাচারী হিরুর সন্ধানে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পথে পথে ঘুরিল, কিন্তু তাহার সন্ধান মিলিল না। তাহাকে উচিত মত শিক্ষা দিতে না পারিয়া ক্ষুব্ধ মনে তাহার নিন্দা করিতে করিতে তাহারা স্ব স্ব গৃহে ফিরিল।

বাঁকা পথে সারা রাত্রি হাঁটিয়া হিরু ও কাণ্ডরা নিশুন্দি গ্রামের বুড়াশিবের মন্দিরের কাছে আসিয়া যখন পৌঁছাইল তখন সকাল হইয়া গিয়াছে।

সম্মুখেই বুড়াশিবের মন্দির। মন্দিরটীর তিন দিক বহু পূর্ব্বেই ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে, শুধু তার একটা দিক একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের শিকড় ও জটা-সম্ভার আশ্রয় করিয়া আজও দাঁড়াইয়া আছে।

আশ্রয়দাতা মন্দিরটীর তিন দিক ধ্বংস করিয়া বোধ হয় বটবৃক্ষটী অনুতপ্ত হইয়াছিল ; তাই অবশিষ্ট অংশটী সে বুকে করিয়া রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

মন্দিরটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার গৌরব নষ্ট হয় নাই। মন্দিরের সেবায়েৎ বংশটী মরিয়া হাজিয়াও তখনও একেবারে নিঃশেষিত হয় নাই। তাই এখনও সেখানে পূজা পড়ে, সন্ধ্যায় আরতি হয়। যাত্রীর যাতায়াত পূর্ব্বের স্থায়ই অক্ষুণ্ণ আছে। দশখানা গ্রাম হইতে লোক সেখানে আসে। পূজা দেয় ও মানত করে।

যাত্রীদের প্রণামী ও কয় বিঘা দেবোত্তর জমীর উপর নির্ভর করিয়া পূজারী বংশটী তখনও পর্য্যন্ত টিকিয়া আছে।

মন্দিরের সামনেই প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। মন্দিরের ন্যায়ই প্রাচীন ও শ্রীহীন। অর্দ্ধেক তাহার শেওলায় ঢাকিয়া আছে। তাহার বিস্তীর্ণ বাঁধা ঘাটের অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া ধ্বসিয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে। শুধু উপরের দিকে কয়েকটা সানের ভাঙ্গা পৈঠা দেখা যায় মাত্র। উপরের বিস্তীর্ণ চাতালের চিহ্ন মাত্র নাই। স্থানে স্থানে মাত্র কয়েকটা ইষ্টক পড়িয়া আছে। সেকেলে পাতলা ইট, সহজে উঠাইয়া লওয়া যায়। প্রয়োজন মত দুশ বছরের পুরান সেই ইটগুলি একে একে ঘাটের আলিসা, চাতাল ও পৈঠা হইতে সরিয়া আসিয়া গ্রামবাসীদের গৃহে, অলিন্দায় ও প্রাচীরে কতদিন ধরিয়া যে আশ্রয় পাইয়া আসিতেছে, তাহার হিসাব নাই। বাঁধা ঘাটের চিহ্ন পর্য্যন্ত বুঝি লুপ্ত হইয়া যায়।

সেদিন বিশেষ কোন পর্ব্ব উপলক্ষে নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি হইতে বহু নরনারী সেইখানে পূজা দিতে আসিয়াছে। মন্দুরা গ্রাম হইতে যাহারা পূজা দিতে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ভট্টচার্য্য বাড়ীর বামুন দিদি ও তাহার বধূগণও ছিলেন।

অনেকগুলি শাশুড়ী জাতীয়া মহিলা ঘাটের শেষ পৈঠাটির উপর বসিয়া আহ্নিক করিতেছিল। কেহ বা গুল দিয়া দাঁত মাজিতেছিল। ঘাটের অনতিদূরে জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া বাগ্দিদের একজন বিধবা বৌ বাছিয়া বাছিয়া কলমীশাক সংগ্রহ করিতেছে। গাঁয়ের কুমারী মেয়েরা চান করিতে আসিয়া লুটাপাটী করিতেছিল, জল ছুঁড়িতেছিল। কেহ কেহ ভাসমান ঘড়ার সাহায্যে বেশী জলে গিয়া বাহাদুরী দেখাইতেছে, শালুক ফুলের পাতা ছুঁড়িয়া খেলা করিতেছে। কেহ কেহ আবার গামছা টানিয়া মাছের ছানা ধরিতে সচেষ্ট।

ঘাটের উপরের ভাঙা চাতালের উপর কয়েকটী মূক বধূ। আপন মনে তাহারা কাজ করিয়া যাইতেছিল। কেহ কাপড় নিঙড়াইতেছিল,

কেহ বা চাতালের একপাশে শুকনা জায়গায় দাঁড়াইয়া পিত্তলের থালিতে দেবতার জন্ম নৈবিদ্য সাজাইতে ব্যস্ত।

মূক বধুর দল। পাশাপাশি তাহারা দাঁড়াইয়া থাকে, কিন্তু কেহ কাহারও সহিত কথা কহিতে পারে না। পরস্পরের পরস্পরকে জানিবার জন্ম ইচ্ছা হয়, কিন্তু শাশুড়ী দিগের ভীতি সন্নিধান অনুরূপ ইচ্ছা হইতে তাহাদের বিরত রাখে। অতি বড় সাহসী বা নির্লজ্জ যাহারা তাহারাই মাত্র শুধু শাশুড়ীদিগের ধমক খাইয়াও নিম্নস্বরে কথার আদান প্রদান করে। তবে তাহাও খুব সংক্ষিপ্ত ভাষায়।

বামুন বাড়ীর মেজ বৌ অন্নপূর্ণা নৈবিদ্যের থালিখানি হাতে লইয়া ঘাটের পথে উঠিতেছিল। হঠাৎ সে শুনিতে পাইল, পিছন দিক হইতে কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে, "ও ভাই, এই, ভাল আছিস্।"

অন্নপূর্ণা পিছন ফিরিয়া দেখিল রায়েদের ছোট বৌ বেলারাণী। সেবার পূব পাড়ার ঘোষেদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া তাহার সহিত বামুন বাড়ীর এই অন্নপূর্ণার আলাপ হয়।

পল্লীবধুগণের একমাত্র নিরুদ্বেগ মিলন স্থান এই নিমন্ত্রণ বাড়ী, ভোজনের পূর্ব্বে প্রথামত কোনও একটী ঘরের ভিতর যখন বিভিন্ন বাটীর এই বধূদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তখন তাহারা একই হাজতে সমাগত বিভিন্ন কয়েদী-দিগের ন্যায়ই সদালাপী হইয়া উঠে। পরস্পর পরস্পরের কথা ও ব্যথা শুনিতে ও শুনাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। সহজে ও অল্প সময়ে তাহাদের বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠে। এইরূপ সুযোগ মাত্র কালে-ভদ্রে আসিলেও সেই দিনগুলি তাহাদের মনে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে।

অন্নপূর্ণা বেলারাণীকে ভুলে নাই। তাহার সেই অনশন ক্লিষ্ট দেহখানি দেখিয়াই সে তাহাকে চিনিয়া ফেলিল। ঘাটের দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিয়া, নিম্নস্বরে অন্নপূর্ণা উত্তর করিল, "হাঁ ভাই কবে এলি? যাই ভাই পূজোটা দিয়ে আসি।"

বেলা একা পূজা দিতে আসিয়াছিল। উত্তরে সে বলিল, "দাঁড়া না, যাবি এখন।" অন্নপূর্ণা বলিল, "ঐ মা-আ বকবে, যাই ভাই।"

বকুনির ভয় বামুন বাড়ীর এই মেজবৌই সবচেয়ে বেশী করিত। সে তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ চাহিয়া দেখিল, তাহার শাশুড়ী ঘড়া কাপড় গামছা ঘাটের উপর ফেলিয়া ব্যস্তভাবে এক সঙ্গে সিঁড়ির দুই তিনটী ধাপ ডিঙাইয়া উপরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছেন।

উঁচু নীচু সান। ইটের ফাঁকে ফাঁকে শেওলা গজাইয়াছে। মাঝে মাঝে খোঁদল। ছোট বড় গর্ত্ত। পিছল পথে উঠিতে গিয়া বার দুই পড় পড় হইয়াও তিনি রহিয়া গেলেন। তাহার পর বধুটির কাছে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিবার জন্য হাত ছুঁড়িলেন।

পিছল ইষ্টক করখানি বামুন ঠাকরুণের ভর রাখিতে নারাজ হইল। তাঁহার বাম পা'খানি পিছলাইয়া গিয়া পাশের একটা ছোট গর্ত্তে আটকাইয়া গেল। ডান হাতখানি সরিয়া গিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট ঘটাইল। তিনি টাল সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেলেন কিন্তু পরক্ষণেই আবার উঠিয়া পড়িয়া অন্নপূর্ণার হাতখানি সবলে চাপিয়া ধরিয়া ভয়ার্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে তোরা শীগ্‌গিরি চলে আয়। ঐ সেই নচ্ছার নায়েব সেই জমিদারের পাইকটাকে নিয়ে এই দিকেই আসছে।"

বেশ একটু হুটোপাটি পড়িয়া গেল। শাশুড়ী বধূ নির্ব্বিশেষে সকলে একহাত ঘোমটা টানিয়া ঘাটের নীচে আসিয়া বসিয়া পড়িল। সকলেই ভয়ে শশব্যস্ত।

বামুনদি নিম্নস্বরে সকলকে বুঝাইয়া দিলেন, "অ-ঐ অরা, জমীদারের চর সব। দিনের বেলায় ঘাটে পথে বৌঝি দেখে বেড়ায়, রাত্রে পাইক দিয়ে সুন্দরী মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়। এই আমার বাপের গাঁয়ের বাদলা কৈবত্তের বৌ কে গো, বাদলা কৈবত্তর বৌ কে—"

হিরু কাণ্ডরাকে লইয়া ঘাটের ধারে চাতালটার কাছটায়

দাঁড়াইয়াছে মাত্র, তাহার পরই এই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি। তাহাদের সন্নিধানই যে মেয়েদের মধ্যে এই ভীতি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহা হিরু সহজেই বুঝিয়া লইল।

বামুনদির কথা কয়টা সে স্পষ্টই শুনিতে পাইয়াছিল। এমন ভাবে বিকৃত হইয়া ঘটনাটা এতদূর আসিয়া পড়িতে পারে, হিরু তাহা আশঙ্কা করে নাই, তাহার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

ফাগুয়া হিরুকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহার কাছে আসিয়া কাপড়ের খুঁট দিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া বলিল, "ওসব কথায় কান দাও কেন? ও সব কি গ্রাহ্য করতে আছে। লোকে কি না বলে! আপনার দাদাঠাকুর, স্বর্গে গেছেন তিনি। তিনি বলতেন, লোকের কথায় করনা প্রত্যয়, লোকে কি না কয়, লোকে কিনা কয়!"

হিরু উত্তর করিল, "ফাগুয়া, আমি কি এমন করেছি যে ওরা এমনি করে—"

ফাগুয়া বলিল, "তাতে হয়েছে কি? হরি ঠাকুরের কথকতা শুনেছ ত? কথক ঠাকুর বলতেন, শব্দ হচ্ছে ব্রহ্ম, শব্দের কোন অর্থ নেই, শব্দ ব্রহ্মই যদি হয় আর তার যদি কোন অর্থ না থাকে তবে দুঃখ করবার কোন কারণ নেই, একটা শব্দেরই মানে কত দেশে কত রকম হয়, বলুক না যা খুশি, কানে যদি এসে পড়েই ত মনের মত একটা মানে করে নিলেই হবে।"

ফাগুয়ার কথা হিরুকে একটু অন্যমনস্ক করিল। কথার কোন উত্তর না দিয়া সে ঘাট হইতে একটু দূরে সরিয়া আসিয়া অদূরের সেই দীঘির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নিশুন্দিপুরে হিরুর পিসির বাড়ী ছিল। ছোট বেলায় সে প্রায়ই এখানে আসিয়া থাকিত। এই দীঘিটী হিরুর প্রিয় ছিল। আজ বহু দিন পরে সেই দীঘির অবস্থা দেখিয়া হিরুর চোখ সজল হইয়া উঠিল।

একদিন যে দীঘির সমুচ্চ পাড়, প্রশান্ত কাল জলরাশি দেখিয়া লোকের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিত। সেই দীঘির আজ এই অবস্থা।

পয়সার ঘাটতি পড়ায় জমীদার পাড়ের উপর চাষ লাগাইয়াছেন। যে পাড় পূর্ব্বে গোচরভূমি রূপে ব্যবহৃত হইত, সেখানে আজ চাষ হয়, ফলে প্রতি বৎসর বর্ষার ধোয়াট নামিয়া দীঘির গর্ভ ভর্ত্তি করে, পাড় ধ্বসিয়া নামিয়া আসে, প্রশস্ত বকচর কমিয়া নামিয়া জলের সহিত মিশিয়া যায়। যে দীঘি একদিন দশখানা গ্রামের পানীয় সরবরাহ করিত, তাহাই আজ ঘোরতর অস্বাস্থ্যকর হইয়া সেই গ্রামগুলির ধ্বংসের কারণ হইতে বসিয়াছে।

কাগুয়া বলিল, "তা, দা'ঠাকুর হাত পা গুলা দীঘির জলে ধুয়ে নাও না কেন?" হিরু ধীর পদ-বিক্ষেপে চলিয়া আসিতে আসিতে বলিল, "না।"

কাগুয়া বলিল, "তবে চল দা'ঠাকুর, শিবতলায় গিয়ে একটা পেরণাম করে চন্নমেরত খেয়ে নিই। বড় জাগ্রত ঠাকুর উনি গা।"

হিরু কোন উত্তর না দিয়া, কাগুয়াকে লইয়া ধীরে ধীরে শিবতলায় আসিয়া দাঁড়াইল। শিবের মাথায় জল ঢালার বিরাম নাই। যে যখন আসে, কলস কলস জল শিবের মাথায় ঢালিয়া দেয়। মাটির উপর কাটা একটা নালা, সেই নালা বাহিয়া সেই জল অনতি দূরে একটা গর্ত্তের মধ্যে আসিয়া জমিয়া থাকে। ঐ গর্ত্তের জমা জলকে লোকে চরণামৃত বলে। বিল্বপত্র পচা জল, থক্ থক্ করিতেছে তাহার মধ্যে পোকা।

দূর ও অদূরের গ্রামগুলি হইতে চাষী মেয়েরা তাহাদের রুগ্ন ছেলে-গুলিকে লইয়া সেখানে মানত করিতে আসিয়াছে। ছেলেগুলির ডেবরা পেটের উপর নীলশিরার শাখা প্রশাখা। গলায় তাদের গোল ত্রিকোণ, ঢোলকাকার মাদুলি। ছেলেগুলি সেই তামার মাদুলি চুষিতেছিল। মায়েরা তাদের মুখ হইতে মাদুলিগুলি সরাইয়া দিয়া সেই মৃত্তিকা গহ্বর

হইতে আঁজলা করিয়া চরণামৃত তুলিয়া শিশুদের খাওয়াইতেছিল। সন্তানদের বাঁচাইয়া তুলিবার জন্য মায়েদের চেষ্টার অন্ত নাই।

হিরু সেই অশিক্ষিতা মাতৃজাতির দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু এইরূপ বিষপ্রয়োগে বাধা দিবার চেষ্টা একটা বাতুলতা মাত্র। হিরু ব্যথিত স্বরে ফাগুয়ার দিকে চাহিয়া বলিল, "চল ফাগুয়া। আমরা ইষ্টিশনে গিয়ে জল খাবথ'ন।"

ফাগুয়া বলিল, "তা তুমি রাজাবাবুদের সেই মণ্ডবপুরের বাড়ীতে যাবা, না মন্দুবা গাঁয়ের তোমার কাছারিতে যাবা?"

উত্তরে হিরু বলিল, "না ফাগুয়া। দুটোর কোনটাতেই যাবো না।"

আঠার

সকাল হইয়া যাওয়ায় মেনি ও ক্যান্ত বন হইতে বাহির হইয়া আসা সমীচীন মনে করিল না। তাহার পর কাঁটাবন ও লতাপাতার মধ্য দিয়া সারা রাত্রি ছুটাছুটি করায় ক্যান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে আর চলিতে পারিতেছিল না। তাই একটা ঝোঁপের পিছনে মাঠের পথ আড়াল করিয়া, একটা আমগাছের গুঁড়ির উপর ঠেস দিয়া তাহারা বসিয়া পড়িল। সামনে শিউলি কাঁটার ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে মাঠের পথ স্পষ্ট দেখা যায়। ধূ ধূ করিতেছে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। মাঠের বুক চিরিয়া একটা মেটে পথ, সোজা পারঘাটার দিকে চলিয়া গিয়াছে। নিকটে কোন গ্রাম নাই, শুধু দূরে বনানীর ক্ষীণ রেখা দেখা যাইতেছে মাত্র।

দূরে একটা গরুর গাড়ী মন্থর গতিতে গ্রামের দিকে আসিতেছিল। দূর হইতে দেখা গেল, কাহাদের একজন বৌ, সেই গাড়ীর মধ্যে

বসিয়া পিছনের পথটুকুর দিকে চাহিয়া ঢুলিতেছে। ক্ষ্যান্তও কতবার এমনিভাবে তাহার স্মৃতি-বিক্ষত ক্ষুদ্র হৃদয় আলোড়িত করিতে করিতে পিতৃগৃহ হইতে শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে। গো-শকটখানির দিকে যতই সে চাহিয়া দেখে, ততই তাহার মন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, তাহার মনে হয় কোথায় সে আসিয়া পড়িল। ক্ষ্যান্ত আর চাহিয়া থাকিতে পারে না, তাহার চক্ষু আপনা হইতে বুজিয়া আসে।

ক্ষ্যান্তর অবস্থা দেখিয়া মেনি সস্নেহে ক্ষ্যান্তকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া তাহাকে তাহার কোলের উপর শোয়াইয়া, বলিল, "বড় কষ্ট হচ্ছে তোর, একটু ঘুমিয়ে নে।"

কোন উত্তর না করিয়া ক্ষ্যান্ত মেনির কোলে তাহার ক্লান্ত দেহটা এলাইয়া দিল। ঘুমে তাহার চোখ ঢুলিয়া আসে, কিন্তু ঘুমাইতে সে পারে না। থাকিয়া থাকিয়া সে জাগিয়া উঠে।

মেনি ক্ষ্যান্তর ভীতিবিহ্বল মুখখানির দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। হঠাৎ ক্ষ্যান্ত জাগিয়া উঠিয়া মেনির গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কোথায় আমার মেনিদি?" মেনি ক্ষ্যান্তকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "এই যে বৌ, আমি এখানে। ভয় কি?"

ক্ষ্যান্ত চারিদিকে চাহিয়া লইয়া তাহাদের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিল ও তাহার পর মেনির দিকে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা দিদি, তোমাকেও কি তেনারা এমনি কষ্ট দিত। আমার কিন্তু—"

মেনি বলিল, "সে অনেক কথা, শুনবি? বলছি শোন। আমাদের যখন বিয়ে হয় তখন আমার বয়স ন' বছর। আর তেনার বয়স চল্লিশ। পনর গণ্ডা পণে তিনি আমায় কিনে আনেন।"

ক্ষ্যান্ত উত্তর করিল, "বুড়ো বরকে তোমার পছন্দ হত?"

মেনি উত্তর করিল, "কে জানে? কোনটা বর কোনটা বা তা নয়, অত আমি তখন কি ছাই বুঝতাম। তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই

ছিল না। বরং আমার সমবয়সী দেওর নিতুইয়ের সঙ্গে আমার বেশী ভাব ছিল। শ্বশুরবাড়ীতে তার সঙ্গেই আমি খেলা করে বেড়াতাম।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মেনি আর বলিতে পারে না। তাহার গলা ধরিয়া আসে। মনে পড়ে তাহার নিজের বধূজীবনের কথা, চক্ষু তাহার সজল হইয়া যায়।

মেনিকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ক্ষ্যান্ত বলিল, "তারপর ?"

—"হাঁ, তারপর আর একটু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারি, ওই চালসে ধরা মিন্‌সেটা আমার সোয়ামী। প্রায় দেখি সে গাঁজা খেয়ে অনেক রাত্রে বাড়ী ফেরে। মাঝে মাঝে ফেরে না। লোকে বলে সে দুলেপাড়ায় ডোম-বৌএর সঙ্গে রাত্রি কাটায়।"

ক্ষ্যান্ত বলিল, "কেউ তেনাকে কিছু বলত না, পাড়ার লোকে তেনাকে বরদাস্ত করত ?"

মেনি একটু হাসিয়া বলিল, "পয়সাওয়ালা জোতদার, তার উপর গাঁয়ের মোড়ল। জমীদারের ডান হাত। কার সাধ্যি, তাঁকে কিছু বলে।"

ক্ষ্যান্ত বলিল, "তোমার ওপরও কি তেনা জুলুম করতেন ?"

মেনি বলিল, "মাঝে মাঝে তাড়ি খেয়ে এসে তেনা এমনি গোলমাল করত যে আমি পর্য্যন্ত ভয়ে কেঁদে উঠতাম। আমার শাশুড়ী আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলতো, ভয় কি মা, তুমি একটু শেয়ানা হয়ে উঠলেই ওর সব দোষ সেরে যাবে। আমার বয়স তখন মাত্র এগার।"

শাশুড়ীর কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পনর বৎসর পূর্ব্বেকার বধূ-জীবন নূতন করিয়া ক্ষ্যান্তর চক্ষে ভাসিয়া উঠিল। নয় বৎসরের মেয়ে সে, ভাল করিয়া কাপড়ও পরিতে পারে না, বরকে সে তখন 'বর' বলিয়া ডাকে! সে বধূ হইয়াছিল, কিন্তু বধূত্ব কাহাকে বলে তাহা জানে

নাই। নারীত্বের দুয়ারে আসিয়াই বধূজীবন হইতে তাঁহাকে ইস্তফা দিতে হয়, তাই বধূত্ব কি তাহা বুঝিবার অবকাশ তাহার হয় নাই। শ্বশুরবাড়ীর কথায় তাহার স্নেহপ্রবণ শাশুড়ীর কথাই শুধু তাহার মনে পড়ে। মাকে সে কখনও দেখে নাই। শাশুড়ীকেই সে মা বলিয়া জানিত।

আঁচলের কোণ দিয়া চোখ দুইটা একবার মুছিয়া লইয়া, মেনি আবার বলিতে লাগিল, "আমার শাশুড়ী বড় ভাল ছিল। ব্যাপার বুঝে তিনি নিজেই আমাকে বাপের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। বলে দিলেন, আমি শেয়না হয়ে উঠলে, তবে তিনি আমাকে নিয়ে আসবেন। নিজের পুত্তুর হলে কি হয়, তাঁর এই পাষণ্ড ছেলেকে তিনি বিশ্বাস করতেন না। সোয়ামীর রকম দেখে তিনি আমার মত কচি বৌকে আর একদিনও তাঁর ও বাড়ীতে রাখতে চাইলেন না।" দুঃখের দিনে লোকে দুঃখের কথাই শুনিতে চায়। সুখ-সমৃদ্ধির কথা তখন তাহাদের ভাল লাগে না।

ক্ষ্যান্ত মন্ত্রমুগ্ধের মত আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর ?"

—"তারপর যখন শেয়না হয়ে শ্বশুরের ঘরে ফিরলাম, আমার স্বামীর বয়স তখন পঞ্চাশও পেরিয়ে গেছে। সে যখন তার ডেবডেবে চোখ দুটা নিয়ে বন-বেড়ালের মত আমার দিকে চাইত, তখন সত্যি সত্যিই আমি ভয়ে আঁতকে উঠতাম।"

ক্ষ্যান্ত বলিল, "এমনি ভাবে কতদিন তুমি সেখানে রইলে দিদি ?"

মেনি বলিল, "বেশীদিন নয় বোন। শীগ্‌গিরই আমায় বিদেয় নিতে হল। একদিন খামকা তেনা আমার নামে মিথ্যে একটা অপবাদ দিয়ে বসল। আমি তেক্ষুণি তাকে উল্টে ফেলে, তার গলা চেপে ধরলাম। যতক্ষণ না বলেছিল, মিথ্যে, আমি তাকে ছাড়িনি। সেও আজ প্রায় পাঁচ বছর হতে চলল।"

ক্ষ্যান্ত বলিল, "তেনার সঙ্গে আর দেখা হয়নি দিদি ?"

মেনি বলিল, "না। বছর খানেক হল সে আর একটা বছর নয় বয়সের মেয়েকে বিয়ে করে এনেছে। তবে শেয়না হয়ে উঠবার আগেই, তেনাকে চক্ষু বুজতে হবে, এও আমি বলে দিচ্ছি। নচ্ছার মিন্‌সে কোথাকার।"

নিঃশব্দে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মেনি তাহার কথা শেষ করিল।

এমনি কথায় কথায় কখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, তাহা তাহারা টের পায় নাই। হঠাৎ তাহারা লক্ষ্য করিল, বেশ অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে। কেহ কাহারও মুখ সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে না।

আঁচলে বাঁধা একটি রৌপ্য আধুলির অস্তিত্ব হাত দিয়া অনুভব করিতে করিতে মেনি বলিল, "এইবার উঠে পড় বৌ। বেশ গা ঢাকা হয়েছে। বেশী রাত্রি হলে, আবার পারের নৌকা পাব না।"

কথা কয়টা বলিয়া মেনি ক্ষ্যান্তর হাত ধরিয়া মাঠের মধ্যে নামিয়া পড়িল।

পিছনের সেই বিস্তীর্ণ বাগান ও মাঠের পথের মাঝখানে একটা ছোট বিল ছিল। সেবার সেই বিলটায় চাষ হয় নাই। সারা বিলটায় শুধু বুনো ঘাস ও কাশ বনের আধিপত্য। ধূনা তুলার ন্যায় ধব-ধবে কাশ ফুলে সারা বিলটা ভরা।

মেনি ক্ষ্যান্তর হাত ধরিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া কাশবনের গা ঘেঁসিয়া, কম জল দেখিয়া, মাঠের পথে উঠিয়াছে মাত্র, এমন সময় একটা কোলাহল শুনিয়া তাহারা চাহিয়া দেখিল, ক্ষ্যান্তর শ্বশুর গ্রামের বিপিন দুলে, মহেন্দ্র দাস, রাঘব বাগ ও সুবল বেরা প্রভৃতিকে লইয়া লাঠি, কাস্তে হস্তে সেই দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে।

উঁচু পথের ওপারে, নাবাল খানার মধ্যে শেষ রাত্রি হইতে তাহারা পলাতকদের অপেক্ষায় ঘাপটি মারিয়া বসিয়াছিল।

হঠাৎ উহাদের এইভাবে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া, ক্যান্ত অস্ফুটভাবে একটা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল ও তাহার পরে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

পথের নীচে নাবাল জমীটার উপর একটা বাবলা গাছ ছিল। কয়দিন পূর্ব্বে কাঠুরেরা গাছটা সেইখানে কাটিয়া রাখিয়া গিয়াছে, ছোট বড় অনেকগুলি শক্ত ডাল, সেইখানে তখনও পড়িয়া ছিল। জমীটার আশে-পাশে কয়েকটা উঁচু মাটির ঢিবি, শুক্‌নো ঘাস দিয়া ঢাকা। চারিদিকে বাবলা কাঁটা ও কাঠের টুকরা ছড়াইয়া রহিয়াছে।

মজবুত দেখিয়া একটা ডাল সেইখান হইতে উঠাইয়া লইয়া মেনি একবার রুদ্ধ আক্রোশে গাঁয়ের লোকদের দিকে চাহিয়া দেখিল ও তাহার পর আঁচলটা কোমরে জড়াইয়া লইয়া ক্যান্তকে বলিল, "যা তুই ছুটে ওই নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়া। আমি একটু পরে যাচ্ছি। দেখি, কতংবড় মর্দ্দ বাচ্ছা ওরা।"

ক্যান্ত একবার মেনির সেই রুদ্রমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া দেখিল ও তাহার পর মেনির নির্দ্দেশ মত প্রাণপণে উঠিয়া পড়িয়া, নদীর দিকে ছুটিল।

ছুটীতে ছুটীতে ক্যান্ত একেবারে নদীর কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে বিস্তীর্ণ তপ্‌সী নদ। সোঁ সোঁ করিয়া জলের আওয়াজ আসিতেছে। মাঝে মাঝে পাড় ধ্বসিয়া পড়ার শব্দ হইতেছে, ঝপ ঝপ্। নদীর বাঁকের মুখ, তাহার উপর সেইখানে ভাঙন ধরিয়াছে, [illegible] নদীর সেই জায়গাটা সব চেয়ে চওড়া বেশী, কূলের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না।

ক্যান্ত একবার পিছনের দিকে তাকাইয়া দেখিল, সামনে একটা নলখাগড়ার বন পড়ায়, কিছু দেখা গেল না। দূর হইতে ক্যান্ত একটা হৈ হৈ শব্দ, লাঠির ঠক্ ঠক্ আওয়াজ শুনিতে পাইল, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না।

একটা দারুণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা লইয়া ক্যান্ত সেইখানে দাঁড়াইয়া-

ছিল, হঠাৎ সে চাহিয়া দেখিল তার সামনের মাটিটার উপর একটা চীর খাওয়ার দাগ আসিয়া পড়িয়াছে। ক্যান্ত বেশ বুঝিতে পারিল পাড়ের সেই দিকটা ধ্বসিয়া নদীর দিকে নামিয়া যাইতেছে, কিন্তু সে নড়িল না। দূরের কোলাহলের দিকে কান পাতিয়া, সেইখানেই সে দাঁড়াইয়া রহিল।

ধীরে ধীরে সেই চীর বিরাট একটা ফাঁকে পরিণত হইল। তাহার পর বিরাট একটা শব্দ করিয়া পাড়ের সেই দিকটা ক্যান্তকে লইয়া নদীর মধ্যে নামিয়া গেল।

পাড় ভাঙ্গার সেই ভীষণ গুড়ুম গুড়ুম শব্দ আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া নলখাগড়ার বন পার হইয়া মাঠের মাঝখান পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছাইল। ক্যান্তকে সাবধান করিয়া দিতে মেনি ভুলিয়া গিয়াছিল। শব্দ শুনিয়া মাত্র মেনির হাত হইতে বাবলার ডাল খসিয়া পড়িল। সে পিছন ফিরিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। গাঁয়ের লোক সন্ত্রস্ত হইয়া নদীর দিকে একবার চাহিয়া দেখিল। কেহ কেহ নদীর পাড় পর্য্যন্ত দৌড়াইয়া গেল, কিন্তু ক্যান্তকে আর দেখা গেল না।

উনিশ

হিরু নিজ কাছারীতে আর না ফিরিয়া সোজা রাজাবাবুদের মণ্ডপপুরের প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজাবাবুকে সে সব কথাই খুলিয়া বলিল। তিনি অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু হিরু শুনিল না। শেষে তিনি হিরুর প্রার্থনায় সম্মতি জানাইলেন। জমীদারকে বলিয়া হিরু সুন্দরবনের মহল্লায় বদলি হইল। তাহার মন বাকি জীবনটা বন-প্রদেশে বাঘ ভল্লুক আর বুনো মানুষের সঙ্গে কাটাইয়া দিতে চায়। সে স্থির করিল যে জনপদে সে আর ফিরিবে না।

অনুমতি পত্র লইয়া হিরু তাহার সহকারী ভবেশবাবুকে দপ্তর বুঝাইয়া দিতে সেই রাত্রেই রওনা হইয়া নদীর ঘাটের এক মণ্ডতলে আসিয়া দাঁড়াইল। ভৃত্য মাঝি ডাকিতে গেল।

নদীর ধারেই চারিটী খুঁটীর উপর ছোট খড়ের মণ্ডপ। নদীর লোহিত জল, জোয়ারের মুখে খড় কূটা আবর্জ্জনাদি বক্ষে লইয়া বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। মণ্ডপ তলে দাঁড়াইয়া পরপারের বনানীর রেখার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া হিরু ভাবিতেছিল, ওই ওপারে ক্ষ্যান্তদের দেশ। এতক্ষণ ক্ষ্যান্তকে তাহারা কি যন্ত্রণাই দিতেছে! তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। সে ত ক্ষ্যান্তকে বাঁচাইতে পারিল না। গ্রামখানি ছাড়িয়া যাইতেও তাহার মায়া হয়। এতদিন সে ও ক্ষ্যান্ত দুজনে বেশ সুখেই ছিল। মধ্যে মধ্যে তাহাদের দেখা হইত। এক্ষণে তাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব। সব স্মৃতিটুকু এই নদীর জলে বিসর্জ্জন দিয়া তাহাকে বিদায় লইতে হইবে।

হিরু অনেক কথাই ভাবিতেছিল। এমন সময় ভৃত্য তিনু আসিয়া খবর দিল,—শীঘ্র ঝড় আসিবে। এজন্য কেহ এ সময় পাড়ী দিতে রাজী হইতেছে না।

হিরু সহসা চাহিয়া দেখিল, জ্যোৎস্নার আলো তাড়াইয়া চারিদিক অন্ধকার করিয়া মেঘ নামিয়া আসিতেছে। ঝড় আসিয়া পড়িল। ধীরে ধীরে নদীর জলস্রোত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। [illegible] তোড়ে স্থানে স্থানে, কিনারায় মাটী ভাঙ্গিয়া স্রোতের মধ্যে পড়িতেছিল—ঝপ্ ঝপ্।

তিনুর পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও হিরু নড়িল না। সে অনিমেষ নয়নে জলের দিকে চাহিয়া সেইস্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল। তিনু ওপারের কাছারীর ভৃত্য। বদলি হইয়া যাওয়ায় মনিবের প্রতি তাহার কোন দরদ নেই। পিছন ফিরিয়া একটু মুচকি হাসিয়া সে সরিয়া পড়িল।

ঃ শুধু ফাগুয়াকে লইয়া সেই দুর্য্যোগ মাথায় করিয়া সেইখানেই
দিয়া রহিল।

ঝড় বাড়িয়াই চলিয়াছে। পাশের শিমূল গাছটা থাকিয়া থাকিয়া
জোরে দুলিয়া উঠিতেছে। অদূরে শ্মশানের একটা জ্বলন্ত চিতার
গ্নিশিখার দিকে চাহিয়া তাহারা বসিয়াছিল, হঠাৎ শিমূল গাছটার
কটা মোটা ডাল মড় মড় করিয়া তাহাদের পায়ের কাছে ভাঙ্গিয়া
ড়িল।

এই শিমূল গাছটী সম্বন্ধে একটা অপবাদ ছিল। এ গাঁয়ের
ঘোর ভট্টাচার্য্য নাকি গাছটায় বসবাস করেন। প্রায় পনের
সর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, প্রতিদিন ভোরে গাছের গোড়ায়
রম মাটির উপর তাঁহার খড়মের দাগ দেখা যায়।

ফাগুয়া গরুর গাড়ীর সোয়ারী লইয়া পূর্ব্বে কয়েকবার এই গাঁয়ে
াসিয়াছিল। স্থানটীর মাহাত্ম্য তাহার জানা ছিল। সে সভয়ে হিরুকে
কের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, "রাম রাম সীতারাম।"

হিরুর কিন্তু কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই, সে একদৃষ্টে শুধু জলের
কে চাহিয়া বসিয়া ছিল। সহসা সে দেখিতে পাইল স্রোতের মুখে
কটী নারীদেহ ভাসিয়া যাইতেছে।

ক্ষ্যান্তরই মত একখানি পরিস্ফুট যৌবন, একখানি অপূর্ব্ব রূপমাধুরী,
কালে ঝরিয়া পড়িয়া, নদীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। দেহটা ভাসিতে
াসিতে ডুবিতে ডুবিতে নিকটে আসিবামাত্র হিরু কি ভাবিয়া একে-
রে জলের কিনারা পর্য্যন্ত ছুটিয়া গেল। দেহের সবটা চোখে না
ড়িলেও সেই আধ-অন্ধকারে হিরু যেটুকু দেখিতে পাইল তাহাতেই
স বুঝিল, হয়তো বা সে ক্ষ্যান্ত ছাড়া আর কেহ নয়। হঠাৎ
াগলের মত হইয়া হিরু চীৎকার করিয়া উঠিল, "ক্ষ্যান্ত ক্ষ্যান্ত!"
তাহার পর দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া নদীতে ঝম্প প্রদান করিল।

ফাগু পিছন পিছন ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "দাঠাকুর কয় কি?" কিন্তু হিরুকে আর দেখা গেল না।

ফাগুর মুখে সকল কথা শুনিয়া ওপারের ইতর ভদ্র সকলে জানিল যে ক্ষ্যান্তর সহিত হিরুও পৃথিবীর বুক হইতে বিলীন হইয়া গেল।

ক্ষ্যান্ত বা হিরু কেহই মরিল না। সন্তরণপটু হিরুর পক্ষে এই ঝড়ের রাতেও এইরূপ একটী নদী দুই তিন বার পার হওয়া দুঃসাধ্য ছিল না। প্রতিদিন স্নানের সময় এই নদী সে কতবার পার হইয়াছে, সে ক্ষ্যান্তর দেহটা বুকের উপর তুলিয়া লইয়া, স্রোতের মুখে গা ভাসাইয়া দিল।

কখন ঝড় থামিয়া গিয়াছে। জ্যোছনার আলো পুনরায় পৃথিবীকে হাসাইতে সুরু করিয়াছে। সামনে উঠিবার মত পাড় না থাকায়, হিরু ক্ষ্যান্তকে লইয়া ভাসিয়া চলিল।

কয়েকজন ধীবর এই সময় মাছ ধরিবার জন্য নৌকা করিয়া একটি প্রশস্ত জাল নদীর এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত জলের ভিতর নামাইয়া দিতেছিল। কয়েকজন জালের উপরটা জলের উপর ভাসাইয়া রাখিবার জন্য স্থানে স্থানে জালের উপর শোলার আঁটি বাঁধিয়া দিতেছে।

তাহারা ক্ষ্যান্ত ও হিরুকে এইভাবে ভাসিতে দেখিয়া তাহাদের নৌকায় তুলিয়া একেবারে তীরে লইয়া আসিল।

হিরু সজ্ঞানেই ছিল। সে, কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া দ্বারা ক্ষ্যান্তর জ্ঞান ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। জেলেরা তাহাদের অদূরবর্ত্তী কুটীর হইতে ছাই ও অগ্নি আনাইয়া, ক্ষ্যান্তর শুশ্রূষা আরম্ভ করিল। কিন্তু দেড় ঘণ্টার উপর চেষ্টার পরও ক্ষ্যান্তর জ্ঞান ফিরিল না। ক্ষ্যান্ত অনেকক্ষণ জলের মধ্যে ছিল, সে কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়ার আয়ত্তের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে।

হিরু হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। মুখ দিয়া তাহার কোনও কথা হির হইল না।

হিরুকে এইভাবে বসিয়া পড়িতে দেখিয়া একজন বুড়া ধীবর ধীরে র ক্ষ্যান্তর কাছে আসিয়া তাহার দেহটী উপুড় করিয়া মাথার উপর িয়া লইল ও তাহার পর তাহাকে মাথায় লইয়া প্রাণপণে ঘুরপাক িতে লাগিল।

হিরু অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল, ঝলকে ঝলকে জল ক্ষ্যান্তর মুখ তে বাহির হইয়া আসিতেছে।

পূর্ণ একটী ঘণ্টা এইরূপ ঘুরপাক খাওয়ার পর ক্ষ্যান্তকে নামাইয়া খিয়া বৃদ্ধ ধীবর সাকরেতদের আদেশ করিল, "যা, মণ দেড়েক নুন কান ঘর থেকে নিয়ে আয়।"

প্রায় মণ দুই নুন দিয়া ক্ষ্যান্তর নিশ্চল দেহটা ঢাকিয়া দিয়া সকলে দ্বগ্ন মনে তাহার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

ধীরে ধীরে ক্ষ্যান্তর চক্ষু ও উদর নাড়া দিয়া উঠিল। তাহার শ্বাসক্রিয়া রম্ভ হইল, সকলে অবাক হইয়া লক্ষ্য করিল, ক্ষ্যান্তর জ্ঞান ফিরিয়া িসিতেছে। প্রায় পুরা পাঁচ ঘণ্টার চেষ্টার পর ক্ষ্যান্তর জ্ঞান রিল।

চক্ষু মেলিয়া সম্মুখে হিরুকে দেখিয়াই ক্ষ্যান্ত উঠিতে চেষ্টা করিল। রাণ কথা তাহার কিছুই মনে আসে না। বহু চেষ্টা করিয়াও হিরু ড়া অপর কাহাকেও তাহার মনে আসিল না।

হিরু ধীরে ধীরে তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া ধীবর-প্রদত্ত একবাটী দুধ াহাকে খাওয়াইয়া দিল। একটু সুস্থ হইয়া অস্ফুটস্বরে ক্ষ্যান্ত বলিল, হিরুদা!" তাহার পর আরও কি সে বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহা বলিয়া সে উঠিয়া দুই হাতে হিরুর গলা জড়াইয়া মুখটা তাহার কের ভিতর একেবারে গুঁজিয়া দিল।

হিরু ধীরে ধীরে ক্যান্তকে লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "একি ক্যান্ত, তুই কি পাগল হলি? কি করেছিস্!"

ক্যান্ত হিরুর কথা শুনিয়াও শুনিল না। সে নির্ব্বিকার চিত্তে দুই হাতে হিরুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া দেহটা হিরুর বুকের উপর এলাইয়া দিল। তাহার মনে হইতেছিল, যেন এতদিন একটা রূপকথার দৈত্য তাহাকে হরণ করিয়া বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার হিরুদা তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে; আর তাহার যেন কোন ভয় নাই। কৃতজ্ঞতার নেশায় তাহার মন ভরপুর। সে সজোরে হিরুকে জড়াইয়া ধরিল।

হিরু এইবার ধীরে ক্যান্তকে কিছু দূরে সরাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছিল ক্যান্ত?"

ক্যান্ত রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "জিজ্ঞাসা ক'র না হিরুদা, সবাই জানে আমি মরে গেছি। সকলেই আমাকে স্রোতে ভেসে যেতে দেখেছে। কেউ বাঁচাবার চেষ্টা করে নি। তুমি যখন আপন জীবন তুচ্ছ করে আমাকে বাঁচিয়েছ তখন আমি তোমার। আজ আমি নূতন করে জীবন সুরু করতে চাই। পিছনের সব কথা ভুলে যাব হিরুদা, এ আমার পুনর্জন্ম।"

ছোট বেলা থেকে হিরুর সংস্পর্শে আসিয়া ক্যান্ত অনেকটা আধুনিক ভাবাপন্ন হইয়াছিল। যখনই হিরু সময় পাইত, নূতন নূতন বই তাহাকে পড়াইয়া শুনাইত। আধুনিক ভাবধারার সহিত ক্যান্ত একেবারে অপরিচিত ছিল না। তবুও ক্যান্তর মুখে এই নূতন কথা কয়টা শুনিয়া হিরু অবাক হইয়া গেল।

হিরু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সোৎসাহে বলিল, "তাহলে ক্যান্ত, তুমি আমার!"

ক্যান্ত হিরুর বুকের উপর মুখ রাখিয়া বলিল, "হাঁ গো, হাঁ,

আমি তোমার; আমার মনে কোনও বিকার নাই। এতদিন আমি পাপ করে এসেছি। আজ বুঝেছি, আত্মাকে কষ্ট দেওয়াই সবচেয়ে বড় পাপ। এতদিন আমি বাহিরে পূজা করেছি একজনের, আর অন্তরের আসন ছেড়ে দিয়েছি আর একজনকে। অন্তরে বাহিরে আজ আমি তোমাকেই পেতে চাই। আমাদের আজিকার এ মিলন পাপ নয়, পুণ্যময়,—শুধু আমাদের কেন, প্রত্যেক মানুষেরই এই মিলনে জন্মগত অধিকার। এ ভালবাসার পুরস্কার।"

ক্ষ্যান্ত শিক্ষিতা বালিকা নয়। তাই ক্ষ্যান্তর মুখের এই কথা, হিরুর নিকট ঈশ্বরের বাণীর মতই শুনাইল।

কিন্তু হিরু ভুলিয়া গিয়াছিল যে, বাংলা দেশের মেয়েরা নিরক্ষর হইলেও অশিক্ষিতা নয়। ঠাকুরমার মুখে গল্প শুনিয়া তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। যাত্রা ও কথকতার মধ্যে তাহাদের উচ্চ শিক্ষা শেষ হয়।

হিরু অনেক কথাই ভাবিল। পিছনের দিন কয়টা তাহার স্বপ্নের মত মনে হইল। ক্ষ্যান্তর মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত একটা সতৃষ্ণ দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া হিরু ক্ষ্যান্তকে একেবারে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল।

অনেকক্ষণ তাহারা এইভাবে দৃঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠের একটা গীত হিল্লোল কানে আসিয়া তাহাদের আবেশ ভাঙ্গিয়া দিল। হিরু মনোযোগ দিয়া শুনিল, এ বাউলদার কণ্ঠ।

গাহিতে গাহিতে বাউলদা এই দিকেই আসিতেছিল।

কোমল আঁখির কাজল তারার
আগল ভাঙে জল।
দিল দরিয়ার পাগল সেজে
কোথায় যাবি বল।

প্রাণের বাণে উজান বেয়ে রে,
চলিস্ ও তুই সারি গেয়ে রে,
কোন্ সুদূরের গাঙের মাঝে
ভুলতে ভবের ছল ॥

হিরুর দ্বিধাময় মন যেন এতক্ষণ বাউলদার [illegible] অপেক্ষা করিতেছিল। সত্যকার মানববন্ধু এই বাউলদা। যখনই হিরুর অন্তর তাহাকে চায়, কোথা হইতে বাউল পথ দেখাইবার জন্য, তাহার কাছে আসিয়া পড়ে। দূরে বাউলদাকে আসিতে দেখিয়া হিরু ছুটিয়া গিয়া তাহার পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল, "বাউলদা, পথ—"

বাউল স্মিতহাস্যে উত্তর করিল, "পথ তোমরা নিজেরাই ত চিনে নিয়েছ ভাই।" হিরু উত্তর করিল, "কিন্তু এতে ত পাপ হবে না? একে ত ব্যভিচার বলবে না?"

বাউল বলিল, "ব্যভিচার কারে বল ভাই। ধর, একজন ৬০ বৎসরের যুবক একটী ১৫ বছরের মেয়েকে বিবাহ করল। এখন বলত, সেইটা ব্যভিচার হবে, না, সেই মেয়েটী যদি একটী কম বয়স্ক সত্যকার যুবকের প্রতি আসক্ত হয়, ত তা'কে ব্যভিচার বলা হবে?"

হিরু বলিল, "প্রথমটীকেই আমি ব্যভিচার বলব।" বাউল বলিল, "এও ঠিক সেইরূপ। কোন প্রভেদ নাই।"

একটু ভাবিয়া হিরু বলিল, "কিন্তু সমাজ, আমাদের এই হিন্দু সমাজ?"

বাউল বলিল, "ভাই, মানুষে সমাজ গড়ে, সমাজ মানুষ গড়ে না। মনুষ্যত্বকে বাদ দিয়ে কোন সামাজিক নিয়ম টিক্‌তে পারে না। সামাজিক নিয়ম মানুষের প্রয়োজনের দাস মাত্র। আর বর্ত্তমানে এখনও হিন্দু সমাজের একটা অংশ আছে, যা সানন্দে তার ক্রোড়ে তোমাদের স্থান দেবে। সে আমাদের চির উদার বৈষ্ণব সমাজ

লবাসায় পাপ নাই। প্রকৃত ভালবাসা যেখানে সেইখানেই ভগবানের
ষ্ণু—বিষ্ণুর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। প্রেমের জয় হবেই।"

বাউল ধীরে ধীরে তাহার হাত দুইটি হিরু ও ক্ষ্যান্তর মাথার উপর
খিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও।"

হিরু দ্বিধাশূন্য মনে বাউলদাকে প্রণাম করিতে যাইতেছিল, এমন
ময় শঙ্খ ঘণ্টার ঝকড় ঝনঝনা ঢংঢং শব্দে সে চমকাইয়া দাঁড়াইয়া
ঠিল। তাহার আর প্রণাম করা হইল না।

হিরু চাহিয়া দেখিল, বৃহৎ বট বৃক্ষের ফাঁকে সেই গাঁয়ের রক্ষাকালী ও
ড়াশিবের মন্দির দুইটী দেখা যাইতেছে। সূর্য্যের শেষ রশ্মি তাহার
বটুকু রক্তাভা মন্দিরের চূড়া দুইটীর উপর ছড়াইয়া দিয়া শেষ প্রণাম
নাইতেছিল। শঙ্খ ঘণ্টার সেই মিশ্রিত শব্দ হিরুর মনের সুপ্ত সংস্কার-
কুকে যেন নূতন করিয়া আবার জাগাইয়া দিতে চায়।

হিরু অনেকক্ষণ মন্দির চূড়ার সেই শুভ্র ত্রিশূলটীর দিকে চাহিয়া
াড়াইয়া রহিল ও তাহার পর বলিয়া উঠিল, "না বাউলদা, আমি কিছুতেই
ারব না। এ মহা পাপ। এ ভুল পথ—"

হিরুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬